সংগীত মনীষা

সংগীত মনীষা

প্রথম খণ্ড

অমল দাশশর্মা

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

উৎসর্গ

এই গ্রন্থ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাশশর্মা

এবং

মাতৃদেবী

শ্রীমতী লাবণ্য দেবী

অর্পিত হোল।

নিবেদন

সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ সাধন ও শাস্ত্রের মধ্যে ছায়া ও কায়ার সম্পর্ক। এই সেদিন পর্যন্ত সংগীত শিক্ষা গুরুপরম্পরায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হ'য়েছে। এই পাঠ্যতালিকায় যে সব বিষয় উল্লিখিত আছে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ বই বাজারে নেই। ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা শুধু সময় সাপেক্ষই নয় ব্যয়বহুলও বটে। যে সব বইয়ে বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে সেগুলি আবার তথ্যনির্ভর নয়।

সংগীত-অধ্যয়নের সময় এই সব বিষয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। মনে হ'য়েছে শিক্ষার্থীর জন্যে এমন একটি বই দরকার যাতে প্রয়োজনীয় সব ঔপপত্তিক বিষয়গুলি সংকলিত থাকবে। এই প্রয়োজন পূরণই বই গ্রন্থরচনার প্রেরণা। নানারকম সংগীতশাস্ত্র পর্যালোচনা করে এই বইটিকে যথাসাধ্য প্রামাণ্য ও প্রণালীবদ্ধ অথচ সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীজন কোনো ভুল ত্রুটি পেলে বা সংশোধন, বর্জন, সংযোজনের পরামর্শ দিলে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণকে এই সব বক্তব্যের ভিত্তিতে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াসী হব।

আশা করি বিষয় বৈচিত্র্য ও তথ্যাদি বিন্যাসের প্রাচুর্যে এই নবীনতম গ্রন্থটি স্বীকৃত হবে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে লাগলে এবং রসিক-হৃদয়-মনোরঞ্জনে সক্ষম হলে আমার সুদীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থ-প্রকাশের পশ্চাৎপট কিছুটা ঘটনাবহুল। চিত্তাকর্ষকও বটে। ১৯৭১ সালে এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা ও অনুমোদন পেয়েও কেবলমাত্র অর্থাভাবের জন্য প্রকাশিত হল না। এর পরে দিল্লীতে এসে সংগীত-নাটক একাডেমীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু পাণ্ডুলিপি হিন্দীতে না হওয়ার জন্য একাডেমীর অনুগ্রহ পাওয়া গেল না। তারপর এন. বি. টি., ইউনেস্কো, মিনিস্ট্রি অফ কালচার প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়েও পুস্তক প্রকাশে সফল হইনি।

অবশেষে দিল্লীতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ডাঃ মালেকের শরণাপন্ন

হই। তিনি এক কথাতেই আমার বই প্রকাশ করতে রাজি হন এবং আমাকে তাঁর অফিসে গিয়ে যথারীতি পাণ্ডুলিপি জমা দিতে বলেন। কিন্তু এতে খুশী হতে পারলাম না। কারণ স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের কাছে সাহায্য নিতে হবে বলে বেদনাবোধ করলাম। তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে তদানীং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে আমার পুস্তক প্রকাশের সমস্যার কথা নিবেদন করলাম। দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রার্থিত উত্তর পেলাম। তাতে জানলাম আমার কাগজ পত্র শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তারপরে শিক্ষাদপ্তর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আর্থিক সাহায্য দান করলেন। ফলে আজ অপ্রকাশের অন্ধকার থেকে "সংগীত মনীষা" গ্রন্থ আলোতে এলো। এর জন্য শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আরো বহু সুহৃদ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির কাছে আমি চিরঋণী। গ্রন্থখানি অনুমোদন ও প্রকাশনের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কলকাতা ও দিল্লীর কত সহৃদয় ব্যক্তির কত যে সাহায্য পেয়েছি তা বর্ণনাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ডাঃ গোপীনাথ গোস্বামী, শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, শ্রী কে. পি. আয়ার, শ্রীমতী সুচন্দ্রা বসু, শ্রীমতী মায়া সেন, অধ্যাপক সুখেন্দু গোস্বামী এবং পরম সুহৃদ শ্রীঅমল চক্রবর্তী (এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর, ড্রাগ কন্ট্রোল, পশ্চিম বঙ্গ), শ্রীঅশোক বসু আর দিল্লীর ডাঃ সুমতি মুটাটকর (দিল্লী বিশ্বাবিদ্যালয়), স্বর্গতঃ অমর নন্দী (সেক্রেটারী, রাজ্যসভা), শ্রীবিজন মুখোপাধ্যায় (আই. সি. সি. আর) এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রীনিতাই চট্টোপাধ্যায় (প্রডাকসন ম্যানেজার, ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ)।

অমল দাশশর্মা

সূচীপত্র

সংগীত প্রশস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥

এমন উচ্চতম প্রশংসা আর কোন বিষয়ে নেই। সংগীত যে সর্বকালের সর্বদেশের সর্বজনের প্রেমভক্তি ও সম্মানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সর্বদেশের মনীষীগণ সে কথা স্বীকার করেন। গোড়ার দিকে পৃথিবীর সর্বত্রই সংগীত ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সমাজ, ধর্ম, লোকরুচি, জলবায়ু, ভাষা প্রভৃতি অনুসারে ক্রমে এর নানাবিধ রূপান্তর ঘটে। তবে ভারতীয় সংগীতের প্রধান উপাদান ও আধিপত্য চিরদিনই ধর্মভাবাপন্ন। সুরের আবেশে মুগ্ধ ভক্তেরা ছুটে চলেছে মুক্তির সন্ধানে, এমন অজস্র দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ দেশের জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, তুলসী, কবীর, ত্যাগরাজ, পুরন্দরদাস, সুরদাস, মীরা, রামপ্রসাদ প্রমুখ পরম ভক্তেরা এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ ॥

আমাদের দেশে সাধারণ লোকশিক্ষা থেকে উচ্চতম জ্ঞানের বাণী পর্যন্ত সুরে প্রচারিত হয়েছে। এ দেশের চাষী, মজুর, মাঝি প্রভৃতি সকলেই গান গায়। ভিক্ষুকেরও প্রধান অবলম্বন হোল গান। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি দেখা যায় না। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজজীবনের প্রাণের লক্ষণই হোল গান গাওয়া। আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকেরা শস্যাদির উৎকর্ষসাধনেও সংগীতের উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন। পশুপক্ষীরা যে সংগীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে সে কথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। সুতরাং সংগীত প্রাণীমাত্রেরই জীবনে অমৃতধারা, এবং যে-কোন প্রশংসাই এ বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর। সংগীতের প্রশংসায় এবং এর মহত্ব বর্ণনায় দেশবিদেশের মনীষীগণ যে-সকল উক্তি করেছেন তার কয়েকটি এখানে দেওয়া হোল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা এবং যাঁরা তা বোঝেন তাঁদের নিকট উহা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী স্থাপনকালে তাঁর ভাষণে বলেছেন, "সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় এ কথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য, যে জাতি এই দুটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।"

পাশ্চাত্য কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম কংগ্রেভ (William Congrave) বলেছেন: "Music hath charms to soothe the Savage's beast. To soften rocks, or bend a knotted oak··· ।"

"জগদ্বিখ্যাত সেক্সপিয়ার বলেছেন:

"The man that hath no music in himself,
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils ;
The notions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus.
Let no such man be trusted, Mark the music."

(Merchant of Venice-Act V-Scene1)

সংগীত যেন একটি আধ্যাত্মিক ভাষা, যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় মানব-হৃদয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। সংগীতের মাধ্যমে আমরা পাই হৃদয়াবেগ প্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, যার প্রকাশ হয় সুর, ছন্দ ও কাব্যের ত্রিবেণী সঙ্গমে।

ভাবোদ্দীপনায় সংগীত

ভাবোদ্দীপনায় সংগীতের মতো শক্তিশালী বোধ হয় আর কিছুই নেই। সুগায়কের কণ্ঠে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক সংগীত সাধারণের অন্তরে যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমন বোধ করি আর কিছুই পারে না। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে সংগীতের মোহিনীশক্তি সম্পর্কে শত শত কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রাণীমাত্রের চিত্তবিনোদন তো বটেই এমন কি জড়পদার্থকেও যে সংগীত প্রভাবিত করতে পারে এমন কাহিনীও প্রচলিত আছে।

গ্রীসীয় পুরাণে আছে যে, সুকণ্ঠী গায়ক অর্ফিয়ুস তাঁর প্রেয়সী ইউবিডাইসকে সংগীতের প্রভাবেই নাকি মৃত্যুরাজের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

আধুনিককালের সুরুতে এ দেশে এমন এক সময় ছিল যখন সংগীতবিদ্যাকে

অনেকে ভাল চোখে দেখতেন না। সেই ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কার সর্বপ্রথম দূর করার চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য হন বাংলার গৌরব এবং সর্বপ্রথম বিদেশ থেকে সংগীতের সর্বোচ্চ সম্মান ডকটর অব মিউজিক (D. Mus.) প্রাপ্ত, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইনি সর্বপ্রথম গেকোয়ারের মহারাজার সহযোগিতায় 'ভারত সংগীত সম্মিলনী'র উদ্যোগে সংগীত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ফলস্বরূপ বর্তমানে দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও সংগীত ও ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এখনও অনেকের ধারণা সংগীত-সাধনা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশের অন্তরায়। এই প্রসঙ্গে জার্মানীর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের উক্তি উল্লেখযোগ্য : "Music far from a destruction in studies, would, as Doctors and Scientists have definitily proved, impart a soothing and questioning influence on the nerve centres and as such increase the working capacity of a brain worker ··।" দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই, যেমন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং পোল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব মন্ত্রী পেডারওয়েস্কি বিখ্যাত বেহালাবাদক ছিলেন। বিখ্যাত সমালোচক ও ঔপন্যাসিক রেঁামারেঁালা পাকা পিয়ানো বাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ এবং বহু রাজা মহারাজাদের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতএব মন ও মস্তিষ্ক সতেজ ও সক্রিয় রাখার জন্য সংগীত ও ললিতকলা শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। কারণ সংগীতচর্চা মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করার শ্রেষ্ঠতম উপায়, এবং মনের একাগ্রতা যে সর্ব কার্যে অপরিহার্য সে কথা বলাই বাহুল্য।

সংগীতের উৎপত্তি

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবম্।
নাদরূপং পরঃ জ্যোতির্ণাদরূপী স্বয়ং হরিঃ ॥

অর্থাৎ নাদ বিনা জ্ঞান অসম্ভব, নাদ বিনা মঙ্গল অসম্ভব, পরজ্যোতিঃ নাদরূপ এবং স্বয়ং হরিও নাদরূপী। বিষ্ণুপুরাণে আছে, সকল গীতিকা শব্দমূর্তিধর বিষ্ণুর অংশ। আমাদের দর্শনশাস্ত্রেও নাদকে ব্রহ্ম অর্থাৎ জগতের আত্মা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সংগীতময়। কারণ নদীর কল্লোলে,

বনের মর্মরে, পশুপক্ষীর কলকাকলিতে সংগীত নিরন্তর প্রবাহিত। অর্থাৎ পৃথিবীর সব-কিছুর মধ্যেই সংগীত অনাদিকাল ধরে ঝংকৃত হয়ে চলেছে। মানবজাতি তার নৈসর্গিক শক্তির প্রভাবে ভাব, ভাষা, বিবিধ চিন্তা ও কামনা ব্যক্ত করে সংগীতের পরমোৎকর্ষ সাধন করেছে। কারণ মানুষ মাত্রেরই কমবেশি সংগীত-শক্তি আছে।

সংগীতের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধনী, দরিদ্র, সন্ন্যাসী, গৃহবাসী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই বিচিত্র এবং অভিনব সৃষ্টির সাহায্যে সংগীতের উন্নতিসাধন ও নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু কথা আগে না সুর আগে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অর্থাৎ সংগীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম অভিমত প্রচলিত আছে। দেশবিদেশের মনীষীগণ এ সম্পর্কে যেসকল দার্শনিক, ধর্মভাবাপন্ন বা কাল্পনিক অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা হোল।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কথিত আছে যে, বেদ চতুষ্টয়ের স্রষ্টা ব্রহ্মা সংগীতবিদ্যা সৃষ্টি করে শিবকে এবং শিব সরস্বতীকে দান করেছিলেন। তাই বীণা পুস্তক ধারিণী সরস্বতীকে এর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বন্দনা করা হয়। ক্রমে স্বর্গের দেবর্ষি নারদ ও অপ্সরা-কিন্নরীগণ সংগীতবিদ্যা লাভ করেন। পরবর্তীকালে ভূলোকের ভরত, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি কঠোর সাধনায় সংগীতবিদ্যা লাভ করেন।

আরবে প্রচলিত একটি প্রবাদে কথিত আছে যে, হজরত মুসা পাহাড়ে ভ্রমণকালে একদিন একটি দৈববাণী শুনতে পান যে, "হে মুসা তোমার 'অসা' (ফকীরদের কাছে থাকে, একপ্রকার অস্ত্র) দিয়ে সামনের পাথরে আঘাত করো", সেই নির্দেশানুসারে পাথরে আঘাত করলে তা সাত খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যায় এবং সেগুলি থেকে সাতটি জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সেই সাতটি জলধারা থেকেই নাকি সপ্তস্বরের উৎপত্তি।

আরবের আর একটি প্রবাদে কথিত আছে যে, 'মুসিকার নামে নম্বানাকে সাতটি ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার পাখি ছিল যার ধ্বনিসমূহ থেকেই নাকি সপ্তস্বরের উৎপত্তি।

জেমস্ লঙ্ বলেছেন যে, শিশুর হাসিকান্না প্রভৃতি স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব থেকেই মানুষ সংগীত পেয়েছে। চার্লস ডারুইন বলেছেন, পশুপক্ষীর ধ্বনি

থেকেই সংগীতের উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও এই অভিমত সমর্থন করেছেন।

ফ্রয়েড, হার্ডার, রুশো, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে মানুষ হৃদয়াবেগ অনুসারে কথোপকথনে নিজের অজ্ঞাতেই কিছু-কিছু স্বর প্রয়োগ করে থাকে, যার উৎকর্ষসাধনে সংগীতের উৎপত্তি।

পণ্ডিত J. Kunst তাঁর Ethnomusicology গ্রন্থে বলেছেন: "Competition in courting; imitation of bird calls; rhythms demanded by working procedures; the lulling of an infant; the release of passion; patterns of speach, on more specifically, a primeval tonal communication that gave rise to both language and music; and calling from a distance, which requires an essentially musical treatment in order that the voice may carry."[১]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন যে, আদিম যুগে সংগীত ছিল মানুষের অন্তরে লুকানো। নানা কাজের মাঝে মানুষ নিজের চেয়ে শক্তিমান প্রকৃতিকে বুঝতো। বিভিন্ন পশুপক্ষীর ধ্বনিকে তারা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতীক মনে করতো। অনুকরণপ্রিয় মানুষ সেই ধ্বনির সাহায্যে নিরর্থক ভাষার সংগীতে বন্দনা করতো বিশ্বদেবতার। সেই সংগীতে গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ একটি কি দুটি মাত্র স্বরের ব্যবহার ছিল। ক্রমে সপ্ত স্বরের বিকাশ হয়।[২]

সংগীতের ভূমিকা

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ওঁ ধ্বনি সহযোগে সংগীতের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সংগীতের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা, বিষয় ছিল পরমেশ্বরের আরাধনা এবং বিশ্বপ্রকৃতির বন্দনা, আর উদ্দেশ্য ছিল আত্মোন্নতি তথা ঈশ্বরলাভ। সেই সংগীতের রূপ, রস, অলৌকিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষকেরা নানাবিধ বর্ণনা ও আলোচনা করেছেন। সেই সকল আলোচনাদিতে

১ Encyclopaedia Britannica, (1971), (Vol. 15, p. 1077).

২ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ: ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১৯৬১)।

কোন-কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে তৎকালীন সংগীতানুষ্ঠানাদির সঙ্গে আর্থিক কোন যোগ ছিল না। তা ছিল পুরোপুরি পারমার্থিক।

রামায়ণ মহাভারত তথা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তৎকালীন অনুষ্ঠানাদির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বহু বিচিত্র সংগীতানুষ্ঠানের উল্লেখ থাকায়, সংগীত যে তখন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই অতি উচ্চ-কলাবিদ্যারূপে স্বীকৃত এবং প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানাদির অপরিহার্য সঙ্গ ছিল সে কথা জানা যায়। আমাদের শাস্ত্রাদিতে সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত উক্তিসমূহ উক্ত অভিমত সমর্থন করে। অতএব এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন ভারতে সংগীতের মর্যাদা ছিল ঐতিহ্যময় এবং তার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। যুগপ্রবাহে তার নানা রূপবিবর্তন ঘটলেও ভারতীয় সংগীতসাধনায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি চিরদিনই প্রধান।

সংগীতকে সাধারণভাবে আধ্যাত্মিক বা আত্মোন্নতি, লোকরঞ্জন, অর্থোপার্জন প্রভৃতি নানা পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কারণ এর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ক্রমবিবর্তিত হয়েই চলেছে। দরবারী সংগীতের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় মহারাজ সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বে। তিনি স্বয়ং--অতিগুণী সংগীতজ্ঞ (বীণাবাদক) ছিলেন। দরবারী সংগীতের চরম বিকাশ হয় মধ্যযুগে। তবে লোকরঞ্জন এবং অর্থোপার্জনই ছিল তার মূলগত উদ্দেশ্য। সুতরাং সংগীত আধ্যাত্মিক তথা শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা এই মূল্যায়নের আদর্শ আপাতত গ্রন্থাদিতেই সীমিত, এমন কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কারণ সাধকের কঠোর সাধনা এবং নিষ্ঠার প্রকাশ প্রায় দুর্লভ হয়ে চলেছে।

বর্তমানে সংগীতচর্চা তথা শিক্ষার প্রসার দ্রুত বেড়ে চলেছে। স্কুল-কলেজে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় সাধারনের সংগীতরুচি কতটুকু উন্নত হয়েছে, সে কথা চিন্তার বিষয়। অবশ্য এই অভিমত শুধুমাত্র উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ভারতের সংগীত চিরদিনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি, রীতিনীতি, ভাষা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে নানা বিবর্তনের মধ্যেও প্রান্তীয় কৌলীন্য রক্ষা পেয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংগীতরূপের আভাষ কিছু পরিমাণে কর্ণাটক সংগীতেই বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন, "...যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করতে চায় সেই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায় পড়িয়া, কিন্তু জগতে সবচেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম।" আমাদের দেশে গুণীজনের অভাব নেই, কিন্তু দেশের প্রায় সর্বক্ষেত্রের মত সংগীতের ক্ষেত্রেও মাঝারির প্রভুত্বের প্রাদুর্ভাব দুর্বার হওয়ায় তাঁরা অসহায় বোধ করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শহীনতার পরিচয় দিতে হয় এবং চটুল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সস্তা বাহবার প্রতি আগ্রহী হতে দেখা যায়। বিষয়টি মর্মান্তিক এবং বিবেচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হোল—"নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে।"

গুণীজনের আদর্শহীনতার আর একটি কারণ হোল, তাঁদের মননশীলতার অভাব। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সংগীতজ্ঞদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন, 'কলাকার' 'শাস্ত্রকার' 'গীতিকার' ও 'শিক্ষক'। এর সবগুলি বিভাগে বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ কদাচিৎ মেলে। অবশ্য এর কোন একটি বিভাগে পারদর্শী হওয়াও সহজ নয়। তবে তেমন গুণীজন আমাদের দেশে বহু আছেন। কিন্তু সকল সংগীতজ্ঞেরই কিছুটা অন্তত জ্ঞান এর সবগুলি শাখাতে থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ নিরক্ষর কলাকার, স্বরজ্ঞানহীন শাস্ত্রকার, সংগীতজ্ঞানহীন গীতিকার এবং অরসিক তথা শাস্ত্রজ্ঞানহীন শিক্ষক এঁরা সকলেই প্রায় অন্ধের মতো সংগীতসমুদ্রের তীরে বসে হাহুতাশ করে থাকেন।

কিছুকাল আগে এক সংগীতানুষ্ঠানে কিছু বিদেশী শিল্পীর গান শুনেছিলাম। তাঁরা ভারতীয় রাগ-সংগীত এবং রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর, সাবলীল গায়কী এবং সাধনার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভারত সরকার বিদেশে ভারতীয় সংগীত প্রচারে যত্নশীল। বিদেশীরাও পরম আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন। হয়তো এমন দিন আসবে যখন আমাদের দেশের অন্যান্য বিদ্যার মতো সংগীতের পরিচয় নিতেও আমাদের বিদেশে যেতে হবে।

আমাদের জাতীয় ত্রুটি হোল যে, আমাদের সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতার অন্ত নেই। আমরা মনে করি, আমাদের সংগীত ও সংস্কৃতি চরম প্রগতিশীল, এবং আমরা পরম সংস্কৃতিবান। অথচ বিদেশী চটুল সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতি চট করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আমরা বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করি, কিন্তু

অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নামে যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে অত্যাচার বললেও কম বলা হয়। কোথাও তা শুধুমাত্র সৌখিন আমোদের বিষয়। কেহ বা ইংরেজি শিক্ষা বা অর্থের জোরেই নিজেকে উত্তম সমঝদার বলে জাহির করে খুশি হন।

আমাদের সংগীত ও সংস্কৃতির ভূমিকা আজ কোথায় সে বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ আছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই শক্তিমান গুণীজনের হস্তক্ষেপ এবং সাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি। আর এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে আমাদেরই আগ্রহশীল ও সচেষ্ট হতে হবে।

সংগীতের সমকাল বিভাজন

কোন মানুষের জীবনী যেমন তার শৈশব বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ, কোন বিষয়ের বর্ণনাও তেমনি যথাসম্ভব প্রথম থেকে আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন: "...It is the duty of the historian not to let that past be forgotten. He must trace these gifts back to their sources, give them their due place in time scheme, and show how they influenced or prepared the succeeding ages."[১]

সংগীত সাধনায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হলেও ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপযোগিতাও কম নয়। কারণ ব্যবহারিক (practical) এবং ঔপপত্তিক (theoretical) অংশদ্বয়ের মধ্যে ছায়া ও কায়ার মতো নিবিড় সম্বন্ধ আছে।

ইতিহাসের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের পূর্বাচার্যেরাই সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমৃদ্ধি দান করে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেশ-বিদেশের মনীষীগণ সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যার উল্লেখ করে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "...If we read the writings and other historical accounts left by Pliny, Strabo, Magesthenes, Herodotus, Ptophyry and other ancient authors of different countries, we shall see how highly the civilization of India

১ Sir Jadu Nath Sarker : India through Ages. 1951.

was regarded by them. In fact between the years 1500 and 500 B.C., the Hindus were so far advanced in religion, metaphysics, philosophy, science, art, music and medicine that no other nation could stand as their rival, or compete with them in any of these branches of knowledge."[১]

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক আধুনিককালের মতো অক্ষমতা বা দীনতাপূর্ণ ছিল না। প্রাচীন সেই সভ্যতা গড়ে উঠতে বহুকাল সময় লেগেছিল। কেননা কোন দেশের জ্ঞান বিকাশ যুগে যুগে বিভিন্ন প্রতিভার স্পর্শে হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য নবীন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের মতো সংগীতকলাও বিকাশলাভ করেছে। মাটির স্তর দেখে যেমন ভূতত্ত্ববিদগণ নানাবিধ পৌরাণিক তথ্যাদি অনুমান ও প্রমাণ করেছেন, সংগীত সম্বন্ধে তেমন কোন প্রক্রিয়া না থাকলেও হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি নানা স্থানের খননকার্যে প্রাপ্ত বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার থেকে গবেষকগণ বহুবিধ তত্ত্ব ও তথ্যাদি অনুমান ও প্রমাণ করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হোল, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সংগীত প্রচলিত।

সংগীত বিবর্তনের এই সুদীর্ঘকালকে কোন সঠিক পর্যায়ক্রমে ভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, হয়তো বা অসম্ভব। কারণ এ সম্পর্কে এত মতপার্থক্য আছে যে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। তবে সংগীতালোচনার সুবিধার্থে মোটামুটিভাবে এইরূপে বিভক্ত করা হোল—

(১) প্রাগৈতিহাসিক কাল : ৫০০০ (?) থেকে ৩০০০ (?) খৃষ্টপূর্বাব্দ।

(২) বৈদিক যুগ : (ক) অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ : ৩০০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

(খ) প্রাচীন বৈদিক যুগ : খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী।

(৩) মধ্য বা মুসলমান যুগ : ১১শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী।

(৪) আধুনিক বা ইংরেজ যুগ : ১৮ শতাব্দী থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।

(৫) স্বাধীন ভারত : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে পরবর্তীকাল।

১ Swami Abhedanand : India and her people. 1905-6.

প্রাগৈতিহাসিক কাল (৫০০০-৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

যদিও প্রাগৈতিহাসিক বলতে আমরা ইতিহাস আরম্ভের পূর্বের শিকারী ও কৃষক (hunter and farmer) সম্প্রদায়ের সময়কাল বুঝি, কিন্তু সেই সময়কাল যে কতদূর বিস্তৃত এবং সে সম্পর্কে এত মতপার্থক্য বিদ্যমান যে, এ বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আজ আর সম্ভব নয়। বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ ডঃ লিকী (Dr. L. S. B. Leakey) Tanzania'র Olduvai Gorge এ কাজ করার সময়ে খননকার্যে প্রাপ্ত জীবাশ্ম (fossil) পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মানবজাতির বিকাশ খৃষ্টপূর্ব আঠারো লক্ষ বছর কাল আগে হয়েছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, ওই ধরনের জীবাশ্ম ভারতবর্ষের Soan, পিকিংয়ের নিকটবর্তী Chou-kou-tien এবং জাভাতেও পাওয়া গেছে।[১] অতএব এই মতানুসারে মানবজাতির বিকাশ উক্ত স্থানগুলিতে সুদীর্ঘ ১৮ লক্ষ বছর খৃষ্টপূর্বাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। তবে সিন্ধু উপত্যকা (Indus Valley) যে ভারতীয় সভ্যতার আদিভূমি সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। এই সিন্ধু উপত্যকাতেই সর্বপ্রথম হরপ্পা (পাঞ্জাব) ও মহেঞ্জোদড়ো (সিন্ধু) নগরদ্বয় স্থাপিত হয়েছিল। খননকার্যে ওই অঞ্চলের ৩৭০ মাইলের মধ্যে ওইরূপ উচ্চসভ্যতায় বিকশিত ও উন্নত আরো প্রায় একশত নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথম আক্রমণকারী আর্যরা নাকি পারস্য থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ করে এবং খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে তাঁরাই খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় সহস্রাব্দের উক্ত নগরগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রমে তাঁরা সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকাতে বসতি বিস্তার করেন। সেই আর্যরাই নাকি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা, বৈদিক সংস্কৃতি এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশসাধন করেছিলেন।[২]

তবে সংগীতালোচনার সুবিধার্থে অতি প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক কালকে

১ Prehistoric and Primitive man : Dr. Andreas Lommel.

২ The Oriental world : Jeannine Auboyer, Roger Goepper (Landmarks of the World's Art) 1971.

এই গ্রন্থে ৫০০০ থেকে ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল স্থির করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের খননকার্যে প্রাপ্ত বাঁশী, মৃদঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক তন্ত্রীযুক্ত বীণা, ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তি প্রভৃতি থেকে গবেষকগণ নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন, কেহ-কেহ তৎকালীন সংগীতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, খাদ্য, রোগ, পূজা, যুদ্ধ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। এমন কি সেই সংগীতের প্রভাবে তারা নাকি নানা অলৌকিক ঘটনাও ঘটাতে পারতেন। অবশ্য এইরূপ ধারণা বা সংস্কার এখনও যাযাবর, বেদে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তৎকালীন সংগীত সম্পর্কে Dr. Felber বলেছেন: "...Speach and music have descended from a common origin, in a primitive language, which was neither speaking nor singing but something both" ...[১] তবে খননকার্যে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রাদি পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, তৎকালীন সংগীতে অন্তত চারটি স্বরের ব্যবহার ছিল।

বৈদিক যুগ

(খৃষ্টপূর্ব ৩০০০-১১শ শতাব্দী)

খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ (তিন হাজার) থেকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে অতিপ্রাচীন এবং প্রাচীন বৈদিক যুগ বলে স্থির করা হয়েছে। ভারতীয় আর্যেরা তখন সকল বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। বৈদিক যুগকে তাই সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান বিকাশের উৎস এবং ভারতবাসীরাই সকল জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি দান করে শান্তি ও মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন বলে স্বীকৃত। অর্থাৎ ভারতবর্ষ একটি সুপ্রাচীন দেশ এবং সকল দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিভূমি। শিল্পী E. B. Havell বলেছেন: "...It is a profound mistake to regard the Indian Aryans as an uncreative or inartistic race; for it was Aryans philosphy, which makes all India one today, that synthesised

১ Dr. Erwin Felber : The Indian Music of the Vedic and the Classical Period. 1912.

all the foreign influence which every invader brought from outside and moulded them to its own ideals."[১]

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে ভারতবর্ষে আর্যগণের অভ্যুদয় হয়, তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে খুব উন্নত ছিলেন। যদিও হিন্দু সংস্কারানুসারে বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্রসমূহকে পরমেশ্বরের বাণী বলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে বিভিন্ন আর্য-ঋষিরাই ওই গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রাদিতেও এ কথারও সমর্থন আছে। তবে তাঁদের দেবতাদির নামের উল্লেখ করায় সম্ভবত ওইরূপ সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আর্যরাই হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ঝুকর, চন্নদড়ো প্রভৃতি সিন্ধু উপত্যকার অতিপ্রাচীন নগরগুলি এবং তার শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। তবে বেদচতুষ্টয়ের রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। কারণ কেহ খৃষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে, কেহ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে আবার কেহ-কেহ তারও বহু পূর্বে এগুলি রচিত হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। জার্মান মনীষী পণ্ডিত Max Muller এই প্রসঙ্গে সুন্দর উক্তি করেছেন: "...that we cannot hope to fix a terminus a quo. Whether the Vedic were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000 B C., no power on earth will ever determine.."[২] তিনি অন্যত্র বলেছেন: "...It may be very brave to postulate 2000 B.C., or even 5000 B.C, as a minimum date for the Vedic hymns, but what is gained by such bravery? ...Whatever may be the date of the Vedic hymns whether 1500 or 15000 B.C., they have their own unique place and stand by themselves in the literature of the world" অতএব এগুলির রচনাকাল এখন পর্যন্ত অমীমাংশিতই থেকে গেছে। তবে খননকার্যে যে সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার উৎপত্তি-কালের সঙ্গে যে এগুলির রচনাকালের যোগসূত্র আছে সে বিষয়ে অনেকেই একমত।

১ E. B. Havell: The Ideals of Indian Art. 1920.

২ Prof. Max Muller: Gifford Lectures. 1889.

৩ do : Indian Philosophy. 1912.

বৈদিক গ্রন্থ

প্রাচীন ঋষিগণ যে সকল বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছেন সেগুলিকে তাঁরা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নামে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

সংহিতা

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই বেদ চতুষ্টয়কে সংহিতা বলে। এগুলি পদ্যে রচিত এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য। এগুলির মধ্যে আবার ঋগ্বেদ সব থেকে প্রাচীন। বৈদিক গ্রন্থাদিতে 'ত্রয়ী' শব্দের উল্লেখ থাকায়, অনেকে প্রথম তিনটিকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে চারটি বেদই সংহিতারূপে প্রামাণ্য এবং অথর্ববেদটি অনেক পরবর্তীকালের রচনা।

ঋগ্বেদে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতি ও দেবতাদের স্তুতিগান করা হয়েছে। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা আছে। সামবেদ ঋগ্বেদের শ্লোকগুলির অনুসরণেই রচিত। অর্থাৎ ঋকের যে শ্লোকগুলি যাগ-যজ্ঞকালে সুরে আবৃত্তি করা হোত তাই সামবেদ। অথর্ববেদে আছে বিচিত্র রহস্যময় সাংকেতিক চিহ্নসমূহ; পৃথিবীর স্তব; সৃষ্টি রহস্য; রোগ, দানব ও হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষার ও চিকিৎসার মন্ত্রাদি।

ব্রাহ্মণ

প্রতিটি বেদের ব্রাহ্মণ নামে বৈদিক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা আছে। আসলে পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি প্রভৃতি নিয়েই এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিকাশ।

আরণ্যক

ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ আরণ্যক নামে পরিচিত। বার্ধক্যে যাঁরা সন্ন্যাসধর্ম (অরণ্যবাস) পালনেচ্ছু তাঁদের উদ্দেশে অপেক্ষাকৃত সহজ যাগ-যজ্ঞ রীতি সন্নিবিষ্ট করে আরণ্যক অংশটি রচিত। এতে অনুষ্ঠানের পরিবর্তে দার্শনিক চিন্তার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উপনিষদ বা বেদান্ত

আরণ্যকগুলির জন্য গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞানলাভ হয়েছিল তার প্রকাশকে উপনিষদ বা বেদান্ত বলা হয়। কারণ কালক্রমে যাগ-যজ্ঞের জটিলতা ও অমানুষিকতা ত্যাগ করে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয়। সেই আলোচনাই উপনিষদ, যাকে বেদের অন্ত বলে, এবং এইখানেই বৈদিক সাহিত্যের শেষ বলা হয়।

বেদাঙ্গ

বেদপাঠ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান শিক্ষার জন্য বেদাঙ্গ রচিত হয়েছিল। বেদপাঠ বলতে বেদগান, সামগান প্রভৃতি বোঝায়। বেদ সর্বদা সুরে আবৃত্তি করার প্রথা এবং তার সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যেরও প্রচলন ছিল। অর্থাৎ বৈদিক যুগে সংগীতের পূর্ণ বিকাশ ছিল: বস্তুত বেদপাঠের ছয়টি অপরিহার্য বিদ্যাকে বেদাঙ্গ বলে। যেমন, ১। শিক্ষা (উচ্চারণ), ২। ছন্দ, ৩। ব্যাকরণ, ৪। নিরুক্ত, ৫। জ্যোতিষ এবং ৬। কল্প। নিরুক্ত ও ব্যাকরণ রচনায় যাস্ক ও পাণিনীর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। এই ছয়টি বিদ্যার মধ্যে কল্পসূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এর বিভিন্ন অংশ শ্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, শুল্বসূত্র ও ধর্মসূত্র নামে পরিচিত।

শ্রোতসূত্রে গার্হস্থ জীবনের বৈদিক কর্মাদির তথা যাগ-যজ্ঞের বিধি-বিধানাদির বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্রে আছে গার্হস্থ জীবনে পালনীয় তথা বিবাহাদির রীতিনীতি। শুল্বসূত্রে যাগ-যজ্ঞের বেদী প্রস্তুতের পরিমাপ দেওয়া আছে, যার থেকে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে। আর ধর্মসূত্রে আছে সমাজ ও শাসন সম্পর্কিত বিবিধ আইন-বিষয়ক বিধিবিধানগুলি। যার থেকে পরবর্তী-কালে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল।

ষড়্দর্শন

ষড়্দর্শন বলতে কপিলের 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', গৌতমের 'ন্যায়', কণাদের 'বৈশাষিক', জৈমিনীর 'পূর্বমীমাংসা' এবং ব্যাসের 'উত্তর মীমাংসা', 'দর্শন' বা 'বেদান্ত দর্শন' বোঝায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য, ধর্মসূত্র বা হিন্দুস্মৃতি

ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলির সঙ্গে পুরোহিতদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যাজ্ঞিক কল্পসূত্রের ভিত্তিতে রচিত ধর্মসূত্র বা হিন্দুস্মৃতি প্রভৃতির থেকে ক্রমে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র (রাষ্ট্রনীতি), সংগীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, কারুকর্ম, স্থাপত্যবিদ্যা, হস্তিশাস্ত্র, অশ্বসূত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতির বিকাশ হয়। অর্থাৎ বেদ চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচিত হয়েছিল এবং তাতে ভারতীয় পূর্বাচার্যদের যে মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তা আজও বিশ্বকে বিস্মিত করে।

গীতশ্রেণী

বৈদিক গানে সাধারণত তিনটি, চারটি বা পাঁচটি পর্যন্ত স্বর ব্যবহৃত হোত। তবে ক্রমে ছয়টি এবং সাতটি স্বরযুক্ত সামগানেরও বিকাশ হয়েছিল। বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে যে বিভিন্ন শ্রেণীর গানের উদ্ভব হয়েছিল সে কথার উল্লেখ অনেকেই করেছেন। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে :

আর্চিক গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।
ঔড়বং ষাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চেতি সপ্তমঃ ॥

এই শ্রেণীবৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে নারদী শিক্ষায় বলা হয়েছে—

একস্বর প্রয়োগোহি আর্চিক সোহাভিধীয়তে।
গাথিকো দ্বিস্বরোজ্ঞেয় স্ত্রিস্বরশ্চৈব সামিকঃ ॥
চতুঃস্বর প্রয়োগোহি কথিতস্তু স্বরান্তরঃ।
ঔড়ুব পঞ্চভিশ্চৈব ষাড়বঃ ষট্ স্বরো ভবেৎ ॥
সম্পূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতযোক্তৃভিঃ ॥

অর্থাৎ আর্চিক একস্বর, গাথিক দুই স্বর, সামিক তিন স্বর, স্বরান্তর চারস্বর, ঔড়ব পাঁচস্বর, ষাড়ব ছয়স্বর এবং সম্পূর্ণ সাত স্বর যুক্ত গান। বৈদিক যুগে এই সাত শ্রেণীর গানের প্রচলন ছিল।

বৈদিক স্বর

বৈদিক সাতটি স্বরকে যথাক্রমে ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য বলা হোত। তবে বৈদিকযুগেই যে লৌকিক সাতটি স্বর এবং তিন স্থানের বিকাশ হয়েছিল সে কথাও পাণিনীয় শিক্ষায় জানা যায়ঃ

উদাত্তে নিষাদ গান্ধারবোনুদাত্ত ঋষভধৈবতৌ।
স্বরিতঃ প্রভবা হ্যেতে ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

অর্থাং উদাত্তে (তার) নি, গ, অনুদাত্তে (মন্দ্র) রে, ধ, এবং স্বরিতে (মধ্য) সা, ম ও প।

যম

মহর্ষি শৌনক স্বরকে বলেছেন 'যম'—"ত্রিষু মন্দ্রাদিষু স্থানেষু একৈকস্মিন সপ্ত সপ্ত যমাঃ ভবন্তি।" অর্থাৎ মন্দ্রাদি তিনটি স্থানে সাতটি করে যম (স্বর) আছে। মনে হয় স্বরের সংজ্ঞা হিসাবে 'যম' শব্দটি সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যম' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টবঙ্গানি
অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

অর্থাৎ যমের নিয়ম হোল অহিংসা, চুরি বা গ্রহণ না করা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রভৃতি। অর্থাৎ যম সর্বদা নিয়ামক (Regulator) হয়ে থাকে।

স্বরমণ্ডল

বৈদিকযুগের গোড়ার দিকে না হলেও কিছুকালের মধ্যেই যে স্বরমণ্ডলের সমাবেশ হয়েছিল সে কথা নারদী শিক্ষায় জানা যায়। তিনি এর পরিচয়ে বলেছেন—

সপ্তস্বরাস্ত্রয়োগ্রামা মূর্ছনাস্তেকবিংশতি।
তানা একোনপঞ্চাশদিতেতৎ স্বরমণ্ডলম্॥

অর্থাৎ সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, একুশটি মূর্ছনা ও একান্নটি তানের সমাবেশকে স্বরমণ্ডল বলে।

বৈদিক যুগে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের যুগ, ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদির যুগ, যাস্ক ও পাণিনীর যুগ, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে সংগীত, ভাষা প্রভৃতির নানা বিবর্তন হয়েছিল। তৎকালীন মনীষীদের রচিত গ্রন্থাদিতে যেসকল সাংগীতিক উপাদানাদি পাওয়া যায় অতঃপর তার কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হোল।

সংগীতের ক্রমবিকাশ

সংগীতশাস্ত্রাদিতে কথিত আছে যে, অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মা সংগীতবিদ্যা সৃষ্টি করে শিবকে এবং শিব সরস্বতীকে দান করেন; পরবর্তীকালে ভূলোকের ভরত, নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা কঠোর সাধনায় সংগীতবিদ্যা লাভ করেন। তবে ইতিহাসের ভিত্তিতে আমরা জানি যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মতঙ্গের সময় পর্যন্ত বৈদিক যুগ হিসাবে স্বীকৃত এবং তখন সামগান, গাথা প্রভৃতির প্রচলন তথা চার থেকে সপ্ত স্বরের বিকাশ হয়েছিল। এর মধ্যে আবার ভরত-পূর্ব এবং ভরতের পরবর্তীকালকে যথাক্রমে ক্লাসিকাল যুগ ও বৈদিক যুগ বলা হয়। অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতির রচনাকালকে নিয়ে কিছু অংশ হোল ক্লাসিকাল যুগ। যখন গ্রাম, মূর্ছনা, জাতি প্রভৃতি সংগীত-পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তখন রাগের বিকাশ ছিল কিনা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। সংগীতশাস্ত্রী P. Sambomoorthy বলেছেন: "…The vedic hymns of this period constitute the oldest hymnal music of humanity. During the post-Bharata period, the raga concept

steadily grew until it reached its perfection in the time of Matanga.[১] অবশ্য তখন রাগ শব্দের প্রচলন না থাকলেও, যাবতীয় সংগীতে রঞ্জকতা যে পরিপূর্ণরূপে ছিল সে বিষয়ে অনেকেই একমত।

রামায়ণ মহাভারতাদিতে বহু বিচিত্র সাংগীতিক উপাদানাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়কালকে সামগানের যুগ বলা যায়। সামগানোত্তর যুগে জাতিরাগাদির বিকাশ হয়। অর্থাৎ পরবর্তী ক্রমবিকাশ হিসাবে জাতিরাগ, গ্রামরাগ, অভিজাত দেশীরাগ প্রভৃতির স্তরগুলি উল্লেখযোগ্য।

ক্লাসিকাল যুগের শেষের দিকে কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু মতঙ্গ প্রমুখ সংগীতাচার্যেরা শুদ্ধিযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক (folk) ও জাতীয় স্বর রচনাগুলিকে পরিশুদ্ধ করে শাস্ত্রীয় রাগ-সংগীত বা অভিজাত দেশীসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ তখন গ্রামরাগাদির সঙ্গে সঙ্গে জন্য-জনক রীতিতে ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি অভিজাত দেশীরাগের বিকাশ হয়। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর বিকাশ হয় আরো পরবর্তীকালে। তখন রাগগুলি ঋতু অনুসারে গাওয়ার প্রথা ছিল। যেমন গ্রীষ্মে—দীপক, বর্ষায়—মেঘ, শরতে—ভৈরব, হেমন্তে—শ্রী, শীতে—মালকোষ এবং বসন্তে—হিন্দোল। (ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই রাগনামগুলিতে কিঞ্চিত পার্থক্য লক্ষিত হয়)। রাগ ছয়টির জন্য ছয়টি করে রাগিনী (ভার্যা) ছিল (এ বিষয়েও মতপার্থক্য বিদ্যমান)। সেই রাগ-রাগিনী পদ্ধতিই কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রচলিত থাট-রাগ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান রাগ সংগীতে ক্লাসিকাল যুগের সংগীতধারাই প্রবাহিত। কিন্তু তাই বলে কোনমতেই একে মার্গসংগীত আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ অত্যন্ত কঠোর সাংস্কৃতিক নিয়মাবদ্ধ সেই মার্গসংগীত বৈদিক যুগেই লুপ্ত হয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হোল সংগীত। অতি প্রাচীনকাল থেকে এর গৌরবময় ঐতিহ্য বিরাজিত। যখন বিশ্বের কোন দেশ সাধারণ লোক-সংগীতের স্তরেও পৌছাতে পারে নি, তখন থেকেই ভারতবর্ষে সংগীতকলার পরিপূর্ণ বিকাশ ছিল। ভারতীয় সংগীত ক্রমবিকাশের কাহিনী অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, এবং এর চর্চা শুধুমাত্র কলাবিদ্যার চর্চাই নয়, একটি জাতির মনীষা

১ P. Sambomoorthy : History of Indian Music. 1960.

সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা। যাঁরা পৃথিবীকে তাল ও সুর সমন্বিত এমন একটি বিদ্যা দান করেছেন।

স্বরাক্ষর পদ্ধতির (সা, রে, গ, ম প্রভৃতি) আবিষ্কার সর্বপ্রথম হয় ভারতবর্ষে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর নারদীশিক্ষাগ্রন্থে। পাশ্চাত্য সংগীতে যার বিকাশ হয় ১০ম শতাব্দীতে (পাশ্চাত্য সংগীত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

নাট্যশাস্ত্রকার বর্ণিত সাংগীতিক উপাদানাদি তথা বাদ্যযন্ত্রাদির শ্রেণীবিভাগ (তত, সুষির, অবনদ্ধ ও ঘন—যথাক্রমে Chordophones, Acrophones, Membranophones & Autophones) প্রভৃতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের প্রধান সহগামী যন্ত্র ছিল বীণা, যার মধ্য ষড়্জ 'আধার ষড়্জ' হিসাবে স্বীকৃত ছিল। অবশ্য তার সঠিক রূপ (pitch/vibration) নিরূপণ করা আজ কঠিন। কারণ বীণার দৈর্ঘ্য প্রভৃতির উপরে তা নির্ভরশীল ছিল। তবে আধার ষড়্জকে কেন্দ্র করেই সর্বদা সামগান লীলায়িত ছিল এমন কথা মনে করা অনুচিত, কারণ ক্রমশ তা মধ্যম, পঞ্চম, আদি স্বরগ্রামে উত্থিত হোত। যে রীতি ঋগ্বেদ মন্ত্রাদি উচ্চারণে আজও অনুসৃত হতে দেখা যায়।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে বিদেশী আক্রমণের সেই দুর্যোগের দিনে ললিতকলাবিদ্যার চর্চা অনেক হ্রাস পায়। তবে ভারতীয় সংস্কৃতি তার গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে চিরকালই বিরাজিত, যার প্রমাণ তৎকালীন সংগীতাচার্যদের সাধনা ও সৃষ্টি থেকে পাওয়া যায়। (সংগীতজ্ঞদের জীবনকথা দ্রষ্টব্য)।

আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে (১৩শ-১৪শ শতাব্দী) সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানী সংগীতের সূত্রপাত হয়েছিল বলা যায়। হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সংগীতের সংজ্ঞা সর্বপ্রথম হরিপাল রচিত সংগীত সুধাকর (১৩০৯-১৩১২ খৃষ্টাব্দে রচিত) গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বেই আরব ও পারসিক প্রভাবে উত্তর ভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতিতে নানা বিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিবর্তনের পর থেকেই শুধু দক্ষিণী সংগীতকে কর্ণাটক বলা আরম্ভ হয়।[১] হিন্দুস্থানী

১ P. Sambomoorthy : History of Indian Music. 1960.

সংগীতের গোড়াপত্তন করেন অতিগুণী ও স্রষ্টা আমীর খসরু। ধ্রুপদগানের সৃষ্টি নাকি তৎকালীন বৈজুবাওরা নামক এক সংগীতগুণীর দ্বারা হয়েছিল। (এই বৈজু বাদশাহ আকবরের সময়ের বৈজু নয়)।[১] অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ কেহ-কেহ রাজা মানকে (১৪৮৬-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) ধ্রুপদের স্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আবার কারো মতে বৈদিক যুগ থেকেই ধ্রুপদ প্রচলিত। যাই হোক উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সংগীতের বিবর্তন আরম্ভ হয় মুসলমান আগমনের পরে। ১৪শ শতকে আমীর খসরু খেয়াল, কাওয়ালি, গজল প্রভৃতি গীতরীতির প্রবর্তন করেন। ১৫শ শতকে জৌনপুরের নবাব সুলতান হুসেন শর্কী খেয়াল গানের আরো উন্নতি বিধান করেন। গোড়ার দিকে খেয়াল ছিল কিঞ্চিত নিয়মভঙ্গ ধ্রুপদের মতো। ক্রমে নানা তান, অলংকারাদির প্রয়োগসহ ছোটো ও বড়ো দুই প্রকার খেয়ালের বিকাশ হয়। এর চরম উৎকর্ষসাধন করেন তানসেন-বংশীয় ন্যামৎ খাঁ (সদারঙ্গ)। খেয়ালের যাবতীয় বিবর্তন দিল্লীতেই হয়, এই সংগীতধারার বাহকদের বলা হোত কব্বাল ঘরাণা। কব্বাল বংশের গোলাম রসুল খেয়ালের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন, এবং তিনি স্বয়ং অতিগুণী শিল্পী ছিলেন (ক)। তাঁর পুত্র গোলাম নবী (শোরী মিঞা) 'টপ্পা' গীতরীতির প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে টপ্পা গানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। গোলাম রসুলের দৌহিত্র শক্কর ও মখ্‌খন খেয়ালীয়া হিসাবে সংগীত-জগতে প্রসিদ্ধ। গোয়ালিয়রবাসী নথন পীরবক্স ধ্রুপদী বংশীয় হলেও সদারঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং খেয়াল গাইতেন। নথন পীরবক্সের পৌত্র হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ ও নথ্থু খাঁ বিখ্যাত খেয়ালীয়া ছিলেন। এঁদের তিনটি ঘরাণা থেকেই খেয়াল গীতরীতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে।

ঠুংরী হোল খেয়াল গানের রাগ ও রীতিভ্রষ্ট একপ্রকার চটুল গীতরীতি। সর্বপ্রথম এর প্রচলন হয় বারাণসীতে। গ্রাম্য গীতি থেকেই নাকি এর বিকাশ। তবে বর্তমান বারাণসী ঘরাণার প্রধান প্রচারক ছিলেন ঠুংরী সম্রাট মৈজুদ্দীন খাঁ। লক্ষ্ণৌতে ঠুংরীর প্রচারক হলেন নবাব ওয়াজেদআলী শাহ। পাঞ্জাবী

১ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান। ১৩৬৪।

ক জীবনকথা দ্রষ্টব্য।

ঠুংরী সম্ভবত এগুলির মিশ্রণে সৃষ্ট। তবে পাঞ্জাবী ঠুংরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল কতকগুলি স্থানীয় অলংকার প্রয়োগ। হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রধান চারটি ধারা হোল—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। ২০শ শতাব্দীতে ধ্রুপদ ও টপ্পা গানের শিল্পী অপেক্ষাকৃত কমে গেছে। তবে খেয়াল ও ঠুংরী গান বিভিন্ন গুণীর মাধ্যমে নব নব রূপে বিকাশলাভ করেছে। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে শাখা-বহুল অসংখ্য আঞ্চলিক ও জাতীয় সংগীতের প্রচলন আছে। যেমন, পাঞ্জাবের ভাঙড়া, হীড়; রাজস্থানের মাণ্ড; বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চৈতী, সাবণী, লাবণী, বিরহা, কজরী; আসামের বনগীত, বিহুগীত; বাংলার কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি। যার পূর্ণ বিবরণের জন্য একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আবশ্যক। তবে কিছু-কিছু পরিচয় "গীতরীতি প্রসঙ্গ" পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত হিসাবে বাংলার রবীন্দ্রসংগীত স্বীকৃত।

জীবন কথা প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহর্ষি পাণিনি

(খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী)

মহর্ষি পাণিনি তাঁর 'পাণিনীয় শিক্ষা' গ্রন্থখানি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচনা করেছেন বলে স্থির করা হয়েছে। স্বরোৎপত্তি, তাল, মাত্রাদির তিনি যে দার্শনিক বিবরণ দিয়েছেন পরবর্তী সকল শাস্ত্রীরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। স্বরোৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন :

আত্মা বুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তুরসি চরণ্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥

অর্থাৎ বুদ্ধি বা চৈতন্যযুক্ত আত্মা প্রথমে মনকে প্রেরণ করে, যা দেহের মধ্যে অগ্নি সঞ্চার করে, অগ্নি প্রাণবায়ু প্রেরণ করে যা উরদেশে আহত হয়ে নাদ (স্বর) সৃষ্টি করে।

পূর্ববর্তী ঋষি শৌনক পঞ্চবায়ুর বর্ণনাকালে বলেছেন যে প্রাণবায়ুর স্থিতি নাভিমূলে, শ্বাস ব্যাহত হলেই নাদের সৃষ্টি হয় এবং নাদই পৃথিবীর সব কিছু উৎপত্তির মূল কারণ। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে তাই নাদকেই শব্দব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে তিনি আটটি অংশে বর্ণনা করেছেন। স্থান স্বর হিসাবে তিনি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতকে গ্রহণ করেছেন। স্বরের আটটি স্থানে অধিষ্ঠানের বর্ণনায় তিনি উরঃ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ্য ও তালু'র উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এই সকল স্থান স্বরোচ্চারণে সহায়তা করে। দিবা ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ে বেদপাঠের কিরূপ স্বরোচ্চারণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, সে বিষয়ের বর্ণনা করে তিনি বলেছেন :

প্রাতঃ পাঠেন্নিত্যমুরসিস্থিতেন স্বরেন শার্দূলরুতোপমেন।
মাধ্যন্দিনে কণ্ঠগতেন চৈব চক্রাহ্ব সংকুচিত সংনিভেন॥
তারন্তু বিদ্যাৎ সবনং তৃতীয়ং শিরোগতন্তচ্চ সদা প্রয়োজ্যম্।
ময়ূদংসাম্ভূত স্বরাণাং তুল্যেন নাদেন শিরস্থিতেন॥

অর্থাৎ প্রাতঃকালে বক্ষ থেকে উৎপন্ন শার্দুলের মতো, মধ্যাহ্নে চক্রবাকের মতো এবং সায়াহ্নে ময়ূর, হংস বা কোকিলের মতো স্বরোচ্চারণ সহযোগে পাঠ করা কর্তব্য।

সম্ভবতঃ এর থেকেই পরবর্তীকালে রাগ-গায়নের সময়-বিভাজন ব্যবস্থা এবং পশুপক্ষীর ধ্বনি অনুকরণের কথা থেকে সপ্তস্বরের জন্ম-রহস্যের সঙ্গে পশু-পক্ষীর ধ্বনির সম্পর্ক স্থির করা হয়েছে। কাল-নিয়ন্ত্রণ (তাল) প্রসঙ্গে তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তথা দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত মাত্রার বর্ণনা করেছেন। এই সকল মাত্রার বর্ণনাতেও তিনি পশুপক্ষীর ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন:

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং ত্বেব বায়সঃ।
শিখী ত্রিমাত্রাং তু নকুলস্ত্বর্ধমাত্রকম্॥

অর্থাৎ নীলকণ্ঠের ধ্বনিতে এক মাত্রা, কাকের ধ্বনিতে দুই মাত্রা, ময়ূরের ধ্বনিতে তিন মাত্রা এবং নেউলের ধ্বনিতে অর্ধ মাত্রা।

সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনানুসারে পরবর্তীকালে বহু শ্লোকের রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু মহর্ষি পাণিনির বর্ণনাগুলি প্রায় অপরিবর্তনীয়রূপেই অনুসৃত হয়ে আসছে।

রামায়ণ ও মহাভারত
(খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতাব্দী)

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত বা সংকলিত হয়েছিল যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারত নামক মহাগ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। যদিও এই গ্রন্থদ্বয় সংগীত-সম্পর্কিত নয়, কিন্তু এ দুটিতে যে তথ্যবহুল ইতিহাস আছে, তার থেকে খৃষ্টপূর্বাব্দের ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতা ও সংগীত প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মতো রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত। এমন কি, তখন পুরুষমেধ যজ্ঞেরও প্রচলন ছিল। সেই যজ্ঞে ১০৮টি পর্যন্ত নরবলির প্রথা ছিল। এ ছাড়া ঋষি, রাজা, বীরপুরুষ প্রভৃতির স্তুতিগাথা সুরে আবৃত্তি করাও সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল।

মহর্ষি বাল্মীকি বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংগীতেই যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে কথা বালকাণ্ডের শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায়। তিনি পূর্বের সংগীতাচার্য হিসাবে ভরতের নামোল্লেখ করেছেন। এই ভরত সম্ভবতঃ আদি, বৃদ্ধ, সদাশিব অথবা ব্রহ্মভরত। তখন দেশনায়ক এবং নৃপতিরা সংগীতের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরুষের মতো নারীদেরও (এমন কি, অসূর্যম্পশ্যা রমণীদেরও) সংগীতানুশীলনের প্রথা ছিল। নট, নর্তক, সেবাদাসী প্রভৃতির রাজদরবারে তথা সমাজে যথেষ্ট সমাদর ছিল। তৎকালীন সমাজে সংগীতবিদ্যা যে খুব সম্মানের ছিল তার নানা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, দশরথের মৃত্যুর পরে একজন ন্যায়বান ও সর্বপ্রতিপালক নৃপতি নির্বাচনের জন্য অমাত্যগণ যে-সকল কারণ দেখিয়েছিলেন তার একটি হল: 'রাজা বিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, গীত, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনো কিছুরই পুষ্টিলাভ হয় না।' এ ছাড়া দশরথের মৃত্যু সংবাদ না জেনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করেই ভরত উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজ্যে অবশ্যই কোনো অমঙ্গল ঘটেছে। কারণ নগরীতে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন যে, সেখানে বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার স্তব্ধ এবং কোথাও সংগীতের লেশমাত্র নেই—

ভেরীমৃদঙ্গবীণানাং কোনসংঘটিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দোবিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরাঃ॥

এর থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজে সংগীতের শ্রদ্ধার আসন ছিল। তখন সংগীতবিহীন কোনো রাজ্যের কল্পনাই ছিল অসম্ভব। বস্তুতঃ রামায়ণের প্রতিটি অধ্যায়েই নৃত্য, গীত, ও বাদ্যের কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

মহর্ষির মতে রাগ বিকাশের জন্য স্বর সমূহের লাবণ্য গুণ অবশ্যই থাকা চাই। তিনি রাগ লীলায়িত ও পরিস্ফুট করার যাবতীয় সাংগীতিক উপাদান-গুলির পরিচয় কুশীলবের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কুশীলব সম্পর্কে নানা মতভেদ প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষিত হয়। নাট্যশাস্ত্রকার কুশীলবের পরিচয়ে বলেছেন:

নানাতোদ্যবিধানে প্রয়োগযুক্ত প্রবাদানে কুশলঃ।
আতোদ্যহংপ্যাতিকুশলো যস্মাৎ স কুশীলবস্তস্মাৎ॥

অর্থাৎ এখানে নাটকের উপযোগী গীত-বাদ্যের কুশল শিল্পীমাত্রকেই কুশীলব বলা হয়েছে। আসলে সেই যুগে গায়ক বলতে আখ্যান-কথক বা সভাগায়ক ('Story teller with tune' বা 'Court Singer') বোঝাত।

প্রাচীন ভারতে বংশানুক্রমে মুখে মুখে গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এমন কি, রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, গন্ধর্ব ও ঋষি মুনিরাও বিশেষভাবে সংগীতচর্চা করতেন। দেবদাসীরা ছাড়াও সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরাও স্বাধীন-ভাবে নৃত্য-গীতে যোগ দিতেন। তখন গানকে বলা হত গান্ধর্ব। 'বালকাণ্ডে' সাতটি শুদ্ধ জাতি রাগ এবং 'সুন্দরকাণ্ডে' কৈশিক রাগের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তখন গান্ধর্ব হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগের প্রচলন ছিল। প্রসঙ্গতঃ মহর্ষি স্বর, স্থান, মূর্ছনা, লয়ভেদ, আটটি রস ইত্যাদির স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কাকু স্বরের রহস্যও জানতেন। কুশীলবকে উপলক্ষ করে গান্ধর্বের আলোচনায় তিনি 'উত্তরকাণ্ডে' বলেছেন :

> তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্।
> অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলংকৃতাম্॥
> প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয় সমন্বিতাম্।

এর মূলগত অর্থ হল, মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য কণ্ঠস্বরের যে ভিন্নতা বা বিচিত্রতা ব্যক্ত হয় তার নাম কাকু।

মহাভারত রচয়িতা 'ব্যাস' কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারণ অনেকে 'নারদ', 'ভরত' প্রভৃতির মতো ব্যাসকেও একটি উপাধিবিশেষ বলে মনে করেন।

মহাভারত হল ভরত রাজবংশের ঐতিহাসিক কাহিনী। ভরত রাজার নামানুসারেই এদেশের নামকরণ ভারতবর্ষ হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভরত রাজারই বংশধর। এই যুগে সামাজিক চিন্তাধারা শিল্প ও সংস্কৃতি প্রভৃতি রামায়ণের যুগ থেকে উন্নততর ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু মহাভারতে সাংগীতিক উপাদানাদির তেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু সংগীত যে তখন অত্যন্ত আদরণীয় ছিল তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাম, স্তুতি, স্তোত্র, গাথা প্রভৃতির তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তখন গানের সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যের সমাবেশ থাকতো। আবার গান ছাড়াও বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন ছিল। তখন পুরাণবিদ্, আখ্যানবিদ্, নট, নটী, বৈতালিক, বন্দী, সূত,

মাগধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতিরা দেবতা, রাজা, বীরপুরুষ বা তাদের বংশের স্তুতি-গান করতো। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সপ্ততন্ত্রী বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝর্ঝর, আনখ, গোমুখ, পনব, আড়ম্বর, তুরী, ভেরী, পুষ্কর, ঘণ্টা, গজঘণ্টা, ঝল্লকী, নূপুর, শিঞ্জির, পটাহ, বারিজ, দুন্দুভি, দেবদুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এছাড়া 'অশ্বমেধিকাপর্বে' ষড়জাদি স্বরোৎপত্তির যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, স্বর সৃষ্টির মর্মকথায় মতঙ্গদেব সম্ভবতঃ তাকেই অনুসরণ করেছেন। মহাভারতকার বলেছেন :

আকাশমুত্তমং ভূতম্ অহংকারস্ততঃ পরঃ।
অহংকারাৎ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা ততঃ পরঃ॥

অর্থাৎ সাংগীতিক স্বরের কারণ হল আত্মা। পরবর্তী সকল শাস্ত্রীরাই এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন। তাঁরা গীতকে নাদময় বলেছেন। সিংহ-ভূপাল বলেছেন 'নাদাত্মকম্ নাদ আত্মাস্বরূপং যস্য'। মতঙ্গদেব তো নাদতনু আত্মাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত বলেছেন :

নাদরূপঃ স্মৃতো ব্রহ্মা নাদরূপো জনার্দনঃ।
নাদরূপা পরাশক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ॥

অর্থাৎ মহাভারতে যা বীজাকারে ছিল কালক্রমে তা ফুলে ফলে শোভিত বৃক্ষে বিকাশলাভ করেছে। 'অনুশাসনপর্বে' বিভিন্ন তালেরও নামোল্লেখ আছে—

পাণিতালসতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথা।
সম্প্রহৃষ্টৈঃ প্রনৃত্যাদ্ভিঃ শর্বস্তত্রনিষেব্যতে॥

নাট্যশাস্ত্রকার এই সকল তালের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। (ভরত দ্রষ্টব্য)

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা
(খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী)

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারণ শিক্ষাকার, সংহিতাকার ও মহাভারতে উল্লিখিত মোট তিনজন যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে উক্ত গ্রন্থে ভরদ্বাজ, গৌতম, গার্গ্য প্রমুখ ঋষিদের নামোল্লেখ থাকায় এবং অনুন্নত সাংগীতিক উপাদানাদি ও ভাষা প্রভৃতি পর্যালোচনা করে গবেষকগণ শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্যের অভ্যুদয়কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী স্থির করেছেন।

যদিও খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় মহর্ষি নারদ সাতটি স্বরের জন্য পাঁচটি রসযুক্ত শ্রুতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সংগীত-প্রশস্তি প্রসঙ্গে আছে—

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥

অর্থাৎ গীত, বাদ্য, শ্রুতি, জাতি, তাল, প্রভৃতিতে বিশারদ হলে তবেই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব। এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, খৃষ্টীয় অব্দের বহু পূর্ব থেকেই সংগীতে শ্রুতি, জাতিরাগ, তাল প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য স্বরের তিনটি লক্ষণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উদাত্তাদি তিনটি স্থান-স্বরেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি এই স্বর তিনটিকে বৈদিক বলে উল্লেখ করে এদের দেবতা, জাতি, বর্ণ, প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। যেমন—

স্বর	স্থান	বর্ণ	দেবতা	জাতি	ঋষি	ছন্দ
উদাত্ত	উচ্চ	শুক্ল	অগ্নি	ব্রাহ্মণ	ভরদ্বাজ	গায়ত্রী
অনুদাত্ত	নীচ	লোহিত	সোম (তেজঃ)	ক্ষত্রিয়	গৌতম	ত্রৈষ্টুভ
স্বরিত	মধ্যম	কৃষ্ণ	সবিতা	বৈশ্য	গার্গ্য	জগতী

এ ছাড়া তিনি পূর্বাচার্যদের মতো সাংগীতিক নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। যেমন বেদপাঠে ব্যবহৃত আটটি সহকারী স্বর: জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষৈত্র, প্রশ্লিষ্ট, তৈরোব্যঞ্জন, তৈরোবিরাম, পাদবৃত্ত ও তাথাভাব্য প্রভৃতি, দিবা-রাত্রির বিভিন্ন সময়ে বেদপাঠের জন্য কণ্ঠস্বর সাধনা, উদাত্তাদি স্থানত্রয়ের স্বরসমূহ অঙ্গুলি উত্তোলনের সাহায্যে কীভাবে উচ্চারণ করা উচিত, এমন কি, তিনি সপ্তস্বরের সাম্য রক্ষার্থে শ্রুতি বিভাজনও করেছেন যা আজও

প্রচলিত। এর থেকে তৎকালীন সংগীতে বাইশটি শ্রুতি স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়

স্থান	লৌকিকস্বর	শ্রুতিসংখ্যা	ব্যবধান
উদাত্ত (উচ্চ)	গান্ধার (৩) নিষাদ (৭)	২	ক্ষুদ্রান্তর
অনুদাত্ত (নীচ)	ঋষভ (২) ধৈবত (৬)	৩	মধ্যান্তর
স্বরিত (মধ্য)	ষড়্‌জ (২) মধ্যম (৪) পঞ্চম (১)	৪	বৃহদন্তর

তিনি সংগীত শিক্ষার্থীদের জন্য বলেছেন, যার প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ও ওষ্ঠ্য শোভন ও সুন্দর, যে প্রগল্‌ভ বা ভীত নয় কিন্তু বিনীত এবং যার কণ্ঠস্বর অণুনাসিক নয়, সে উপযুক্ত। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট রাখার জন্য তিনি আম্র, বিল্ব, পলাশ, প্রভৃতি গাছের ডাল দিয়ে দন্ত ধৌত করার কথা বলেছেন। তালাধ্যায়ে, মাত্রার ব্যাখ্যায় তাঁর উদাহরণ ও বর্ণনাকে অতুলনীয় বলা যায়—

সূর্যরশ্মিপ্রতীকাশাৎ কণিকা যত্র দৃশ্যতে।
অণবস্তু তু সা মাত্রা মাত্রা তু চতুরণবা ॥

অর্থাৎ সূর্যের আলোতে যে রেণুর কল্পনা করা যায় তার চারটি অণুর সমবায় একটি মাত্রা। মাত্রার বিকাশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—কণ্ঠে দুই মাত্রা, জিহ্বাগ্রে তিনমাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলি অর্ধমাত্রাবিশিষ্ট। মাত্রাসংখ্যার নাম সম্পর্কে বলেছেন একমাত্রা হ্রস্ব, দুইমাত্রা দীর্ঘ, তিনমাত্রা প্লুত ইত্যাদি। এছাড়া তিনি পূর্বাচার্যদের মতো পশুপক্ষীর ধ্বনিতে মাত্রা স্থিতির উল্লেখও করেছেন।

মাণ্ডুকীশিক্ষা
(খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী)

মাণ্ডুকী শিক্ষাকার ঋষি মণ্ডুকের অভ্যুদয়কাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী স্থির করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমেই তিনি মাত্রা (লয়) সম্বন্ধে বলেছেন:

"ত্রিস্রো বৃত্তিরনুক্রান্তা দ্রুতমধ্যবিলম্বিতা" অর্থাৎ দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে মাত্রা তিন প্রকার। সামগানের স্বরের পরিচয়ে তিনি শুধু ষড়্‌জাদি লৌকিক সাত স্বরের নামোল্লেখ করেছেন। উদাত্তাদি স্থানস্বর সম্বন্ধে বলেছেন :

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতঃ প্রচিতস্তথা।
চতুর্বিধং স্বরো দৃষ্টঃ স্বরচিন্তাবিশারদৈঃ॥

অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় এই চারটি স্থানস্বর। (অবশ্য প্রচয় স্বরিতেরই অন্তর্ভুক্ত)। ইনিও যাজ্ঞবল্ক্যের মতো স্বর নিয়মন প্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন। গায়কদের কিভাবে দন্ত ধাবন করা উচিত তারও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে কিভাবে স্বরোচ্চারণ করা কর্তব্য, পশুপক্ষীর ধ্বনির উপমাসহ পূর্বাচার্যদের মতো তারও উল্লেখ করেছেন। পশুপক্ষীর ধ্বনিতে স্বরস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন :

ষড়্‌জে বদতি ময়ূরো গাভো রম্ভতি চর্ষভঃ।
অজা বদতি গান্ধারো ক্রৌঞ্চনাদস্তু মধ্যমে॥
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চম স্বরে।
অশ্বস্তু ধৈবতে প্রাহ কুঞ্জরস্তু নিষাদবনে॥

অর্থাৎ ময়ুর থেকে ষড়্‌জ, গাভী থেকে ঋষভ, ছাগল থেকে গান্ধার, বক থেকে মধ্যম, কোকিল থেকে পঞ্চম, অশ্ব থেকে ধৈবত এবং হাতীর ধ্বনি থেকে নিষাদ স্বরের উৎপত্তি।

সপ্তস্বর সহযোগে সামগানকারীদের তিনি বিচক্ষণ বলেছেন। সামগানের সময়ে স্বরগুলির স্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে হস্ত-সঞ্চালন বা অঙ্গুলি সংকেত সহযোগে নির্দেশের বিধি ছিল। যার প্রমাণ "যথা বাণী তথা পানী", "যত্রৈব তু স্থিতা 'বাণী পাণিস্তত্রৈব ধার্যতে" বা "ঋগ্‌ যজুঃ সামগাদীনি হস্তহীনানি যঃ পঠেৎ" প্রভৃতি উক্তি থেকে পাওয়া যায়।

তিনি 'তথাভাব্যকে' বর্জন করে সাতটি সহকারী স্বরের নামোল্লেখ করেছেন। শিক্ষাকারদের মধ্যে এইরূপ মতপার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তিনি সপ্তস্বরের বর্ণেরও উল্লেখ করেছেন, যথা ষড়্‌জ—পদ্মপত্র, ঋষভ—শুকপিঞ্জর, গান্ধার—স্বর্ণাভ, মধ্যম—কুন্দফুল, পঞ্চম—কৃষ্ণ, ধৈবত—পীত এবং নিষাদ—সর্ববর্ণযুক্ত। এই বর্ণনা অস্বাভাবিক নয়। কারণ 'স্বর'

কম্পনের সমষ্টি এবং বর্ণও তাই। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেও স্বরের বর্ণ স্বীকৃত।

নারদীশিক্ষা
(১ম শতাব্দী)

পৌরাণিক তথ্যানুসারে অন্ততঃ চারজন নারদের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা নারদীশিক্ষাকার, সংগীতমকরন্দকার, পঞ্চমসংহিতাকার এবং রাগ নিরূপণকার নারদ। এ্যালেন ডানিয়েলু (Alian Danielou) তাঁর 'North Indian Music' গ্রন্থে এঁদের বিভিন্ন সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদও আছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এঁকে মহর্ষি, দেবর্ষি, ঋষি, গান্ধর্ব, মহাতেজা বীণাবাহনকারী প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। অনেকের মতে নারদ একটি সম্প্রদায় বা উপাধি-বিশেষ শব্দ। তাই প্রকৃত নারদকে আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে নারদীশিক্ষা এবং সংগীত মকরন্দকার গ্রন্থদ্বয় যে বিভিন্ন সময়ের দুইজন নারদ রচনা করেছেন সে বিষয়ে অনেকেই একমত এবং নানাদিক দিয়ে বিচার করে এ দুটির রচনাকাল যথাক্রমে খৃষ্টীয় ১ম/২য় এবং ১৪শ/১৫শ শতাব্দী স্থির করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বৈদিক সংগীতের পরিচয় যেমন বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে, তেমন আর কোনো শিক্ষা বা সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থে নেই। পূর্বাচার্যদের মতো সাংগীতিক নানা উপাদানাদির আলোচনার সঙ্গে গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়ে অভিনব আলোকপাত করেছেন। অবতারণায় তিনি স্থানস্বর ও গানের জাতিভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন :

অথাতঃ স্বরশাস্ত্রাণাং সর্বেষাং বেদনিশ্চয়ম্।
উচ্চনীচ বিশেষাদ্ধি স্বরাণ্যন্যং প্রবর্ততে ॥
আর্চিকং গাথিকং চৈব সামিকং চ স্বরান্তরম্।
কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ ॥
একান্তরস্বরো হ্যৃক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তর স্বরঃ।
সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেবতাবৎ স্বরতোন্তরম্ ॥

অর্থাৎ উচ্চ নীচ ও মধ্য স্থানস্বরগুলি বৈদিকগানে ব্যবহৃত হত। স্বর-সংখ্যার তারতম্য ও প্রয়োগানুসারে গানের জাতিভেদ ছিল। যেমন আর্চিক এক স্বরযুক্ত গান, গাথিক দুই স্বরযুক্ত গান, সামিক তিন স্বরযুক্ত গান, ইত্যাদি।

ষড়্জাদি স্বরোৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি পূর্বাচার্যদের মতো পশুপক্ষীর ধ্বনির কথা বলেছেন। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বরোৎপত্তির পরিচয়ে তিনি পূর্বাচার্যদের মতো কণ্ঠ থেকে ষড়্জ, শির থেকে ঋষভ, নাসিকা থেকে গান্ধার, উরঃ থেকে মধ্যম, উরঃ শির ও কণ্ঠ থেকে পঞ্চম, ললাট থেকে ধৈবত এবং সর্বসন্ধি থেকে নিষাদের উৎপত্তির কথা বলেছেন।

আবার অন্যত্র তিনি ষড়্জাদি স্বরগুলির নামোৎপত্তির পরিচয়ে বলেছেন নাসা, উর, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টি স্থানে আহত হয়ে স্বর উৎপন্ন হয় বলে প্রথম স্বরটির নাম ষড়্জ। এইরূপে অন্যান্য স্বর সম্পর্কে বলেছেন, নাভি থেকে বায়ু উত্থিত হয়ে কণ্ঠ ও শীর্ষে আহত হয়ে বৃষের মতো ধ্বনি সৃষ্টি হয় বলে ঋষভ; বায়ু কণ্ঠ ও শীর্ষে আহত হয়ে বিচিত্র এবং পবিত্র গন্ধের সৃষ্টি হলে গান্ধার; উর ও হৃদয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া গভীর ধ্বনি বা মহানাদকে মধ্যম; বায়ু নাভি, উর, হৃদয়, কণ্ঠ ও শির এই পাঁচ স্থানে আহত হয়ে যে ধ্বনির সৃষ্টি তাকে পঞ্চম এবং দুটি স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানে আহত হয়ে ধৈবত ও নিষাদের সৃষ্টি। স্বর সমূহের জাতির পরিচয়ে বলেছেন, সা, ম ও প ব্রাহ্মণ, রে ও ধ ক্ষত্রিয়, গ বৈশ্য এবং নি বৈশ্য ও শূদ্রজাতির স্বর। জাতির ব্যাখ্যায় এখানে শ্রুত্যন্তরও প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। প্রাচীন সংগীতাচার্যদের মধ্যে নারদই যাবতীয় সাংগীতিক উপাদানের মধ্যে শ্রুতিকে প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ক্রুষ্টাদি স্বরের শ্রুতির পরিচয়ে পাঁচটি রসানুবিদ্ধ শ্রুতির নামোল্লেখ করেছেন:

দীপ্তায়তা করুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা।
শ্রুতিনাং যোঽবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে॥

অর্থাৎ দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা এই পাঁচটি শ্রুতি। শ্রুতির প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে যিনি সজ্ঞান নন তাঁকে আচার্য বলা যায় না। এখানে লক্ষ্যণীয় যে প্রকারান্তরে তিনি বাইশটি শ্রুতি স্বীকার করলেও মাত্র পাঁচটি

শ্রুতির উল্লেখ করেছেন। তিনি শ্রুতিগুলির রস ও ভাবের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

১। দীপ্তা—শৌর্য, বীর্য, তেজোদীপ্ত, গাম্ভীর্য প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক এবং রৌদ্ররসের পরিণতি।

২। আয়তা—অসীমতা, প্রসন্নতা, উদারতা প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক এবং বীররসের পরিণতি।

৩। করুণা—কারুণ্য, কোমলতা, শোক প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক এবং করুণরসের পরিণতি।

৪। মৃদু—নম্রতা, প্রীতি, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক এবং শান্ত-রসের পরিণতি।

৫। মধ্যা—সংযম, মমতা প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক এবং অদ্ভুতরসের পরিণতি।

পরবর্তীকালে এর থেকেই নবরসের ক্রমবিকাশ হয়েছে বলে মনে হয়। বৈদিক ও লৌকিক গানের দোষ গুণের পরিচয় তিনি রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট, শুক্ল, সম, সুকুমার ও মধুর এই দশটি গুণ এবং শংকিত, কম্পিত, কর্কশ, উচ্চ, তীক্ষ্ণ, বিরস, ব্যাকুলিত প্রভৃতি দোষ বলে উল্লেখ করেছেন। পরে এর থেকেই 'গায়কের দোষ ও গুণ' বিষয়ক পরিচ্ছেদটির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। 'রাগ' শব্দের উল্লেখ এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তিনি তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতিকে পবিত্র ও কল্যাণকর বলে উল্লেখ করেছেন :

তান রাগ স্বর গ্রাম মূর্ছনাং তু লক্ষণম্।
পবিত্রং পাবণং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্তিতম্॥

এছাড়া তিনি ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম, কৌশিক, মধ্যম, সাধারিত ও কৌশিক-মধ্যম—এই সাতটি গ্রামরাগের স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন :

ঈষৎস্পৃষ্টো নিষাদস্তু গান্ধারশ্চাধিকোভবেৎ।
ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্জগ্রামং তু নির্দিশেৎ॥
অন্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্॥

কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমস্ততঃ।
যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ॥
কাকলিদৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্ত তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রাম সম্ভবম্॥

শার্ঙ্গদেব এগুলিকে শুদ্ধরাগ তথা শুদ্ধ গ্রামরাগ বলেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে প্রাপ্ত কুড়ুমিয়ামালার প্রস্তরলিপিতে নারদকৃত সাতটি গ্রামরাগের সংকেতলিপি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই লিপি এবং এই বর্ণনানুসারে এগুলির বর্তমান স্বরূপ নির্ণয় করা আজ সম্ভবপর নয়।

নারদ সংগীতশিক্ষার্থীদের জন্য বলেছেন, অনুশীলনকালে শরীর স্থির থাকা উচিত এবং অভ্যাসের সময়ে দ্রুত, প্রয়োগের সময়ে মধ্য ও শিক্ষাদানকালে বিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ করা কর্তব্য।

নাট্যশাস্ত্র

(খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী)

মহর্ষি ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্র ভারতবর্ষের আদি কথা শ্রেষ্ঠ সংগীতগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। কথিত আছে যে, সংগীতস্রষ্টা ব্রহ্মার কাছে সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করে ভরত এই গ্রন্থ (যা পঞ্চমবেদ নামে খ্যাত) রচনা করেন। তবে 'ভরত' নামটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং এঁর অভ্যুদয়কাল ও নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

রামায়ণে ব্যালী, ব্যাস, বাসুকী, বামদেব, ধেনুকা, দ্রোহিণী, দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বতর, তুম্বুরু, রাবণ, বিশ্বাবসু প্রমুখ সংগীতাচার্যকে ভরতের পূর্বাচার্য বলা হয়েছে এবং নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই হিসাবে এর রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে বোঝায়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে উক্ত সংগীতাচার্যদের উল্লেখ নেই। এখানে বলে রাখা কর্তব্য যে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা তথা নাট্যশাস্ত্রে নট বা অভিনেতাকে ভরত বলা হয়েছে। সারদাতনয়, বিশ্বরূপ প্রমুখ ভাষ্য-কারেরা ভরত শব্দটি নট অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এটি একটি গোত্র-বাচক শব্দ। তাছাড়া কথিত আছে, তৎকালীন শিষ্যেরা নাকি গুরুর নাম বা পদবী গ্রহণ করতেন। সেই হিসাবে একে একটি উপাধি-বিশেষ শব্দ বলা যায়। তাই অনেকে মনে করেন যে, তখন 'নারদ' ও 'ভরত' নামে দুটি নট-সম্প্রদায়

ছিল। সুতরাং এঁদের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কঠিন এবং নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা একাধিক হওয়া বিচিত্র নয়।

কবি রামকৃষ্ণ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত রচিত ৩৬০০০ শ্লোকপূর্ণ একখানি 'নাট্যশাস্ত্র' বা 'নাট্যবেদ' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তবে সারদাতনয়, রাঘবভট্ট প্রমুখ সংগীত-শাস্ত্রীরা উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আদিভরত, সদাশিবভরত বা বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ করেছেন। ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়া তাঁর "History of Classical Sanskrit Literature' (1949) গ্রন্থে পিতামহ ব্রহ্মা রচিত 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন যে, ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মাদ্রাজের কবি রামকৃষ্ণের কাছে রক্ষিত আছে, যাতে ৩৬০০০ শ্লোক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মাত্র তিনটি অভিনয় এবং দুটি সংগীতবিষয়ক মোট পাঁচটি অধ্যায় পাওয়া গেছে। সেই গ্রন্থে কোনো প্রাচীন সংগীতাচার্য বা গ্রন্থাদির উল্লেখ না থাকায় সেইটিই প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে অনেকে অনুমান করেন। এই 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানির সারসংকলন করে আদিভরত সদাশিবভরত বা বৃদ্ধভরত নাকি ১২০০০ শ্লোকযুক্ত 'সদাশিবভরতম্' গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে সারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের দুটি অঙ্গ বা সংস্করণের কথা বলেছেন। যার প্রথমটি ১২০০০ শ্লোকপূর্ণ 'নাট্যশাস্ত্র' এবং দ্বিতীয়টি ৬০০০ শ্লোকপূর্ণ 'নাট্যবেদাগম্'। এ ছাড়া তিনি 'পঞ্চভরতোপাখ্যান' গ্রন্থে পঞ্চভরতের নামোল্লেখ করেছেন। যার থেকে মনে হয় যে একজন ভরতমুনির পাঁচজন শিষ্য ছিল এবং তাদেরও ভরত বলা হত। এঁদের প্রথম জন আদিভরত মুনি এবং অপর পাঁচজন হল যথাক্রমে নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কশ্যপভরত, কোহল-ভরত ও তণ্ডু বা যাষ্টিকভরত। অর্থাৎ অন্ততঃ ছয়জন ভরত এই 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেছেন কিম্বা এর প্রচার করে যশস্বী হয়েছেন। কিন্তু এই পঞ্চভরতের কথাও কাল্পনিক মনে হয়, কারণ স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রকার তাঁর একশত বিচক্ষণ শিষ্য বা পুত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে শাণ্ডিল্য, বাৎস, কোহল, দত্তিল, তণ্ডু, তণ্ড্য, বিপুল, বাদরি, কপিঞ্জল, শালিক, শালিকর্ণ, পিঙ্গল, গৌতম, বদরায়ন, কালিয়, হরিণাক্ষ্য, শ্যামায়ন, পঞ্চশিখ, রুদ্র, বীরপ্রমুখ সংগীতাচার্যের উল্লেখ করেছেন। এঁরা সকলেই ভরত বা নট। তবে সারদাতনয় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতের উল্লেখ করে বলেছেন: 'তানব্রবীৎ নাট্যবেদং ভরত ইতি পিতামহঃ', এই পিতামহই ব্রহ্মা। অন্যত্র তিনি পদ্মভু ব্রহ্মাকে নাট্যশাস্ত্রের আদি রচয়িতা বলেছেন: 'প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ, দ্রুহিণাত্তশ্চ তান্যেব' প্রভৃতি।

এই দ্রুহিণ (ব্রহ্মা) রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সারসংকলনই পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্র-রূপে প্রকাশিত হয়। মোট কথা আদি নাট্যশাস্ত্র যা নাট্যবেদ, নাট্যবেদাগম্, সদাশিব-ভরতম্, ব্রহ্মাভরতম্ প্রভৃতি যে-কোন নামেই হোক না কেন তার রচনা বা সূত্রপাত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেরও পূর্বে ভরত নামধারী কেহ করেছিলেন। যার সাহায্যে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্র রচিত বা সংকলিত হয়েছে, এবং সেই রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্বে নয়। অবশ্য বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্র আরো অনেক পরে সংকলিত হয়েছে। কারণ এর মৌলিক গ্রন্থ বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অঙ্গ বা সহায়করূপে সংগীতালোচনা করা হয়েছে। তাই এর সকল অধ্যায়েই কিছু-না-কিছু সংগীতপ্রসঙ্গ আছে। তবে ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতেই সংগীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর নাট্যশাস্ত্রের চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত সংস্করণের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিচ্ছেদের বিষয়সূচী সংক্ষিপ্তরূপে দেওয়া হল।

১ম অধ্যায় ॥ নাট্যশাস্ত্রোৎপত্তিঃ ॥ ইন্দ্রাদি দেবতাদের প্রার্থনানুসারে ব্রহ্মার দ্বারা নাট্যবেদের রচনা। ঋগ্বেদের পাঠ্য, সামবেদের সংগীত, যজুর্বেদের অভিনয় এবং অথর্ববেদের রস নিয়ে নাট্যবেদ রচিত। নাটকের রূপে এবং মনোরঞ্জক হিতোপদেশসহ একে লোক-কল্যাণকর করার চেষ্টা।

২য় অধ্যায় ॥ প্রেক্ষাগৃহলক্ষণম্ ॥ বিভিন্নপ্রকার মঞ্চ তথা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণবিধির বিবরণ।

৩য় অধ্যায় ॥ রঙ্গদেবতাপূজনম্ ॥ নাট্যারম্ভের পূর্বে নির্বিঘ্ন সফলতার জন্য রঙ্গদেবতার পূজাদির ব্যবস্থা।

৪র্থ অধ্যায় ॥ তাণ্ডবলক্ষণম্ ॥ নাট্যারম্ভের ক্রিয়াকলাপে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের আয়োজন এবং সেই নৃত্যের বিস্তৃত বিবরণ।[১]

৫ম অধ্যায় ॥ পূর্বরঙ্গবিধিঃ ॥ ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত রঙ্গদেবতা-পূজা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ।

১ নৃত্যের বর্ণনায় বলেছেন যে, নৃত্যের তিনটি অঙ্গ। অঙ্গহার, করণ ও নাট্য। ললিত অঙ্গভঙ্গির নাম অঙ্গহার। কয়েকটি অঙ্গহার একসঙ্গে করলে হয় করণ এবং একসঙ্গে অনেকগুলি করণ করলে হয় নাট্য (নৃত্য)।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ॥ রসবিকল্পঃ ॥ রস ও ভাবের লক্ষণাদির উপকরণসহ ব্যাখ্যা এবং রসের দেবতা ও বর্ণের পরিচয়।[১]

৭ম অধ্যায় ॥ ভাবব্যঞ্জনম্ ॥ ভাব তথা বিভিন্ন ভাবের লক্ষণাদির পরিচয়। সাত্ত্বিক ভাব তথা আটটি স্থায়ী ও ৩৩টি ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা।

৮ম অধ্যায় ॥ উপাঙ্গবিধানম্ ॥ অভিনয় ও তার প্রকারভেদের ব্যাখ্যা। শির, ভ্রূ, নাসিকা, ওষ্ঠ, গণ্ড, চিবুক, গ্রীবা, মুখরাগ প্রভৃতির সাহায্যে অভিনয়ের বর্ণনা। বিভিন্ন ভাব ও তার রসের প্রতি দৃষ্টি রেখে অভিনয়ের বিবরণ।

৯ম অধ্যায় ॥ হস্তাভিনয়ঃ ॥ হস্তের সাহায্যে নানাবিধ অভিনয়ের বর্ণনা।

১০ম অধ্যায় ॥ শরীরাভিনয়ঃ ॥ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন, পার্শ্ব জঠর, কটি, নিতম্ব, উরু প্রভৃতির সাহায্যে অভিনয় বিবরণ।

১১শ অধ্যায় ॥ চারীবিধানম্ ॥ পদদ্বয়ের বিভিন্নপ্রকার চলনভঙ্গির সাহায্যে অভিনয়ের বর্ণনা।

১২শ অধ্যায় ॥ মণ্ডলবিধানম্ ॥ ১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত পদচারীর অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ।

১৩শ অধ্যায় ॥ গতিপ্রচারঃ ॥ নানাবিধ গতিপূর্ণ চলনের বর্ণনা। উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকৃতির পাত্র-পাত্রীর ভিন্ন ভিন্ন গতি এবং বিভিন্ন রস ও ভাব অনুযায়ী তার গতিভেদ। বাল্যে, যৌবনে তথা স্ত্রী ও পুরুষের চলনভঙ্গির গতিভেদ ইত্যাদির বর্ণনা।

১৪শ অধ্যায় ॥ প্রবৃত্তিধর্মব্যঞ্জনম্ ॥ রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও নির্গমন-বিধির বিবরণ তথা রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন ভাগ বা কক্ষের বিধান।

১৫শ অধ্যায় ॥ বাচিকাভিনয়ে ছন্দোবিভাগঃ ॥ বাণীসহযোগে অভিনয়কালে (সংগীত ছাড়া) ছন্দবিধি, বৃত্তবিভাগ, ছন্দ-প্রস্তার-সংখ্যা, আট গণ প্রভৃতির প্রকারভেদবর্ণনা।

১৬শ অধ্যায় ॥ বৃত্তানি সোদাহরণানি ॥ ৭০ প্রকার বৃত্তির উদাহরণ-সহ বর্ণনা।

১ তখন শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ও বীভৎস এই আটটি রস স্বীকৃত ছিল।

১৭শ অধ্যায় ॥ বাগভিনয়ঃ ॥ কাব্যের উপযোগী ৩৬টি লক্ষণ, ৪টি অলংকার, কাব্যগুণ, অলংকারাদির রসযুক্ত প্রয়োগ প্রভৃতির বিবরণ।

১৮শ অধ্যায় ॥ ভাষাবিধানম্ ॥ সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষাকে নাটকে সংস্কারসাধন তথা দেশভেদানুসারে উপযুক্ত প্রয়োগবিধির বর্ণনা।

১৯শ অধ্যায় ॥ কাকুস্বরব্যঞ্জনম্ ॥ নাটকে পাত্র-পাত্রীর সম্ভাষণবিধি। ৭ স্বরের রসযুক্ত প্রয়োগবিধি। পাঠ্যের গুণাদি নির্ণয়প্রসঙ্গে ষড়্জাদি ৭ স্বর, ৪ বর্ণ, ৬ অঙ্গ, ৬ অলংকার, ৩ প্রকার কাকু, ৩ স্থান প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। বিরাম ভেদ ও অভিনয়ে তার প্রয়োগ বিধির বর্ণনা।

২০শ অধ্যায় ॥ দশরূপবিধানম্ ॥ ১০ প্রকার রূপকের বিস্তৃত বিবরণ।[১]

২১শ অধ্যায় ॥ সন্ধ্যঙ্গবিকল্পঃ ॥ রূপকের ৫টি সন্ধি ও ৫টি অবস্থার বর্ণনা।

২২শ অধ্যায় ॥ বৃত্তিবিকল্পঃ ॥ নাট্যোপযোগী ৪টি বৃত্তির বিস্তৃত বর্ণনা।

২৩শ অধ্যায় ॥ আহার্যাভিনয়ঃ ॥ রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা তথা অন্যান্য কার্যাবলীর বিবরণ।

২৪শ অধ্যায় ॥ সামান্যাভিনয়ঃ ॥ সত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং নাটকে তার মহত্ত্ব। সত্ত্বভেদ, অভিনেত্রীদের অলংকারাদি, পুরুষের সত্ত্বভেদ, স্ত্রী ও পুরুষের শালীনতা-ভেদ, অষ্ট নায়িকা প্রভৃতির বর্ণনা।

২৫শ অধ্যায় ॥ বাহ্যোপচারঃ ॥ বৈশিক (কলা-বিশেষজ্ঞ বা বেশ্যাসক্ত) পুরুষের গুণ, দূতী ও তার কর্মের গুণ, স্ত্রী ও পুরুষের অনুরাগ ও বিরাগের কারণ, নারীর ত্রিবিধ প্রকৃতি, পঞ্চবিধ পুরুষ, নারীর প্রতি সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতির প্রয়োগের বর্ণনা।

২৬শ অধ্যায় ॥ চিত্রাভিনয়ঃ ॥ অঙ্গাভিনয়ের অন্যান্য বিবরণ।

২৭শ অধ্যায় ॥ সিদ্ধিব্যঞ্জনম্ ॥ নাট্যাভিনয়ে সিদ্ধিলাভপ্রসঙ্গে আলোচনা।

২৮শ অধ্যায় ॥ আতোদ্যবিধি ॥ আতোদ্য (বাদ্য) যন্ত্রের ৪ ভেদ, লক্ষণ, ত্রিবিধ প্রয়োগবিধি, তালগত ও স্বরগতবিধি, স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, দুই গ্রামে

---

১ নাটকের ১০টি রূপ বা বিভাগের বর্ণনাকালে ইনি বলেছেন যে জাতি, শ্রুতি প্রভৃতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি কাব্যবৈচিত্র্যের বৃত্তিসমূহের সমাবেশে নাটকের সৃষ্টি হয়।

১৪টি মূর্ছনা, ৪৮টি মূর্ছনা-তান, স্বর সাধারণ, সাধারণ বিধি, জাতি সাধারণ, ১৮ প্রকার জাতি ও তাদের গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতির বিবরণ। বাদী প্রভৃতির পরিচয়ে বলেছেন যে, বাদীকে রাজা, সমবাদীকে মন্ত্রী, অনুবাদীকে পরিজন এবং বিবাদীকে শত্রুতুল্য জ্ঞান করা কর্তব্য। বাদীসমবাদী নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ দুটির ব্যবধান ৯টি থেকে ১৩টি শ্রুতি (৪-৫টি স্বর) হওয়া উচিত। বাদী-সমবাদীকে তিনি শুভ স্বর সম্বাদ আখ্যা দিয়ে সংগীতের বিশেষ উপযোগিতার কথা বলেছেন। পশুপক্ষীর ধ্বনি অনুকরণে স্বরোৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছেন যে, স্বরোচ্চারণের গতি, ভঙ্গি বা সুর থেকেই রসের সৃষ্টি, যার প্রকাশকে বলা হয় কাকু।

২৯শ অধ্যায় ॥ ততাতোদ্যবিধানম্ ॥ জাতিগুলির রসানুসারে প্রয়োগবিধি, স্বর, বর্ণ, অলংকার ও বাদ্যপ্রয়োগবিধি, গীতালংকারবিধি, বর্ণহীন অলংকার, ৪ ধাতু, ৩ বৃত্তি, সাধুবাদ্যের লক্ষণ, বীণা জাতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও তার বাদনপদ্ধতি ইত্যাদির বর্ণনা। গায়ক ও বাদকের বৃন্দসজ্জা থেকে বোঝা যায় যে, তখন থেকেই মূল গায়ক বা বাদকের সঙ্গে সহযোগী গায়ক বা বাদকেরা থাকতেন। গায়ক ও বাদকের এই বৃন্দসজ্জাকে তিনি 'কুতপবিন্যাস' আখ্যা দিয়েছেন। প্রধানতঃ তিনি রঙ্গপীঠের বর্ণনায় কুতপের উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তা ছাড়াও নানাভাবে তিনি কুতপের ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যে শিল্পীবৃন্দের সজ্জার পরিচয়ে তিনি বলেছেন : "অলাতচক্র প্রতিমং কর্তব্যং নাট্যযোক্তৃভিঃ।" একটি জলন্ত মশালকে জোরে ঘোরালে আগুনের যে ঋজু, বক্র বা চক্রাকার দৃশ্য হয় তাকে অলাত বা অলাতস্পন্দন বলে।

৩০শ অধ্যায় ॥ সুষিরাতোদ্যবিধানম্ ॥ সুষির বাদ্যের বর্ণনা। নাট্যোপযোগী সমবেত যন্ত্রসংগীতসৃষ্টির জন্য তিনি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে তত, অবনদ্ধ, সুষির ও ঘনবাদ্য এই চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের লক্ষণ, অঙ্গবর্ণনা, গঠনপ্রণালী প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন।

৩১শ অধ্যায় ॥ তালব্যঞ্জনম্ ॥ কলা, লয় ও বিভিন্ন তাল প্রভৃতির বিবরণ। যতি ও প্রকরণ তালশ্রেণীভুক্ত। লয়প্রয়োগের প্রণালীকে যতি বলে। সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছাভেদে যতি তিনপ্রকার।

৩২শ অধ্যায় ॥ ধ্রুবাবিধানম্ ॥ ধ্রুবা'র ৫টি প্রকারভেদ, তাদের ছন্দ ও উদাহরণসহ বর্ণনা, পঞ্চবিধ গান, গায়কের গুণ ও দোষ।

৩৩শ অধ্যায় ॥ বাদ্যাধ্যায়ঃ ॥ অনবদ্ধ বাদ্যের উৎপত্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেদ, বাদনবিধি, বাদনের ১৮ প্রকার জাতি প্রভৃতির বর্ণনা। বাদকের গুণ ও দোষ।

৩৪শ অধ্যায় ॥ প্রকৃতিবিচারঃ ॥ নাটকের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর স্বভাব বিশ্লেষণ, উত্তম, মধ্যম, অধম তথা সংকীর্ণ প্রকৃতি, চতুর্বিধ নায়ক, অন্তঃপুরবাসী নারীদের বিভাগ প্রভৃতির বর্ণনা।

৩৫শ অধ্যায় ॥ ভূমিকা-পাত্রবিকল্পঃ ॥ নাট্যাভিনয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা।

৩৬শ অধ্যায় ॥ নাট্যাবতারঃ ॥ পূর্বরঙ্গ বিধিতে বর্ণিত পূজাবিধির আবার স্পষ্টতর ব্যাখ্যা। পৃথিবীতে নটবংশের উৎপত্তি এবং নাট্যশাস্ত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা।

এই গ্রন্থে যাবতীয় সাংগীতিক উপাদানাদির অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরবর্তীকালের সকল সংগীত গ্রন্থগুলিকে নাট্যশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি বলা যায়। কারণ শাস্ত্রগত দিক থেকে বিশেষ কোনো নবীনতার সন্ধান কেহই দিতে পারেনি।

স্বাতি

স্বাতি, দত্তিল, শার্দূল, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, বিশ্বাবসু, নন্দিকেশ্বর, যাষ্টিক, তুম্বুরুপ্রমুখ শাস্ত্রীরা ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী গুণী বলে স্থির করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ বিভিন্ন গ্রন্থে এঁদের নামাংকিত প্রমাণবাক্য-গুলি থেকে এঁদের রচিত সংগীত গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া গেলেও, সেগুলি অধিকাংশই কালস্রোতে লুপ্ত হওয়ায় এবং তৎকালীন গ্রন্থাদিতে প্রকাশকাল-উল্লেখের ব্যবস্থা না থাকায়, এঁদের সঠিক অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত এঁদের প্রমাণবাক্য ও নাম এবং ভাষা বিবর্তন-বিশিষ্ট্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এঁদের সময়কাল অনুমান করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে স্বাতিকে ভরতের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক গুণী বলে মনে হয়। কারণ অনেকে স্বাতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে স্বীকার না করলেও ভরত তাঁকে সংগীতাচার্য, বাদক এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

স্বাতির্ভাণ্ডনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ংভুবা।
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতা ॥

স্বাতিনারদসংযুক্তো বেদবেদাঙ্গকারণম্।
উপস্থিতোঽহং লোকেশং প্রয়োগার্থং কৃতাঞ্জলিঃ ॥

এখানে স্বাতি সংগীতাচার্যরূপে পরিচিত। ভরত উল্লেখ করেছেন যে, ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসব-রূপ প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতিকে বাদ্যভাণ্ড এবং নারদকে গায়ক হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এঁকে বাদ্যযন্ত্রাদির স্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করেও ভরত বলেছেন:

গম্ভীরমধুরং হৃদ্যমাজগামাশ্রমং ততঃ।
গত্বা স্বষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করাণস্যজত্ততঃ ॥

অর্থাৎ পুষ্করিণীর জলধারার গম্ভীর শব্দের অনুকরণে স্বাতি মৃদঙ্গ বা পুষ্কর বাদ্য সৃষ্টি করেছিলেন। ভরত আরো বলেছেন:

পণবং দর্দুরাংশ্চৈব সহিতো বিশ্বকর্মণা।
দেবানাং দুন্দুভিং দৃষ্ট্বা চকার মুরজং ততঃ ॥

অর্থাৎ বিশ্বকর্মার সাহায্যে মৃদঙ্গ বা পুষ্করের মতো পণব, দর্দুর এবং দেবতাদের প্রিয় বাদ্য দুন্দুভির অনুকরণে মুরজবাদ্যও নির্মাণ করেছিলেন। সৃষ্টিকথার জলধারার সঙ্গে স্বাতির নামোল্লেখ থাকায় অনেকে বৃষ্টির কারণীভূত নক্ষত্রের সঙ্গে স্বাতিকে যুক্ত করেন। তবে স্বাতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করলে তাঁকেই এই সকল বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করতে হয়।

দত্তিল

প্রসিদ্ধ 'দত্তিলম্' গ্রন্থের রচয়িতা দত্তিলের অভ্যুদয়কাল যথেষ্ট রহস্যপূর্ণ। দত্তিলম্ গ্রন্থখানি কে সাম্বস্বামী শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থখানি যে অসম্পূর্ণ তার আভাস মুখবন্ধেই পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রী উল্লিখিত দত্তিলনামাংকিত শ্লোকগুলি এই গ্রন্থে না থাকায় এটি আংশিকরূপে প্রাপ্ত অথবা দত্তিল রচিত আরো গ্রন্থ ছিল মনে হয়। ডক্টর রাঘবন বলেছেন যে, নাট্য, নৃত্য ও সংগীত সম্বন্ধে দত্তিল রচিত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ ছিল। সিংহ ভূপাল বলেছেন, দত্তিল নাকি 'প্রয়োগস্তবক' নামে নৃত্য ও গীতের উপরে টীকাও রচনা করেছিলেন। মাদ্রাজ গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি তালিকায় 'রাগসাগর' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের তিনটি তরঙ্গ (অধ্যায়)। যথা 'রাগবিমর্শ,' 'শ্রুতিস্বররাগবিমর্শ' ও 'রাগধ্যানবিজ্ঞানম্'-এর প্রথমটির শেষে আছে

"ইতি শ্রীরাগসাগরে নারদদত্তিল সংবাদে রাগবিমর্শকো নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ"। এই উল্লেখ থেকে অনেকে নারদ ও দত্তিলের বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলে মনে করেন। অথচ নাট্যশাস্ত্রকার এঁকে দত্তিল, ধূর্তিল, দণ্ডিল প্রভৃতি নামে অভিহিত এবং তাঁর একশত পুত্র বা শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক স্থানে ভরত, শাণ্ডিল্য, কোহল ও দত্তিলের একসঙ্গে নামোল্লেখ করায় এঁদের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

দত্তিল ভরতের অনুগামী শাস্ত্রী ছিলেন, তাই ভরতের মতোই যাবতীয় সংগীতালোচনা করেছেন। সাত স্বরকে তিনি স্বরমণ্ডল বলেছেন। তিনি বাইশটি শ্রুতিরই পক্ষপাতী ছিলেন, তবে শ্রুতিকে তিনি ধ্বনি বলেছেন। বিকৃত স্বর হিসাবে তিনি ভরতের মতোই অন্তর গান্ধার ও কাকলি নিষাদের নামোল্লেখ করেছেন এবং অংশ ও বাদী স্বরকে সমশ্রেণীভুক্ত বললেও একই রাগে অনেকগুলি অংশের কথা স্বীকার করেন নি। তিনি সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বরেরও পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধর্বগানকে তিনি বলেছেন অবধান :

> পদস্থস্বরসংঘাতস্তালেন সুমিতস্তথা।
> প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধর্বমভিধীয়তে॥

অর্থাৎ গান্ধর্বগানের পদ, স্বর ও তালাদি একান্ত যত্ন ও মনঃসংযোগসহকারে প্রকাশ করতে হয়। কারণ উপাদান হিসাবে পদ, স্বর, তাল প্রভৃতি থাকলেও শিল্পীর মনঃসংযোগই মূল কারণ।

দত্তিল ভরতের মতোই মূর্ছনা প্রভৃতির সংখ্যা ও নামোল্লেখ করেছেন এবং চুরাশিটি তানের কথা বলেছেন। নারদের (শিক্ষাকার) মতো তিনি তানগুলিকে যজ্ঞনামের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তান পূর্ণ, অপূর্ণ ও কূটভেদে তিনরকম। ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের পূর্ণতান সংখ্যা হল ৫০৩৩টি। এ ছাড়া তিনি ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলিরও পরিচয় দিয়েছেন।

শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে আঠারোটি জাতিরাগ এবং রাগ প্রকৃতির নিয়ামক গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ষাড়ব, ঔড়ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, ন্যাস ও অপন্যাস এই দশটি লক্ষণের তিনি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এর পরে তিনি আরোহাদি চারটি বর্ণ, প্রসন্নাদি অলংকার প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যে প্রযুক্ত নিবদ্ধ গীতি হিসাবে মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপক (উল্লোপ্য), প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর,

বর্ধমানক (বর্ধমান), আসারিত এবং মাগধী প্রভৃতি গীতরীতির পরিচয় দিয়েছেন।

তাল প্রসঙ্গে তিনি কলা, পাত, পাদভাগ, মাত্রা, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী, অঙ্গুলি, পাণি, যতি প্রভৃতি বাদ্যের অপরিহার্য উপাদানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশন (প্রবেশ), শম্যা, তাল, সন্নিপাত এই সাতটি তালের পরিচয় দিয়েছেন। কলার পরিচয়ে বলেছেন যে, নিমেষকালকে অনেকে 'কলা' বলেন। কলা তিনটি—চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা। চিত্রায় দুটি, বার্তিকে চারটি এবং দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকে। অনেক সময়ে কলা ও মাত্রাকে সমান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

শার্দূল

সংগীতাচার্য শার্দূলকে কোথাও 'ব্যাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোহল এঁকে অন্যতম বক্তারূপে উল্লেখ করেছেন। দত্তিল কোহলের নাম ও প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করলেও শার্দূলের নামোল্লেখ করেন নি। সুতরাং শার্দূলকে কোহলের পূর্ববর্তী এবং দত্তিলের পরবর্তী গুণী বলা যায়। কিন্তু দত্তিলের কোহলের নামোল্লেখ করায় এবং কোহল দত্তিলের নামোল্লেখ না করায় এঁরা সকলেই বিভ্রান্তিকর হয়ে রয়েছেন। তবে এঁদের অভ্যুদয় খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতকের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

মতঙ্গদেব শার্দূলনামাংকিত যে সকল প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন তাতে শার্দূলরচিত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব এবং তিনি যে দেশী রাগগুলিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বোঝা যায়। শার্দূলসমর্থিত কোনো কোনো রাগে নারদ ও তুম্বুরুর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। শার্দূল নারদের মতো দীপ্তা, আয়তাদি পাঁচটি শ্রুতি স্বীকার করেছেন এবং এগুলির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতিরও উল্লেখ করেছেন।

কথিত আছে যে, নারদ ও ভরত এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নারদ গান্ধর্ব-জাতীয় শাস্ত্রী ছিলেন এবং শার্দূল, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু প্রভৃতি তাঁর অনুগামী শাস্ত্রী ছিলেন।

কোহল

সংগীতাচার্য কোহল ভরতের অনুগামী শাস্ত্রী ছিলেন। এঁর নামাংকিত সংগীতমেরু, অভিনয়শাস্ত্র, কোহলরহস্তম্, তাললক্ষণম্ প্রভৃতি সংগীত ও নাট্য-বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া স্বয়ং ভরত আবার এঁকে নাট্যশাস্ত্রের শেষ অংশের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কোহলনামাংকিত সবগুলি গ্রন্থ একই কোহলরচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ ইনি ভরতের সমসাময়িক বা পরবর্তী শাস্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত।

অনুষ্টুপছন্দে রচিত সংগীতমেরুগ্রন্থে ইনি ভরতের সঙ্গে আদি আচার্য ব্রহ্মার নামোল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে ইনি উপ-রূপক, ত্রোটক, সট্টক প্রভৃতি নাট্যধারার সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রাঘবন বলেছেন: "The name of Kohala is as great in the history of Drama and Dramaturgy as it is in that of music······In the Dramaturgy and Rhetoric, Kohala is always quoted even by later writers as the writer who first introduced the Uparupaka, minor types of Drama, Totaka, Sattaka etc." অর্থাৎ নাটকাভিনয় ও সংগীতের ইতিহাসে ইনি চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। নাট্য সম্বন্ধে এঁর বিশিষ্ট একটি নিজস্ব অভিমত ছিল। পূর্বরঙ্গের শ্রেণী হিসাবে ইনি শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র এই তিনরকম বিভাগ স্বীকার করতেন। ভাব, রস, ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কেও এঁর নিজস্ব একটি অভিমত ছিল। ইনি পতাকা, অরাল, শুকতুণ্ড, অলপল্লব, খটকামুখ, মকর ঊর্ধ্ব, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, ফাসব, কক্ষ, উরো, খড়্গা, পদ্ম, তণ্ড, পল্লব, অর্ধমণ্ডল, ঘাত, ললিত, বলিত, গাত্র, প্রতি প্রভৃতি বর্তনা বা বর্তনিকার পরিচয় বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

তালুলক্ষণম্ গ্রন্থে ইনি তাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাল শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়প্রসঙ্গে ইনি দার্শনিকতত্ত্বরূপ সৃষ্টিরহস্তের অবতারণা করেছেন:

তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তিসমাযোগাত্তালনামভিধীয়তে॥

পরবর্তীকালের গ্রন্থকারেরা নাট্য ও ছন্দের ব্যাপারে বিশেষ করে কোহলের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন।

কোহলরহস্যম্ গ্রন্থখানিও সংগীতমেরুর মতো কথোপকথনের আকারে রচিত। এই গ্রন্থে কোহল ও মতঙ্গের নাম একসঙ্গে যুক্ত থাকায় এই মতঙ্গ এবং গ্রন্থখানির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় হিসাবে কোহল-মতঙ্গের নামও শোনা যায়।

কোহল সাতটি স্বর এবং বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন, তবে তিনি চৌষট্টি বা অনন্ত শ্রুতির বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। লৌকিক স্বর বা শ্রুতির সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে, মানুষের ইচ্ছারূপ শক্তির আঘাতে বায়ু যখন নাভি থেকে ওঠার সময় কণ্ঠদেশে প্রতিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তা ধ্বনি বা স্বরের আকার ধারণ করে। স্বরসমূহ যে ব্যাপক ও অনন্ত এই বিচারপ্রসঙ্গে ইনি জাতি বা জাতিরাগ এবং ভাষারাগের আলোচনা করেছেন। পূর্বাচার্যদের মত ইনিও জীবজন্তুর ধ্বনির শেষ শ্রুতির সঙ্গে স্বরগুলির সম্পর্ক স্বীকার করে বলেছেন :

ষড়্জং বদতি ময়ুর ঋষভং চাতকো বদেৎ।
অজা বদন্তি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণেকালে কোকিলঃ পঞ্চমঃ বদেৎ।
প্রবৃটকালে তু সম্প্রাপ্তে ধৈবতং দর্দুরো বদেৎ॥
সর্বদা চ তথা দেবি, নিষাদং বদতে গজঃ।

তবে এর অর্থ কিন্তু ময়ুর থেকে ষড়্জ, চাতক থেকে ঋষভ, অজা থেকে গান্ধার প্রভৃতি নয়। আসলে কণ্ঠনির্গত স্বরগুলির প্রতিধ্বনি বা কম্পনের সঙ্গে কতগুলি জীবজন্তুর ধ্বনির সাদৃশ্য আছে মাত্র।

মূর্ছনার পরিচয়ে বলেছেন যে, জাতি, গ্রাম, ভাষারাগ প্রভৃতি প্রকাশের সার্থকতা ও পুষ্টির জন্য মূর্ছনার প্রয়োজন। রাগ, লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে এর প্রয়োগ করা দরকার। এইরূপে ইনি রাগ, তাল, অলংকার প্রভৃতিরও বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

শাণ্ডিল্য

মূর্ছনা ও জাতিরাগপ্রসঙ্গে শাণ্ডিল্যের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ রামামাত্যে

থাকায় এঁকে রামায়ণের পূর্ববর্তী গুণী বলে মনে হয় এবং এর রচিত কোনো সংগীতশাস্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ভরত এঁকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এঁর প্রমাণবাক্যগুলি অনুসারে এঁকে ভরতের অনুগামী শাস্ত্রী বলে মনে হয়। ফলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইনিও বিভ্রান্তিকর। পরবর্তী-কালের গ্রন্থাদিতে এঁর কোনো প্রমাণবাক্যের উল্লেখ না থাকায় মনে হয় এঁর রচিত গ্রন্থ বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

বিশ্বাখিল

সংগীতাচার্য বিশ্বাখিলের নামোল্লেখ দত্তিলের গ্রন্থে থাকায় এঁকে পূর্ববর্তী গুণী বলে মনে হয়। ডক্টর রাঘবনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো শাস্ত্রী এর নামোল্লেখ না করায় এবং ভাষা প্রভৃতির তথ্যানুসারে এঁর অভ্যুদয়কাল সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। শার্ঙ্গদেব প্রাচীন সংগীতাচার্য হিসাবে, এঁর নামোল্লেখ করেছেন এবং বাদ্যাধ্যায়ে এঁর প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন : 'আশ্রাবণং শুষ্কবাদ্যমত্র ত্বাহ বিশ্বাখিলঃ', অর্থাৎ নির্গীত শুষ্কবাদ্যকে ইনি আশ্রাবণ বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে বাদ্য-বিষয়েও এঁর একটি নিজস্ব অভিমত ছিল। অভিনবগুপ্ত ন্যাসের পরিচয়ে এবং দেবেন্দ্র, কল্লিনাথ, সিংহভূপালপ্রমুখ, সংগীতাচার্যরূপে এঁর নামোল্লেখ করেছেন। দুঃখের বিষয় এঁর রচিত কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব আজ পাওয়া যায় না।

বিশ্বাবসু

মহাভারতে গন্ধর্বরাজ এবং সংগীতজ্ঞরূপে বিশ্বাবসুর নামোল্লেখ থাকায় এঁকে ভরতের পূর্ববর্তী গুণী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তেমন ক্ষেত্রে নারদ ভরতাদি শাস্ত্রীরা অবশ্যই এঁর নামোল্লেখ করতেন। সুতরাং মহাভারতের গন্ধর্ব-রাজ এবং শার্ঙ্গদেব উল্লিখিত সংগীতাচার্য বিশ্বাবসু দুইজন বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রুতি, স্বর, সাতপ্রকার গীত প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বাবসুর যে প্রমাণবাক্য বৃহদ্দেশীতে পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত এবং প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকৃত :—

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকাপি দ্বিধা জ্ঞেয়া স্বরান্তর বিভাগতঃ ॥
নিয়তশ্রুতিসংস্থানাদ্ গীয়ন্তে সপ্তগীতিষু।
তস্মাৎ স্বরগতা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতয়ঃ শ্রুতিবিদেভিঃ ॥
অন্তঃশ্রুতিবিবর্তিন্যোহন্তর শ্রুতয়ো মতাঃ।
এতাসামপি চৈশ্বর্যং ক্রিয়াগ্রামবিভাগতঃ ॥

অর্থাৎ কানে শোনা যায় এমন ধ্বনিকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি বা ধ্বনি শব্দ-বিশেষ। আসলে শ্রুতি একটি স্বর ও অন্তরভেদে তা দুটি বলে মনে হয়। গীত বা গানের ধ্বনিসমূহ মধুর ও মনোরঞ্জনকারী হওয়া উচিত। সাতপ্রকার গীতি (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়্যা, রাগগীতি, ভাষাগীতি, সাধারণী ও বিভাষা) সর্বদা শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং নানাবিধ ক্রিয়া ও গ্রামে বিভক্ত হয়।

মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রমুখ সংগীতাচার্যেরা বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসুকে নাট্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য সকল বিষয়ে বিশারদ ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

নন্দিকেশ্বর

নন্দিকেশ্বরনামাঙ্কিত বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন মহীশূরে কুর্গের গ্রন্থতালিকায় নন্দিভরতম্, মাদ্রাজের গ্রন্থতালিকায় ভবতার্থচন্দ্রিকা, তাঞ্জোরের গ্রন্থতালিকায় তাললক্ষণ এবং বিকানিরের গ্রন্থতালিকায় রুদ্রডমরুদ্ভবসূত্রবিবরণম্ ও কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতি। এগুলি কোনো একজন দ্বারা রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে কারণ এগুলির রচনাবৈশিষ্ট্য ভাষা প্রভৃতি অনুসারে এগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনা বলে মনে হয়। তবে এগুলিতে সংগীত এবং বিশেষভাবে নাট্যালোচনার ঐক্য লক্ষণীয়। অনেক ঋষি তণ্ডু ও নন্দি বা নন্দিকেশ্বরকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। অবার নাট্যশাস্ত্রের কাব্যমালা সংস্করণের শেষে "···নন্দিভরত সংগীতপুস্তকম্" এই উল্লেখ থেকে অনেকে নন্দি বা ভরত উপাধিধারী নন্দিকে নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের আর কোথাও এঁর নামোল্লেখ না থাকায়, দত্তিল, কোহল প্রমুখের নামোল্লেখ না করায় এবং নন্দিকেশ্বর-রচিত বিখ্যাত 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থের "তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ" ইত্যাদি উল্লেখ থেকে মনে হয় যে তণ্ডু ছিলেন শিবের অনুচর এবং

ভরতের কলাপ্রণালীশিক্ষাদানকারী। সুতরাং তণ্ডু ছিলেন ভরতের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক এবং নন্দিকেশ্বর ভারতের পরবর্তী গুণী। অভিনয়-দর্পণ (যা প্রাচীন নন্দীকেশ্বরভরতম্ বা নন্দীভরতম্ গ্রন্থের অংশবিশেষ) গ্রন্থখানি অভিনয় ও হস্ত-মুদ্রাদির বর্ণনাযুক্ত একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই গ্রন্থে ভরতকে নাট্যকলার প্রথম প্রচারক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকগুলি প্রধানতঃ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলি আবার লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী-ভেদে বিভক্ত। ভরতের মতো ইনিও সে কথার উল্লেখ করেছেন। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে ভাবপ্রকাশের আঙ্গিক পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন :

আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥

অর্থাৎ মুখের দ্বারা গান, হাতের দ্বারা গানের অর্থ, চক্ষুর দ্বারা ভাব এবং পদ দ্বারা তাল প্রকাশ করা উচিত। কারণ যেখানে হাত সেখানে দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানে মনের গতি, যেখানে মন সেখানে ভাব এবং যেখানে ভাব সেখানেই রসের অভিব্যক্তি। ভরতের মতোই ইনি ভাব ও রসের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইনি হস্তমুদ্রার সার্থকতার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কিঞ্চিৎ ভিন্ন-প্রকার হলেও ইনি রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

তালপ্রসঙ্গে ইনি সমগ্র বিশ্বকেই তালময় জ্ঞান করতে বলেছেন। কারণ তালই কাল তথা সর্বব্যাপক মহাকাল—যেমন,

তালাত্মকং জগৎ সর্বং তালস্তু ব্যাপকঃ স্মৃতঃ।
সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্যাৎ স তালঃ কালসংভবঃ॥

এ ছাড়া তিনি তিথি, কাল, মার্গ, ক্রিয়াঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি প্রস্তার, স্থান, অঙ্গ, স্বর, মূর্ছনা, তান, মাত্রা, প্রভৃতি সাংগীতিক উপাদানাদিরও পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যাকরণ ও সংগীতশাস্ত্রের এক অদ্বিতীয় আচার্য হিসাবে ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

যাষ্টিক

বৃহদ্দেশীতে শার্দূল ও যাষ্টিকের বিভিন্ন প্রমাণবাক্যের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে মতঙ্গদেব এঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। মতঙ্গের "সর্বাগমসংহিতায়াং যাষ্টিক প্রমুখ্য ভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ" এই উল্লেখ থেকে যাষ্টিক রচিত নৃত্য, নাট্য ও সংগীতের 'সর্বাগমসংহিতা' নামে একখানি গ্রন্থ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথও যাষ্টিকের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন। এই সকল উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামরাগের ছায়ারাগ বা ভাষারাগ, অভিজাত দেশীরাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাষ্টিক বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, এবং অধুনালুপ্ত সর্বাগমসংহিতাগ্রন্থে উল্লিখিত দেশীরাগাদি সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলি প্রামাণ্য হিসাবে গণ্য ছিল। এ ছাড়া তিনি বহু জনকরাগের পরিচয় দিয়ে রাগ বর্গিকরণ করেছিলেন। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে অভিজাত দেশীসংগীতের ক্ষেত্রে যাষ্টিক, কোহল, শার্দূল, বিশ্বাখিল প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য।

তুম্বুরু

তুম্বুরুর অভ্যুদয়কাল সম্পর্কেও মতভেদ আছে। মহাভারতের আদিপর্বে এঁকে 'গন্ধর্বসত্তম' বলা হয়েছে :

> সুপ্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহাহুহুঃ।
> তম্বুরু চেতিচত্বারঃ স্মৃতাঃ গন্ধর্বসত্তামাঃ॥

অর্থাৎ সুপ্রিয়া, অতিবাহু, হাহা ও হুহু এই চারজন গন্ধর্বকে বলা হত তুম্বুরু। অন্যত্র আবার একজনকেই সংগীতাচার্য তম্বুরু বলা হয়েছে। কারো মতে তুম্বুরুর নাকি চারটি মুখ ছিল, মুখগুলির নাম ছিল 'বিনাশক', 'নরোত্তর', 'সম্মোহন' ও 'শিরশ্ছেদ'। আবার কেহ এগুলিকে তাঁর রচিত তন্ত্রগ্রন্থ বলে মনে করেন। মোটকথা এঁর আবির্ভাব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনো এক সময়ে হয়েছিল বলা যায়। কথিত আছে নারদ, বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু গন্ধর্বজাতীয় শাস্ত্রী ছিলেন।

পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব গীতানুগ, শুষ্ক, নৃত্যানুগ ও নৃত্যগীতানুগ—এই চারপ্রকার বাদ্যপ্রসঙ্গে নারদ, নন্দি, স্বাতি ও তুম্বুরুর নাম পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন : "চক্রে কৌতুকতো নন্দিস্বাতিতুম্বুরুনারদৈঃ"।

টীকাকার কল্লিনাথ ধ্বনি প্রসঙ্গে তুম্বুরুর প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন :

উচ্চৈস্তরো ধ্বনিরুক্ষ বিজ্ঞেয়ো বাতজো বুধৈঃ।
গাম্ভীরো ঘনলীনস্তু জ্ঞেয়োঽসৌ পিত্তজো ধ্বনিঃ॥
স্নিগ্ধশ্চ সুকুমারশ্চ মধুরঃ কফজো ধ্বনিঃ।
ত্রয়ানাং গুণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতজঃ॥

অর্থাৎ রুক্ষ, ঘন ও মধুর বা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এবং উচ্চ, গম্ভীর ও স্নিগ্ধ এই দুই শ্রেণীর তিন প্রকার ধ্বনি আছে। ধ্বনি শ্রুতিমধুর ও মাধুর্য গুণ-সম্পন্ন হলেই রাগ বিকাশ সম্ভব।

তুম্বুরুর প্রমাণবাক্যগুলি থেকে তাঁর রচিত গ্রন্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তুম্বুরু উদ্ভাবিত তুম্বুরুবীণা থেকেই অধুনাপ্রচলিত তানপুরার উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন।

মহাকবি কালিদাস

খৃষ্টপূর্বকাল থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত ৮-৯ জন কালিদাস নামধারী কবি এবং বিক্রমাদিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং কালিদাস নামাঙ্কিত সব গ্রন্থগুলিই 'মেঘদূত' রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের নয়। তবে কোনজন যে মহাকবি কালিদাস তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর সময়ে সংগীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং রাগ-রাগিণী ঋতু বিচার করে গাইবার রীতি ছিল। কথিত আছে তাঁর সময়েই রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি নূতন করে সম্পাদিত হয়েছিল, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চারুশিল্পেও তখন অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ গর্গ, বরাহমিহির, আর্যভট্ট প্রভৃতিও সেই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তখন সব বিষয়েই ভারতবর্ষের নব-জাগরণ হয়েছিল বলা যায়।

কালিদাস নামাঙ্কিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মেঘদূত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বোশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার প্রভৃতি মহাকবি রচিত, এবং অন্যান্য রচনাগুলি অন্য কোনো কালিদাস-নামা কবির দ্বারা রচিত বলে গবেষকরা মনে করেন। মহাকবি রচিত গ্রন্থাবলী থেকে গুপ্ত যুগের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়াতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে তাঁর আবির্ভাবকাল বলে অনুমান করেন।

কালিদাসের সময়ে মার্গ সংগীতের অনুশীলন সম্ভবতঃ লোপ পেয়েছিল। তিনি কাব্য ও নাটকে 'সংগীত' ও 'রাগ' শব্দ দুটিকে বিশেষ অর্থবোধকরূপে ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া গীত, গান, গন্ধর্ব, নৃত্য, মৃদঙ্গ, মুরজাদি চর্মবাদ্য, বীণা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর কুমারসম্ভব গ্রন্থে কৈশিকরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত 'গীতমঙ্গল', মঙ্গলগীতি, ও মঙ্গলপ্রবন্ধগীতির, বিক্রমোর্বশী নাটকে কুকুভরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত জম্ভালিকা, চর্চরী, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন।

সা বসন্তোৎসবে গেয়া চর্চরী প্রকৃতৈঃ পদৈঃ।
চর্চরীচ্ছন্দসেত্যন্যে ক্রীড়াতালেন বেত্যপি॥

অর্থাৎ চর্চরীকাপ্রবন্ধ বসন্তকালে প্রকৃতিকে বন্দনা জানিয়ে হোলি উৎসবে গাওয়া হত। কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে বহু বিচিত্র প্রবন্ধগীতি, অভিনয় ও নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং নৃত্য, গীত বাদ্য ও অভিনয়ে পারদর্শী না হলেও এগুলির তত্ত্ব যে তিনি খুব ভালভাবে জানতেন তা বোঝা যায়। বর্তমানে নানা দেশে তাঁর উল্লিখিত গান, নাচ ও তালের নামগুলি অপভ্রংশরূপে প্রচলিত। যেমন দ্বিপাদিকা—দোঁহা, চর্চরিকা—চাঁচর বা চাঁচরি, জম্ভালিকা—ঝুমুর, পঞ্চালিকা—পাঁচালী ইত্যাদি।

প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র বেণু ও বীণার উল্লেখকালে মহাকবি তৎকালীন রাজ দরবারের এক অপরূপ চিত্রের বর্ণনা করেছেন :

বেণুনা দর্শনপীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্॥
অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ংমিথঃ স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুনৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সঙ্ঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ॥

অর্থাৎ রাজা অগ্নিবর্ণ দন্ত দ্বারা নর্তকীদের অধর দংশন করতেন ও নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন। ফলে অধর দ্বারা বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণা স্থাপন করতে তাদের কষ্টবোধ হলেও তারা কুটিল কটাক্ষ হেনে রাজার প্রতি অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্ত অভিভূত হত।

মহাকবি তিন রকম (আঙ্গিক, বাচিক, ও সাত্ত্বিক) অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন। মুনি ভরত চার রকম অভিনয়ের কথা বলেছেন : "আঙ্গিকো-

বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।" এগুলির আবার নানা শ্রেণীভাগ ছিল। নানাবিধ অলংকার ও বেশভূষার সাহায্যে শরীরকে ভূষিত করার নাম 'আহার্য' অভিনয়। এর দ্বারা নট ও নটীর কৃত্রিম শোভা বৃদ্ধি হয় মাত্র। সৌন্দর্যের পূজারী মহাকবি নিশ্চয়ই নকল সৌন্দর্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ভরত উল্লিখিত 'আহার্যকে' জানা থাকলেও বর্জন করেছেন।

সমুদ্রগুপ্ত
(৪র্থ-৫ম শতাব্দী)

সমুদ্রগুপ্ত একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা, শীলমোহর প্রভৃতির উদ্ভবন এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সামগান ইত্যাদির সঙ্গে শিল্প ও কাব্য প্রভৃতির বহুল প্রচলন হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্প ও তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, অতি গুণী কাব্য ও সাহিত্যরসিক হিসাবে তাঁকে 'কাব্যশ্রেষ্ঠ' উপাধি দান করা হয়েছিল। তাম্রশাসনে আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত যখন বীণা বাজাতেন তখন সেই সুরলহরী নারদ, তুম্বুরু প্রমুখ সংগীত সম্রাটদেরও লজ্জা দিত। তাই তাঁর মূর্তি মুদ্রায়ও অঙ্কিত হয়েছিল। তৎকালীন স্বর্ণমুদ্রায় তাই বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

মতঙ্গদেব
(৫ম-৮ম শতাব্দী)

৫ম থেকে ৮ম শতকের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে মতঙ্গমুনি তাঁর প্রসিদ্ধ 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন বলে গবেষকরা মনে ক'রেন। এটি নাট্যশাস্ত্রের মতো একটি বিরাট সংকলন গ্রন্থ। ইনি ভরতের অনুগামী শাস্ত্রী ছিলেন এবং পূর্ববর্তী ব্রহ্মভরত থেকে বিশ্বাবসু পর্যন্ত প্রায় সকলেরই নামোল্লেখ তথা প্রমাণবাক্যের উদ্ধৃতি সহযোগে যাবতীয় সাংগীতিক উপকরণাদির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ইনি আর্চিক গাথিকাদি সাত শ্রেণীর গানেরও পরিচয় দিয়েছেন। তবে ভারতের মতো দুটি মাত্র গ্রাম স্বীকার করলেও মূর্ছনা ও জাতি-প্রকরণে ইনি যথেষ্ট নবীনতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ ভরত বর্ণিত সপ্তস্বর-মূর্ছনার সঙ্গে ইনি দ্বাদশ স্বর-মূর্ছনা এবং প্রত্যেকটি জাতির মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীতশাস্ত্র হিসাবে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ।

ধ্বনির পরিচয়ে ইনি দার্শনিকের মতো বলেছেন :

ধ্বনির্যোনিঃ পরাজ্ঞেয়া ধ্বনিঃ সর্বস্য কারণম্।
আক্রান্তং ধ্বনিনা সর্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥

অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত কিছুরই মূল কারণ হল ধ্বনি। এইরূপে ইনি স্বরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে মাত্রা এবং মাত্রা থেকে বর্ণ বা স্বরের উৎপত্তি। বর্ণের পরিচয়ে বলেছেন যে, যা গানকে প্রকাশ করে তাই বর্ণ। দেশী গানের পরিচয়ে ইনি ভরতের মতো দশটি লক্ষণ স্বীকার করেছেন, তবে তানের পরিচয়ে ইনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি অতিরিক্ত তানের উল্লেখ ও বর্ণনা করেছেন। ভাষারাগের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এঁর বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট—

গ্রামরাগোদ্ভবা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাষিকাঃ।
বিভাষাভ্যশ্চ সঞ্জাতাস্তথাচান্তর ভাষিকাঃ ॥

অর্থাৎ গ্রামরাগ থেকে ভাষা, ভাষা থেকে বিভাষা এবং বিভাষা থেকে অন্তরভাষা রাগের উৎপত্তি।

জাতি বলতে কী বোঝায় তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন মতঙ্গদেব :—"শ্রুতিগ্রহস্বরাদিসমূহাজ্জায়ন্তেজাতয়ঃ"—অর্থাৎ শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার, বর্ণ) ইত্যাদি উপাদান নিয়ে যে রচনা প্রকাশিত, তাই জাতি। রাগের এমন সুন্দর বর্ণনা ইনি দিয়েছেন যা আজও প্রায় অপরিবর্তিতরূপেই প্রচলিত :

যোঽসৌ ধ্বনি বিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকোজনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ ॥

অর্থাৎ ধ্বনির যে বিশেষ রচনা স্বর বর্ণাদি বিভূষিত এবং জনচিত্ত বিনোদনে সক্ষম তাকে রাগ বলে। গীতের পরিচয়ে ইনি শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা—এই সাতটি শ্রেণীর কথা বলেছেন।

ইনি নাকি চিত্রাবীণাবাদক ছিলেন। কবি রামকৃষ্ণের মতে ইনিই কিন্নরী বীণার আবিষ্কর্তা। যার থেকে পরে বৃহতী, মধ্যমা ও লঘবী এই তিন প্রকার কিন্নরী বীণা প্রচলিত হয়েছিল। মতঙ্গই সর্বপ্রথম বীণাতে সারিকা প্রযুক্ত করেছিলেন এইরূপ কথিত আছে। তখন ১৪টি থেকে ১৮টি পর্যন্ত সারিকার ব্যবহার ছিল। ভরতের পরে মতঙ্গের নাম সংগীতশাস্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

রাজা ভোজ

(১১শ শতাব্দী)

অতিগুণী সংগীতজ্ঞ মহারাজা ভোজ (১০১৮-১০৬০ খৃঃ) অত্যন্ত বিচক্ষণ নৃপতি এবং উচ্চস্তরের পণ্ডিত তথা সংগীতরসিক ছিলেন। মধ্যযুগের প্রারম্ভের আগেই সুলতান মামুদ প্রভৃতি আরবীরা ভারত আক্রমণ শুরু করেছিল। শোনা যায় সেই সকল বাইরের শক্তি প্রতিহত করে রাজা ভোজ, গুর্জর-প্রতিহাররাজ্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত তথা উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

ইনি 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এবং 'শৃঙ্গার প্রকাশ' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রথমটি 'অলংকারশাস্ত্র', বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্যাদিপূর্ণ একখানি জ্ঞানকোষ, এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। যাতে নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ আছে। এ ছাড়া এঁর অমর কীর্তি হিসাবে ভূপালের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'ভূপাললেক', যার আয়তন প্রায় আড়াই শত বর্গমাইল, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভিনব গুপ্ত

(১১শ শতাব্দী)

সংগীতশাস্ত্রী অভিনব গুপ্তের অভ্যুদয় হয় ১১শ শতকের শেষের দিকে। ইনি 'লোচন' ও 'অভিনবভারতী' নামে অলংকারশাস্ত্রের দুটি টীকা রচনা করেছেন। প্রথমটি আনন্দ বর্ধনের 'ধন্যালোক' ও দ্বিতীয়টি ভরতের নাট্যশাস্ত্র বিষয় নিয়ে রচিত।

'অভিনব ভারতী' গ্রন্থে বহু পূর্বাচার্যদের প্রমাণবাক্য উল্লেখসহ সাংগীতিক উপকরণাদির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সোমেশ্বর

(১২শ শতাব্দী)

খৃষ্টীয় ১১২৭-৩৭ অব্দের চালুক্যবংশীয় রাজা ও সংগীতশাস্ত্রী সোমেশ্বর (ইনি সম্ভবতঃ তৃতীয় সোমেশর। চতুর্থ সোমেশ্বর নামেও একজন ঐ বংশীয়

রাজা ছিলেন। এঁরা দুজনেই সাংগীতিক উপকরণাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।) "অভিলাসচিন্তামণি" বা "মানসোল্লাস" নামক গ্রন্থখানি (১১৩১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) রচনা করেন। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত। গ্রন্থখানি গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) এবং বাদ্য-বিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) এই দুটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। সংগীত এ বাদ্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া "বিক্রমাঙ্কাভ্যুদয়" নামে আরো একখানি গ্রন্থও নাকি ইনি রচনা করেছিলেন।

এছাড়াও আর একজন সোমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি "সংগীত রত্নাবলী" নামক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন, যাঁর উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

মধ্য বা মুসলমান যুগ

(১১শ-১৮শ শতাব্দী)

মধ্য বা মুসলমান যুগকে ১১শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল বলে স্থির করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম পাঞ্জাবের কতগুলি অঞ্চল ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দখল করে এবং ক্রমানুসারে ভারতের অন্যান্য দেশগুলি দখল করতে থাকে। যেমন ১০১৯ সালে তুর্কী মহম্মদ গজনী কনোজ দখল করেন এবং ১০২১ সালে সমগ্র পাঞ্জাব তাঁরা অধিকার করেন। তারপরে ১১৯৯ সালে বিহার ও বাংলা দেশ আফগানের ঘোর এবং বেনারস, বুন্দেলখণ্ড আদি দিল্লির সুলতানের অধিকারে চলে যায়। কাথিয়াবাড় ও গুজরাট বহুদিন শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকে, কিন্তু অবশেষে ১২৯৭ সালে মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করে। মহারাষ্ট্র দখল হয় ১৩১৭-১৮ সালে। দক্ষিণ ভারতও ক্রমে মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এইরূপে ১৫৬৫ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের অধিকারে চলে যায়।[১]

মধ্যযুগের প্রারম্ভে সমগ্র ভারতবর্ষ অসংখ্য ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত

[১] *The Oriental World* : Jeannine Auboyer & Roger Goepper.

ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যবোধ তো দূরের কথা বরং অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। ফলে বহির্দেশীয় শক্তি ভারত আক্রমণে প্ররোচিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ সমগ্র ভারতবর্ষই মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে।

মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে কেহ কেহ সংগীত ও ললিতকলার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁরা যুদ্ধ জয়ের পরে নানাবিধ অপকর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেব-দেবীর মন্দির, ধর্মীয় ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ, গ্রন্থাগার প্রভৃতিও ধ্বংস করেছেন। ফলে অতীতের বহুবিধ মূল্যবান গ্রন্থাদি এবং শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনাদি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে একেবারে বিনাশ করতে পারেন নি। কারণ তৎকালীন অনেক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পণ্ডিতেরা বিবিধ গ্রন্থাদি রচনা করে অতীতের বহুবিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংরক্ষণ করেছেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে চিরদিনই সংগীতচর্চার আধিক্য ছিল। বাংলাদেশের সংগীতালোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, চৈতন্য-পূর্ব সমাজেও বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সহযোগে সেখানে নৃত্য গীত ও বাদ্যাদির যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলন ছিল। কারণ গুপ্ত পাল ও সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে বিশেষরূপে সংগীতচর্চা ছিল অনেকেই সেকথার উল্লেখ করেছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "...জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্বদাই গুর্জরী, খাম্বাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কাম্বোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে ঐ সকল রাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোনোকালেই একটা নির্দিষ্ট কায়দা বা বিধানের বশবর্তী হইয়া চলিতে রাজি নহে। জনসাধারণ সংগীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য করিয়া লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল, এই সুর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্য) 'বংগাল রাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ।"[১] তিনি

১ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎবঙ্গ।

আরো বলেছেন যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভায় মূর্ত হয়ে উঠতো। সমুদ্রগুপ্ত যখন বীণা বাজাতেন তাঁর সেই স্বরলহরী নারদ তুম্বুরু প্রভৃতি সংগীত সম্রাটদেরও লজ্জা দিত বলে তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেবের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী গান্ধার রাগে গান গেয়ে কপিলেশ্বরের সভাজয়ী সংগীতাচার্যকে পরাজিত করেছিলেন। ঘটনাটি হলো, একদিন রাজা লক্ষণ সেন তাঁর সভানর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা এবং অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে প্রমোদরত ছিলেন। (এই শশীকলা ও বিদুৎপ্রভার সংগীতে রাগ-রাগিণী এমন মূর্ত হয়ে উঠতো যে তা শুনে লোক বেহুঁস হয়ে যেত। বিদ্যুৎপ্রভার কণ্ঠে সুহা রাগ শুনে এক রমণী নাকি নিজের শিশুর গলায় দড়ি বেঁধে কুয়ায় নামিয়ে দিয়েছিল)। এমন সময় বুঢ়ন মিশ্র নামে এক সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, আমি ওড্রদেশের রাজা কপিলেশ্বরের সভা জয় করে জয়পত্র পেয়েছি। তিনি সংগীত প্রতিযোগিতায় যে-কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। তিনি কোন্ রাগে দক্ষ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পটমঞ্জরী রাগের নাম করেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে তিনি আলাপ শুরু করেন। সুরের প্রভাবে সামনের একটি বৃক্ষ কেঁপে ওঠে এবং তার সমস্ত পাতা ঝরে পড়ে। রাজা বুঢ়নকে উপহার দিতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে জয়দেব-পত্নী গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন, ঘটনা শুনে তিনি বুঢ়নকে প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে পদ্মাবতী গান্ধার রাগ গাইতে আরম্ভ করেন। সুরের প্রভাবে গঙ্গাবক্ষের সমস্ত নৌকা আপনা হতে ভেসে এসে একত্রিত হয়, পত্রহীন বৃক্ষে আবার পত্র শোভিতহয়। কবি জয়দেবও সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাজার অনুরোধে তিনি বসন্ত রাগ গেয়েছিলেন।

মোটকথা ভারতীয় সংগীত ও ললিতকলার ধারা বিবিধ সংঘাতের মধ্য দিয়েও অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত। এই মধ্যযুগে যে সকল সংগীত সাধক ও স্রষ্টারা ভারতীয় সংগীতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সময়কালের দৃষ্টিতে যথাসাধ্য ক্রমানুসারে অতঃপর সংকলন করা হলো।

জয়দেব

(১২শ শতাব্দী)

জগদ্বিখ্যাত কবি জয়দেব গোস্বামী ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে বীরভূম জেলার কেন্দুলা/কেন্দুবিল্ব (বোলপুরের কাছে) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই মাতা রামাদেবী ও পিতা ভোজদেবের মৃত্যু হয়, ফলে জয়দেব গৃহত্যাগী হন। ইনি অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা ও কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে-ছিলেন।

সেন বংশের শেষ রাজা বাংলার লক্ষ্মণ সেনের (১১১৯— ?) সভায় উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন সভাকবি ছিলেন। এঁদের মধ্যে জয়দেব ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। ১২শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি, গীতিকার ও গায়ক হিসাবে জয়দেব স্বীকৃত। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' একখানি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানির ছন্দের সাবলীলতা, পদবিন্যাস, অনুপম সৌন্দর্য তথা সংগীত মাধুর্যে এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, জর্মান, ইংরেজি, ল্যাটিন এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তবে এর প্রথম মুদ্রণ হয়েছে য়ুরোপে। জয়দেবের স্বদেশে নয়। ১৮৩৬ সালে জর্মানীর বন্ শহরে লাসেন্ সম্পাদিত সংস্করণই গীতগোবিন্দের আদিতম মুদ্রণ। য়ুরোপে এর অনুবাদ করেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। সেই ইংরেজি অনুবাদ ১৮০৭ সালে তাঁর *Collected Works*-এর মধ্যে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়! তারপর Edwin Arnold একটি স্বাধীন ইংরেজী অনুবাদ *The Indian song of songs* নামে ১৮৭৫ সালে প্রকাশ করেন। এই দুটি অনুবাদের মধ্যবর্তী সময়ে এর জর্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এফ. রিউকার্ট ১৮৩৭ সালে। তারপর প্যারিস থেকে ফরাসী ভাষায় এর অনুবাদ করেন জে. কোর্টিলিয়ে। এর প্রশস্তিতে শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন: "…জয়দেবের পদাবলী আজি আটশত বৎসর ধরিয়া সমানে একইভাবে গীত হইতেছে। আর কোনো সংগীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি না জানি না… ।"

প্রবন্ধগীতির অন্তর্গত ধ্রুব নামক গীত থেকেই নাকি ধ্রুবপদের উৎপত্তি। ধ্রুব গানের রীতিতেই নাকি গীতগোবিন্দ গঠিত ছিল। তবে জয়দেব স্বয়ং তাঁর পদাবলীকে প্রবন্ধ বলে প্রতিটিতে রাগ ও তালের উল্লেখ করেছেন। সেই সংগীত সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা আজ অসম্ভব। জয়দেবের মৃত্যুর প্রায় ২৫০ বছর পরে ১৫শ শতকের মধ্যভাগে মহারাণা কুম্ভ এর নতুন রূপায়ণ করেন। সেই স্বরলিপি খুব স্পষ্ট না হলেও তৎকালীন সংগীতের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দের সংগীতরূপের আর-এক পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' (১৮৭২ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে গীতগোবিন্দের ২৫টি প্রবন্ধের স্বরলিপি আছে।

গীতগোবিন্দ রচনা সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। একদিন জয়দেব "স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্" এই পর্যন্ত লেখার পরে পরবর্তী উপযুক্ত পদ সৃষ্টিতে অসমর্থ হন। এবং পরে স্নান করতে যান। অল্পসময়ের মধ্যেই স্নানান্তে ফিরে এসে পুঁথির মধ্যে কিছু লেখেন এবং আহার করতে বসেন। আহারান্তে আবার বেরিয়ে যান। স্ত্রী পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণকালে দেখা যায় যে, জয়দেব আবার যেন স্নানান্তে ফিরে এলেন। তিনি পদ্মাবতীকে তাঁর পূর্বেই অন্নগ্রহনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পদ্মাবতী ভয়ে বিস্ময়ে কম্পিত হৃদয়ে বললেন, সেকি কথা প্রভু! স্নানান্তে ফিরে এসে আপনি তো পুঁথিমধ্যে কিছু লিখলেন, তারপরে আহার সমাধা করে বাইরে চলে গেলেন? আমি তো আপনারই প্রসাদ গ্রহণ করছি। জয়দেব তখন পুঁথি খুলে দেখলেন যে, তাঁর অসম্পূর্ণ পদ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পংক্তি লিখে পূর্ণ করা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে সাহায্য করেছেন। তিনি বললেন যে, পদ্মাবতী! তুমি মহাপুণ্যবতী, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাকে ছলনা করেছেন, তুমি তাঁরই প্রসাদ পেয়ে ধন্য।

জয়দেব ও পদ্মাবতীর সংগীতনৈপুণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক এবং চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থানাভাবে এখানে সে সকল সংকলন করা সম্ভবপর হলো না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গীতগোবিন্দ গ্রন্থে পদ্মাবতীকে জগন্নাথ মন্দিরের সেবাদাসী এবং রোহিণীকে জয়দেবের স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পল্লী-

বিয়োগের পরে জয়দেব স্বগ্রামে চলে আসেন এবং জন্মভূমিতেই প্রাণত্যাগ করেন।

বর্তমানে এই গ্রামটি জয়দেব-কেন্দুলা নামে পরিচিত। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সেখানে বিরাট মেলার আয়োজন হয় এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দূর দূরান্ত থেকে বহু সাধু, বৈষ্ণব প্রভৃতির সমাগম হয়।

শার্ঙ্গদেব

(১৩শ শতাব্দী)

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বংশ-পরিচয় আদি দেওয়ার রীতি ছিল না। তাই কোনো শাস্ত্রকারের নাম ছাড়া আর কিছু জানতে হলে অপরের উক্তি বা প্রচলিত কাহিনী প্রভৃতিতেই নির্ভর করতে হয়। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, কয়েকজন পণ্ডিত আপন বংশ-পরিচয় তাঁদের গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখে রেখে গেছেন। শার্ঙ্গদেব তেমনি একজন। তা না হলে এমন একজন স্রষ্টা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না।

শার্ঙ্গদেবের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। এই বংশের প্রতিভাবান ভাস্কর মুসলমানদের অত্যাচারে দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন। ভাস্করের পুত্র সোঢল দেবগিরির (বর্তমান দৌলতাবাদ, মহারাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত) যাদব বংশীয় রাজা ভিল্লম ও পরে তাঁর পুত্র সিংহনের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সিংহনের রাজত্বকালে (১২০৮-৪৪ খৃষ্টাব্দ) সোঢলের পুত্র শার্ঙ্গদেবের জন্ম হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান শার্ঙ্গদেব অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে রাজাশ্রয় লাভ করেন। ফলে সংগীত এবংআরো নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওয়ার সুযোগ পান। লেখাপড়া ও সংগীতচর্চা নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। সেই সঙ্গে তিনি চিকিৎসকের কাজও নাকি করতেন। অবশ্য নিজেকে তিনি শ্রীকরণাগ্রনী বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন করণ বা দপ্তরের প্রধান কর্মচারী। এঁর ডাকনাম ছিল নিঃসঙ্ক। তাই এঁর উদ্ভাবিত বীণার নাম রেখেছিলেন 'নিঃসঙ্কবীণা'।

সেই সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে আনুমানিক ১২৪৮-

৬৫ সালে তিনি প্রসিদ্ধ 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থখানি রচনা করেন, যা স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায় এই সাতটি পরিচ্ছদ নিয়ে সম্পূর্ণ। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ আর দেখা যায় না। এই গ্রন্থে সাংগীতিক যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ভরত ও মতঙ্গের অনুগামী শাস্ত্রী হলেও সকল পূর্বাচার্যদের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ সহযোগে প্রাচীন ও সমসাময়িক সংগীতের পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধর্বগীত সম্বন্ধে তিনি যেমন আলোচনা করেছেন তাতে মনে হয় ওই রীতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। ভারতীয় সংগীতে মধ্য-এশিয়ার প্রভাব, প্রাচীন সংগীতের ক্রমবিবর্তন, বহুবিচিত্র গীত-রীতির জন্ম ইতিহাস, এমন-কি, স্বরলিপি সহযোগে সংগীত সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও ইনি করেছেন। এছাড়া ভরত বর্ণিত চলাচল বীণার সাহায্যে বাইশটি শ্রুতি ও স্বরস্থান নিরূপণের বিষয়টিরও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ইনি অভিজাত সংগীতেরই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এঁর মতে প্রয়োগ ক্ষেত্রে যা সত্য তাই প্রকৃত শাস্ত্র। প্রয়োগ কার্যে অবহেলিত শাস্ত্রের কোনো মূল্য নেই। স্বীকার করেছেন যে গান্ধর্ব বা মার্গসংগীত গ্রন্থের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে, যা প্রচলিত তা হলো দেশী সংগীত, যা নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং কালানুগত বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না।

এই গ্রন্থে বর্ণিত বহু বিচিত্র রাগের মধ্যে মালব, গৌড়, কর্ণাট, বঙালি, দ্রাবিড়, সৌরাষ্ট্র, গুর্জর প্রভৃতি রাগ-নামগুলি প্রদেশ বিশেষের নামের সঙ্গে সম্বন্ধ সূচনা করায়; তখন এই রীতিতে রাগের নামকরণ করা হতো এইরূপ মনে হয়। এছাড়া তুরস্কতোড়ী, তুরস্কগৌড় প্রভৃতি রাগের প্রতিপাদন প্রমাণ করে যে, তখন সংগীতে মুসলমানদের প্রভাব দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শার্ঙ্গদেব বর্ণিত শুদ্ধরাগ 'মুখারী' বর্তমান কর্ণাটক সংগীতে 'কণকাঙ্গী' নামে পরিচিত।

সংগীতরত্নাকর গ্রন্থখানি সংগীতজগতে একটি অমূল্য রত্নবিশেষ এবং সমগ্র ভারতবর্ষে প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থের দুরূহ বিষয় সম্পর্কে সহজবোধ্য টীকা রচনা করে পরবর্তীকালে সিংহভূপাল (১৪শ শতাব্দী) এবং কল্লিনাথ (১৫শ শতাব্দী) যশস্বী হয়েছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সিংহভূপাল বলেছেন যে, শার্ঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ভরত আদি পূর্বাচার্যদের বর্ণিত সকল সাংগীতিক উপকরণ, পদ্ধতি প্রভৃতি দুর্বোধ্য তথা লুপ্ত হতে চলেছিল,

ইনিই সেই সকল মূল্যবান তথ্যাদি সংরক্ষণ ও প্রচার করেছেন। ১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনি পরলোক গমন করেন।

পার্শ্বদেব

(১৩শ শতাব্দী)

পার্শ্বদেব-কৃত 'সংগীতসময়সার' (সংস্কৃত ভাষায় রচিত সংগীতশাস্ত্র) গ্রন্থ এবং তার প্রমাণবাক্যের উল্লেখ সিংহভূপাল আদি অনেক শাস্ত্রীরা করলেও লেখক সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেন নি। এমন-কি, তিনি গায়ক না বাদক ছিলেন তাও বোঝা যায় না। তবে তাঁর উদ্দেশে রচিত যশোগান থেকে জানা যায় যে, তাঁর 'শ্রুতিজ্ঞান চক্রবর্তী' এবং 'সংগীতাকর' এই দুটি উপাধি ছিল— যার সাহায্যে, ইনি যে উত্তম শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে উচ্চস্তরের সংগীতশিল্পী ছিলেন, বোঝা যায়। গ্রন্থখানি দক্ষিণ-ভারতেই অধিক প্রচলিত হওয়ায় এঁকে দক্ষিণী গুণী এবং নামানুসারে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। ডক্টর কৃষ্ণমাচারিয়ার কথানুসারে ইনি ছিলেন শ্রীকণ্ঠ-গোত্রীয়। পিতার নাম আদিদেব এবং মাতার নাম ছিল গৌরী দেবী। তাঁর গ্রন্থ থেকেই তাঁর সময়কালের একটা ধারণা করা যায় কারণ তিনি একস্থানে রাজা ভোজ ও সোমেশ্বরের নামোল্লেখ করেছেন এবং অন্যত্র বলেছেন যে, আভোগ যে গানের অন্তিমভাগ তা রাজা পরমর্দীই ঠিক করে দিয়ে গেছেন। রাজা পরমর্দীর রাজত্বকাল হলো ১১৮০-১২০৪ খৃষ্টাব্দ। ইনি তাঁর পরবর্তী গুণী। সেই হিসাবে গবেষকগণ এঁর জন্মসময় ১২২০-২৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১২৬০-৮০ খৃষ্টাব্দে 'সংগীতসময়সার' রচিত হয়েছে বলে অনুমান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থখানি খণ্ডিতরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় এর কটি অধ্যায় এবং তার বিস্তৃতি কতটা ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

এই গ্রন্থে দেশীগানের যেমন সুন্দর পরিচয় আছে তেমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর মতে দেশীগান শুধু লোকগীতিই নয়, তা দেশী রাগে রচিত একটি বিশেষ গীতরীতি। যাতে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ ইত্যাদি রাগের সমাবেশ থাকে। এই প্রসঙ্গে বিবাহাদি মঙ্গলগান, উৎসাহ-ব্যঞ্জক গান হাসির গান প্রভৃতিকে দেশীগান, ভক্তিমূলক গানকে রম্যগান এবং চর্যাজাতীয় গানকে অধ্যাত্মগান বলা হতো বলে উল্লেখ করেছেন। আলপ্তির

বহুপ্রকার রূপ সম্পর্কে ইনি আলোচনা করেছেন। আলপ্তির পরিচয়ে বলেছেন যে, প্রবন্ধ গাইবার পূর্বে আলপ্তি শেষ করা হয়। এতে ভাষা বা অক্ষর নাও থাকতে পারে। তালযুক্ত বা তালবিহীন হতে পারে। এছাড়া শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, গমক, স্বরস্থান প্রভৃতিরও বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তারপর গ্রামরাগ ও সেইগুলির নামোল্লেখসহ রাগ বর্গীকরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রায় ১০২টি রাগনাম উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে ভৈরব ও ভৈরবী রাগনাম দুটি এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

আমীর খুসরো

(১৩শ শতাব্দী)

পারস্যের খোরাসান প্রদেশের বলবন নামক স্থানের অধিবাসী আমীর মহম্মদ সৈফুদ্দীনের পুত্র আমীর খুসরো উত্তর ভারতের এটোয়া জেলার পটিয়ালী গ্রামে ১২৫৩-৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রকৃত নাম নাকি আবুল হসন ছিল। মাত্র দশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাতুলালয়ে চলে যান। অল্পকালের মধ্যেই ইনি ফার্সী, তুর্কী, আরবী, হিন্দী, ব্রজভাষা প্রভৃতিতে এবং আরো নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়ে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাল-ক্রমে ইনি দিল্লীপতি গিয়াসুদ্দীন বলবনের আশ্রয়লাভ করেন। রাজসভায় ইনি আমীর খুসরো বা সম্রান্ত রাজবংশীয় বলে পরিচিত হন। সেখানে একদিকে যেমন সংগীত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মে, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি গভীর অধ্যয়নের সুযোগ পান। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যিক ও কলাকারদের সংস্পর্শে তাঁর প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভের সুযোগ পায়। ক্রমে ইনি একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি এবং উচ্চস্তরের সংগীত-শিল্পী হিসাবে পরিচিত হন। এই সময়ে ইনি সুফি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সংস্পর্শে আসেন, যাঁর প্রভাবে ইনি সুফি মতবাদ তথা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইনি বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজির শুধুমাত্র সভাগায়কই নয়, ধর্মগুরু এবং প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে ইনি ৯৯খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে 'নু সিপীর', 'তুঘলকনামা' 'মহদফতরে মুসিকি আলম' প্রভৃতি কয়েকখানি

গ্রন্থ পাওয়া যায়। বাল্যকাল থেকেই এঁর সংগীত ও কবিতার প্রতি ঝোঁক ছিল, পরিণত বয়সে যার চরমতম বিকাশ ঘটে। তৎকালীন হিন্দী ও ফার্সী কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। উর্দু ভাষার স্রষ্টা ও আদি লেখক হিসাবেও ইনি স্বীকৃত। প্রচলিত ব্রজভাষাকে ইনি সাহিত্য-ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন, যা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। ইনি হিন্দু-সভ্যতার সমঝদার এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁর রচনাবলীতে বহু হিন্দী শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

পারস্যের সংগীত মিশ্রণে ইনি ভারতীয় সংগীতে নানাবিধ নবীনতার সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে ইনি ১২টি মোকামে বর্গীকরণ এবং বহু নবীন গীতরীতির প্রবর্তন করেন। এছাড়া নানাবিধ রাগ, তাল ও বাদ্যযন্ত্রও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন—

গীতরীতি— খেয়াল, তরানা, গজল, কাওয়ালী, খমসা প্রভৃতি।

রাগ— ইমন, পূরবী, শহানা, পুরিয়া, জীলফ, সাজগীর, বরারী, সুনম, নিগার প্রভৃতি।

তাল— সওয়ারী, ফরদোস্ত, পাস্তা, যৎ, আড়াঠেকা, ঝুমরা প্রভৃতি।

বাদ্যযন্ত্র— সেতার, তবলা, ঢোল প্রভৃতি।

অবশ্য এগুলি খুসরো আবিষ্কৃত কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ এগুলির অধিকাংশই প্রাচীন ভারতে অন্যনামে বিদ্যমান ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে খুসরো যে নানাভাবে সংগীতের উন্নতি সাধন এবং নবীনতা এনেছিলেন সেকথা সর্বমান্য।

১৩২৪ সালে খুসরোর গুরু নিজামুদ্দীনের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে এবং সেই বছরেই তাঁরও মৃত্যু হয়। তাঁর ইচ্ছানুসারে গুরুর সমাধির পায়ের দিকে তাঁকেও সমাধিস্থ করা হয়। দিল্লীতে তাঁর সমাধিতে প্রতি বছর বহু সংগীতজ্ঞের সমাগম হয় এবং তাঁর রচিত গান গেয়ে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

খুসরোর তিন পুত্র ছিল যার মধ্যে ফিরোজ খাঁ সেতার বাদনে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এইরূপ শোনা যায়। তবে বর্তমানে এর বংশধরেরা তবলীয়া হিসাবেই অধিক প্রসিদ্ধ।

গোপাল নায়ক

(১৩শ শতাব্দী)

সুপ্রসিদ্ধ সংগীত সাধক গোপাল নায়ক দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের কাছাকাছি কোনো স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এঁর জন্মস্থান, মৃত্যুকাল প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে ইনি যে অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন সেকথা কয়েকজন শাস্ত্রী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যেমন, বিভিন্ন তালের ব্যাখ্যাকালে পণ্ডিত কল্লিনাথ এঁর উদাহরণ দিয়েছেন, (কীভাবে গোপাল কোন্ তাল ব্যবহার করতেন, ইত্যাদি), শ্রুতিবীণার আলোচনাকালে পণ্ডিত ব্যংকটমুখী গোপাল নায়কের শ্রুতিবিচক্ষণতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুজন পণ্ডিত যে ভাবে এঁর কথা বলেছেন তাতে মনে হয়, যেন তাঁরা প্রত্যক্ষরূপে গোপালের গুণমুগ্ধ ছিলেন, অথবা গোপাল রচিত কোনো গ্রন্থ ছিল। তবে ফকীরুল্লা সাহেব এঁর সম্পর্কে এক অদ্ভুত উক্তি করেছেন যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর মতে আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) গোপাল নাকি দিল্লী এসেছিলেন এবং খসরুর ছলনায় সংগীত প্রতিযোগিতায় পরাজয় বরণ করেছিলেন। এই গল্পকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী-কালে নানা বিকৃত কাহিনী প্রচলিত হয়েছে। অবশ্য এখানে মনে রাখা কর্তব্য যে, গোপাল নায়ক, নায়ক গোপাল প্রভৃতি নামে একাধিক সংগীতজ্ঞ গোপালের সন্ধানও পাওয়া যায়।

আসলে গোপাল খসরুর পরবর্তী গুণী। প্রবন্ধগীতি ও তাল প্রভৃতি বিষয়ে এঁর অসাধারণ জ্ঞানপ্রগাঢ়তা তদুপরি অতিগুণী-গায়ক শিল্পী হওয়ায় খসরুর কীর্তিকে ম্লান করেছিল। সম্ভবত তাই পরবর্তীকালে হিন্দুরা এঁকে নিয়ে গর্ববোধ করতো এবং মুসলমানেরা সেই গর্ব খর্ব করার জন্য নানা অপপ্রচার করতো।

পণ্ডিত কল্লিনাথের ভাষ্যে জানা যায় ইনি রাগকদম্ব গানে সিদ্ধ ছিলেন, যা বত্রিশটি রাগযুক্ত এবং বিভিন্ন তালে রচিত এক মহাপ্রবন্ধ। ইনি ছন্দ ও প্রবন্ধ গীতিতে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। মূল সংস্কৃত বহু গান ইনি তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। ইনি খট, দেশকার, গুণকেলী, গৌরী প্রভৃতি কতগুলি রাগও সৃষ্টি করেছিলেন।

সিংহভূপাল

(১৪শ শতাব্দী)

১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সংগীতরত্নাকরের টীকাকার দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রী সিংহভূপালের জন্ম হয়। এঁর পিতামহ দচন জাতিতে শূদ্র হলেও অন্ধ্রপ্রদেশের রেচর্লবংশীয় রাজা ছিলেন। দচনের জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্ত বা অনন্তপোত (রাজ্যকাল : ১৩৪০-৬০) ছিলেন সিংহভূপালের পিতা এবং এঁর মাতার নাম ছিল অন্নাম্বা। সিংহভূপাল রাজশৈলের (শ্রীশৈল ?) রাজা ছিলেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্য, সংগীত তথা অলংকার শাস্ত্রাদিতে প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, 'সংগীত-রত্নাকরের টীকা', 'সংগীত সুধাকর' (সংগীত বিষয়ক, ১৩৯০ খৃঃ), 'রসার্ণব সুধাকর' (অলংকার শাস্ত্র, এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ইনি বিস্তৃতরূপে আপন বংশ পরিচয় দিয়েছেন), 'কুবলয়াবলী' বা 'রত্নপঞ্চালিকা', (নাট্যগ্রন্থ), 'কন্দর্প সম্ভব (কাব্যগ্রন্থ) ইত্যাদি।

ইনি বলেছেন, শার্ঙ্গদেবের পূর্বে ভরতাদি শাস্ত্রীদের বর্ণিত সংগীত পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন তথা নানা বিষয়ে আলোকপাত করে সংগীতের প্রকৃত রূপটি পরিস্ফুট করেছেন পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব। এঁর রচিত টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং আতিশয্য বর্জিত, ফলে মূল বক্তব্য বেশ সহজবোধ্য হয়েছে।

মাধব বিদ্যারণ্য

(১৪শ শতাব্দী)

দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রী প্রসিদ্ধ বিদ্যারণ্য ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে পম্পা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রকৃত নাম ছিল মাধবাচার্য। তাঁর জ্ঞান ও গুণপনার জন্য পরবর্তীকালে ইনি বিদ্যারণ্য উপাধিলাভ করেছিলেন। সায়নাচার্য নামক প্রসিদ্ধ বেদের ভাষ্যকার এঁর ভ্রাতা ছিলেন। দুজনেই সংগীতে পারদর্শী এবং তৎকালীন উৎকৃষ্ট সামগ ছিলেন। এছাড়া এঁর বংশ পরিচয়াদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে ইনি ১৩২০ থেকে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

১৩৪৩ সালে বিজয়নগর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যারণ্য রাজ্যের মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দেশ বিদেশের গুণীজনদের রাজসভায় আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। ইনি একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ এবং সংগীতে প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন। গোবিন্দ দীক্ষিত (অনেকের মতে ইনি তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথ) তাঁর 'সংগীতসুধা' গ্রন্থে বিদ্যারণ্য রচিত 'সংগীতসার' গ্রন্থের উল্লেখ করে এঁকে 'কর্ণাট সিংহাসন ভাগ্য' বলে প্রশস্তি করেছেন। বিকানীর মহারাজার গ্রন্থাগারে 'সংগীতসার' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। অবশ্য 'সংগীতসার' নামে অনেকেই সংগীতগ্রন্থ রচনা করেছেন, সুতরাং ঐটি বিদ্যারণ্য রচিত কিনা, সঠিকভাবে সেকথা বলা কঠিন। সংগীতগ্রন্থ ছাড়াও ইনি 'দৃগদৃশ্যবিবেক', 'পঞ্চদশী' সর্বদর্শন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত 'পরাশর' 'মাধব নামে' পরাশর সংহিতা'র একখানি ভাষ্যও রচনা করেন।

'সংগীতসার' গ্রন্থে ইনি ১৫টি মেল বা জনকরাগ ও ৫০টি জন্য রাগের পরিচয় দিয়েছেন। মেলচক্র বা জন্য-জনক রাগ বর্গীকরণের ইনিই সম্ভবত প্রথম প্রবর্তক। এঁর বর্ণিত শুদ্ধমেল 'মুখারী'র রূপ বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতের কাফী থাটের মতো ছিল। মাধবাচার্যের মেল-প্রচলন পরবর্তীকালে ভারতীয় সংগীতকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেয়।

বিদ্যাপতি
(১৪শ শতাব্দী)

মিথিলার (ত্রিহুত) সুপ্রসিদ্ধ কবি, গায়ক তথা সংস্কৃতসাহিত্য ও সংগীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অসাধারণ প্রতিভাবান বিদ্যাপতিকে কেহ কেহ বাঙালি বলে মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দেখা যায় যে, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে মিথিলা বাংলার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১৩শ শতকে তুর্কীরা বাংলাদেশ জয় করার পরে মিথিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং ১৪শ শতকের মিথিলাকে আর বাংলার অন্তর্গত বলা যায় না। তবে ওই সময়ে একজন বাঙালি বিদ্যাপতিরও সন্ধান পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে উল্লিখিত রাজা-মহারাজাদির ঘটনা এবং সমসাময়িক অন্যান্য তথাদি বিচার করে গবেষকেরা এঁর অভ্যুদয়কাল ১৩৭২ সালের

কাছাকাছি বলে স্থির করেছেন। ইনি নাকি ৮৭-৮৮ বছর জীবিত ছিলেন, সেই হিসাবে ১৪৬০ সালের কাছাকাছি এঁর মৃত্যুকাল ধরে নেওয়া যায়।

যদিও এঁর গ্রন্থাদিতে রাজা কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ প্রমুখের নামও পাওয়া যায়, তবে এঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা শিবসিংহ। ইনি ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি এঁকে 'কবিশেখর', 'কণ্ঠহার' প্রভৃতি উপাধিতে সম্মানিত এবং বসবাসের জন 'বিসপী' নামক একটি গ্রাম দান করেছিলেন, সেখানে এঁর বংশধরেরা এখনো বসবাস করছেন। সেই দানপত্রের অনুলিপি দ্বারভাঙ্গার রাজ-গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে।

সংস্কৃত এবং মৈথিলী ভাষাতে ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করেছেন। তখনকার দিনে মিথিলার পণ্ডিতেরা মৈথিলী ভাষাকে খুব অবজ্ঞা করতেন। মাতৃভাষার এই অবহেলা এঁকে ব্যথিত করে তোলে, তাই ইনি মৈথিলী ভাষাতেই লেখা শুরু করেন। কালক্রমে এঁর পদাবলী এমন জনপ্রিয়তালাভ করে যে, সমগ্র পূর্বভারতে তা অনুসৃত হতে থাকে। বাংলা-সাহিত্যে তো এঁর স্থান সর্বোচ্চভাগে। এঁর অনুকরণে ব্রজবুলি (ব্রজভাষা নয়, কারণ এ'দুটিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে) নামক একটি নতুন ভাষা বাংলা-দেশে প্রচলিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই পদাবলীর রস ও গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এর কাব্যরসে আকৃষ্ট হয়ে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন।

লোচন-কৃত 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বিদ্যাপতির অনেক পদের উল্লেখ রাগ ও তাল সহ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, ইনি কতগুলি নবীন রাগ উদ্ভাবন করেছিলেন। যেমন, মাধবী, ভাটিয়ালী, ভোগিনী, প্রীতিকারী, দেবকামোদ, আসাবরী ইত্যাদি। বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থাবলী হোল 'পুরুষপরীক্ষা', 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'শৈব-সর্বস্বহার', 'দানবাক্যাবলী', 'গয়াপত্তন', 'বিবাদসার', প্রভৃতি। অবশ্য এর সবগুলি একই বিদ্যাপতি রচিত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভক্ত কবীর
(১৪শ শতাব্দী)

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক পরমভক্ত কবীরদাস সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বহু বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে, যার থেকে সত্য উদ্ধার করা কঠিন। তবে গবেষকগণ তাঁর জন্ম ১৩৯৮ সালে এবং মৃত্যু ১৫১৮ সালে বলে স্থির করেছেন। এঁর রচনা অনুসারে বোঝা যায় যে, 'কাশী' এবং 'মগহর' নামক স্থানের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাই এঁর জন্মস্থান বলে এই দুটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি একস্থানে নিজেকে 'কোরী' (ম্লেচ্ছ শ্রেণী) আবার অন্যস্থানে 'জোলা' (তাঁতি) বলেছেন। এঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী শোনা যায় :

একদিন এক নিঃসন্তান তাঁতি দম্পতি (নিরু ও নীমা) ভোরবেলা চলেছে দূর কর্মস্থলে। লহর সরোবরের কাছে হঠাৎ শোনা যায় শিশুর কান্না। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় দুজনে, দেখে, পদ্মফুলের উপরে শুয়ে আছে এক সদ্যোজাত শিশু। কে এই শিশু ?- কী তার পরিচয় ? যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের দান বলেই তারা গ্রহণ করে এবং নিঃসন্তান পরিবারে আসে আনন্দের জোয়ার। এই শিশুই 'কবীর' নামে পরিচিত।

শৈশবেই এর স্বভাবে অন্যমনস্কতা, রামনাম জপ, উপবীত ধারণ প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সমবয়সীরা এইজন্য এঁকে বিদ্রূপ করতো। পরবর্তীকালে ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ স্বামী রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দৈববাণীর সাহায্যে নাকি এঁকে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আবার কেহ বলেন যে, এই শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য তিনি নাকি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

কবীরের কাছে আল্লা অভিন্ন ছিল। ইনি মানুষকে সকলের উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে গড়া সব বাধাকে অস্বীকার করে বলেছেন :

যো খোদায় মসজিদ বসত হৈ ঔর মুলুক কহিকেরা।
তীরথ মুরত রাম নিবাসী বাহর করে কো হেরা॥

মোকো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মৈ তো তেরে পাসমে।
না মৈ দেবল না মৈ মসজিদ না কাবে কৈলাস মে॥

তিনি বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন, যা আজও সমগ্র ভারতে সমাদৃত এবং প্রচলিত। শিখধর্ম কবীরের মতানুসারে প্রভাবিত হয়েছিল তাই তাদের আদিগ্রন্থে তাঁর বহুগান সংকলিত আছে। ইনি নিরক্ষর ছিলেন, মুখে মুখে ইনি রচনা করতেন। এবং এর শিষ্যেরা সেগুলি লিখে রাখতেন। হিন্দীভজন রচনায় এঁকেই পথপ্রদর্শক বলা যায়। এঁর মৃত্যু সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কাহিনী শোনা যায়।

মৃত্যুকালে এঁর দুই প্রিয় শিষ্য রাজা বীরসিংহ এবং নবাব বিজলী খাঁ গুরুকে দেখতে এলেন। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ দাহ হবে না সমাধিস্থ হবে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে বিবেচনা করে ইনি প্রথমে শিষ্যদের শপথ করালেন যে, এইজন্য যেন কেহ অস্ত্র চালনা না করেন। তারপরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে ইনি উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে ঘরের বাইরে যেতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা যখন অধৈর্য হয়ে ভিতরে ঢুকলেন এবং আচ্ছাদন উন্মুক্ত করলেন তখন দেখা গেল সেখানে অনেক ফুল পড়ে আছে।

এইরূপে এই মহান ভক্তের আসা এবং যাওয়া দুই-ই রহস্যাবৃত রয়ে গেল।

মহারাণা কুম্ভ
(১৫শ শতাব্দী)

মারবাড়ের মহারাণা মোকলের পুত্র চিতোরের রাণা কুম্ভ ১৪৩৩ সালে সিংহাসন লাভ এবং ৩৫ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য নির্বাহ করেন। মনে হয় ইনি ১৪শ শতকের শেষে কিম্বা ১৫শ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুম্ভকর্ণ নামেও পরিচিত এবং রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে স্বীকৃত। কারণ ইনি মহাযোদ্ধা ন্যায়পরায়ণ তথা শাসন-দক্ষ নৃপতি, সংগীত ও নানা শাস্ত্রে তথা সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং অতি গুণী বীণকার ছিলেন। এঁর মতো বহুমুখী প্রতিভা রাজা মহারাজাদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। ইনি বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে চিতোরের ভগবান কৃষ্ণের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। আবুলফজল তাই

'আকবরনামাতে' এ কে 'কুম্ভশ্যাম' নামে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই বংশের বধূ মীরাবাই কৃষ্ণের আরাধনায় বাধা পেয়েছিলেন, এই কাহিনী কতদূর সত্য তা বলা শক্ত।

বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে এঁর অসীম আগ্রহ ছিল। বীণা বাদনে ইনি এতদূর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, এঁকে 'অভিনব ভারতাচার্য' নামে অভিহিত করা হোত। এঁর রচিত 'সংগীতরাজ' বা 'সংগীতমীমাংসা', গীতগোবিন্দের টীকা বা 'রসিকপ্রিয়া', 'সংগীতরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থে এর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি কিছু ধুন ও ছন্দাদি উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়া জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' ইনি স্বরচিত স্বরলিপির সাহায্যে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন, যাতে এঁর দূরদৃষ্টি ও অসাধারণ উদ্ভাবন প্রতিভা প্রমাণিত করে। অবশ্য এই স্বরলিপি শার্ঙ্গদেব উদ্ভাবিত স্বরলিপির অনুবর্তী এবং উপযুক্ত চিহ্নের অভাবে অস্পষ্ট, তবু এর থেকে তৎকালীন প্রচলিত প্রবন্ধগীতির কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি বহুকাল বিকানীর লাইব্রেরীর কাগজের স্তূপের মধ্যে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। এতে সংগীতের বিভিন্ন উপাদানাদির বিশদ বর্ণনা ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ সুললিত কাব্যময় বর্ণনা কদাচিৎ দেখা যায়। গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি করার সময়ে ইনি 'কালসেন' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

সুলতান হুসেন শর্কী
(১৫শ শতাব্দী)

সুলতান মামুদ শা'র মৃত্যুর পরে ১৪৫৭ সালে হুসেন শা জৌনপুরের সুলতান হন। মাঝে মাঝে যুদ্ধযাত্রা করলেও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি একনিষ্ঠভাবে সংগীতের সেবা করেন। ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী এবং উচ্চস্তরের শিল্পী ছিলেন। কথিত আছে যে, 'বড়ো খেয়াল' গায়নরীতি এবং জৌনপুরী, জৌনপুরী আসাবরী, জৌনপুরী তোড়ী, ১২ প্রকার শ্যাম প্রভৃতি রাগ ইনিই উদ্ভাবন করেছেন।

এই বংশের ইনিই ছিলেন শেষ বাদশাহ। ১৫শ শতকের প্রথম দিকে এঁর জন্ম এবং ১৪৯৯ কিম্বা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

চণ্ডীদাস
(১৫শ শতাব্দী)

বীরভূমে কীর্ণাহারের নান্নুরে একজন চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়, যিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে পরিচিত। জন্ম ১৪১৭ সালে, পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। ইনি বাঁশুলি (বিশালাক্ষী) দেবীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। রজকিনী রামী (রামতারা) নামে তাঁর একজন সাধন-সঙ্গিনী ছিল। এঁর সম্পর্কে বহু কাহিনী বাঁকুড়ায় প্রচলিত। সেখানে ছাতনায় আর-একজন চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাধন-সঙ্গিনীর নাম পূর্বোক্ত ভাবেই যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অপর একজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে শোনা যায় যিনি নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন। তারপর চণ্ডীদাস-তারা, চণ্ডীদাস-নবাবপত্নী প্রভৃতি কাহিনীর প্রচার বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছে। যদিও সেইদিনে বৈষ্ণব সাধকগণ সাধন-সঙ্গিনী-পদ্ধতি পালন করতেন যা আজও প্রচলিত, এবং সেই হিসাবে চণ্ডীদাস-রামীর কাহিনী অসম্ভব নয়, কিন্তু কাহিনীগুলি যখন রাজনন্দিনী বা নবাবপত্নীযুক্ত হয় তখনই প্রকাশ পায় তার অবাস্তবতা।

এইরূপে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে (বরং কিম্বদন্তীর ভিত্তিতে বলা যায়) ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বেশ কয়েকজন চণ্ডীদাস নামধারী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, একজন প্রাচীন গুণী না থাকলে 'আদি', 'বড়ু', দীন, দ্বিজ ইত্যাদি পূর্বশব্দযুক্ত চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হোত না। তবে যিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', 'রাধাবিরহখণ্ড' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করেছিলেন বলে অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি আধুনিক গীতিনাট্যের প্রথম পথপ্রদর্শক তথা কীর্তন-রীতির প্রচলন কর্তা ছিলেন, ভাব, ভাষা, ছন্দলালিত্য, রসমাধুর্য প্রভৃতিতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, যাঁর পদাবলী কীর্তন আজও প্রচলিত, যাঁর অনুসরণে পরবর্তী চণ্ডীদাস নামধারী কবিরা বহু পালাগান ও নাটসাদি রচনা করেছেন, সেই আসল চণ্ডীদাস সম্পর্কে কোনো সঠিক বিবরণ দেওয়া কিন্তু অসম্ভব। কারণ তাঁর রচিত মূল গ্রন্থগুলি বহুপূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস

নামাংকিত যে সকল কাব্যগ্রন্থ ও পদাবলী পাওয়া যায় সেগুলি মূল গ্রন্থের সংযোজনে পরবর্তী গুণীরা সংকলন করেছেন বলেই গবেষকদের ধারণা এবং সেই সংকলন ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হয়েছিল। চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ এবং মিত্রতা সম্পর্কিত কাহিনীটি সত্য হলে এঁর আবির্ভাবকাল ১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বলতে হয়।

কল্লিনাথ

(১৫শ শতাব্দী)

কল্লিনাথ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতামহের নাম বল্লভেশ্বর, পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং মাতার নাম নারায়ণী ছিল। এঁরা কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।

কল্লিনাথ সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতের প্রকাণ্ড বিদ্বান এবং বিজয়-নগরের মহারাজা প্রতাপ দেওজীর সভাগায়ক ছিলেন। সংগীত নৈপুণ্যের জন্য মহারাজা একে 'চতুর' উপাধি দান করেছিলেন। মহারাজার অনুরোধেই ইনি শার্ঙ্গদেব-কৃত সংগীতরত্নাকরের সহজবোধ্য টীকা 'কলানিধি' রচনা করেন।

প্রতাপ দেওজীর রাজত্বকাল ছিল ১৪৫৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ, এই গ্রন্থ সেই সময়ে রচিত হয়েছিল। সেই হিসাবে এঁর জন্ম সময় ১৫শ শতকের প্রথম দিকে হয়েছিল বলা যায়। কলানিধি গ্রন্থখানি এঁর অসাধারণ সংগীত মনীষার পরিচায়ক, কিছুটা কঠিন হলেও বিশেষ মূল্যবান। টীকা রচনাকালে ইনি সহজ অংশগুলি বাদ দিয়েছেন। তবে যে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন তাতে উক্ত অধ্যায়গুলি বুঝতে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। পরবর্তী শাস্ত্রীরা এর যথোচিত সদ্ব্যবহার করেছেন।

রাজা মানসিংহ তোমর

(১৫শ শতাব্দী)

গোয়ালিয়রে-তোমর বংশীয় রাজারা প্রায় এক শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছেন। এই বংশের রাজারা অত্যন্ত কলাপ্রেমী তথা কলাবিদ্যার পোষক ছিলেন। এই বংশের রাজা মানসিংহ তোমর ১৪৮৫ সালে রাজ্যভার গ্রহণ

এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (মতান্তরে ১৪৮৬-১৫১৮ খৃঃ)। ইনি অতিগুণী সংগীতজ্ঞ, গোয়ালিয়র ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা এবং ধ্রুপদ গানের পুনরুদ্ধার ও প্রচারক (প্রবর্তক ?) ছিলেন।

মুসলমানদের প্রভাবে তখন ভারতীয় সংগীতের এবং জনসাধারণের রুচির বিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। সেই প্রতিকূল আবহাওয়াতে ইনি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার করে অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এর দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পীরা (বখস্থ, বৈজু, চরজু, ভন্নু, ধোণ্ডু, রামদাস প্রমুখ) সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁদের সাহায্যে তিনি প্রাচীন সংগীতের সংস্কার সাধন তথা রাগ সমূহের সংখ্যা, প্রকারভেদ প্রভৃতির বর্গীকরণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ 'মানকুতুহল' নামক একখানি বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি স্বরচিত কয়েকখানি গান স্বরলিপি সহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য উপযুক্ত নির্দেশ চিহ্নের অভাবে তা অস্পষ্ট, কিন্তু তবু এই প্রচেষ্টায় সংগীত-সংরক্ষণ চিন্তার কথা জানা যায়। এই গ্রন্থের সব খণ্ডগুলি পাওয়া যায় না। ১৬৭৩ সালে ফকীরুল্লা এর ফার্সী অনুবাদ 'সংগীতদর্পণ' নামে করেছেন, যাতে মানসিংহের সংগীত প্রতিভার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়েছে।

গুরু নানক
(১৫শ শতাব্দী)

১৪৬৯ সালে লাহোরের কাছে তালমণ্ডী (মতান্তরে কানাকুচা) নামক গ্রামে কালু বেদীর পুত্র নানকের জন্ম হয়। এঁর মাতার নাম ছিল ত্রিপতা। এঁরা জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়। অল্প বয়সেই ইনি সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন। কিন্তু এঁর চিত্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় এবং অল্প বয়সেই হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করে ভগ্নিপতির কাছে চলে যান। এঁর দিদি এই উদাসীনতা লক্ষ করে চৌনী (মতান্তরে সুলখনা) নামক এক সুশীলার সঙ্গে এঁর বিবাহ দিয়ে দেন।

মাত্র ২৭ বছর বয়সেই ইনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান। নানা দেশ পর্যটন এবং ধর্মশিক্ষার জন্য বিভিন্ন মতের পর্যালোচনা করেন। পরে পাঞ্জাবে

ফিরে এসে ইনি তাঁর নিজস্ব মত প্রচার করেন। এই মতে গুরুকে প্রধান আসন দান এবং প্রচলিত ধর্ম তথা জাতিভেদ প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সকলেই গুরুর শিষ্য, তাই এই ধর্মের নাম হোল শিষ্য বা শিখ ধর্ম। এতে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ভগবৎ চিন্তা, যোগসাধনা, একাগ্রতা, উদারতা, প্রীতি প্রভৃতি হোল এর সারমর্ম। ভজন গানের মাধ্যমে ইনি ধর্ম প্রচার করেছেন। যাঁরা আসতো তাঁরা শিষ্য হয়ে আসতো, তাদের সাজ সজ্জা, কাজকর্ম একরকম হোত। এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চ 'ক' ধারণ, যথা কেশ, কঙ্কণ, কচ্ছ, কঙ্গণ ও কৃপাণ।

নানক থেকে দশম গুরু পর্যন্ত সকলেই ভক্তি সহ ভজন আদির মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন। এঁদের মধ্যে দশম জন হোল গুরু গোবিন্দ সিং, যিনি পূর্ববর্তী সকলের বাণী সমূহ একত্রিত করে 'গুরু গ্রন্থ সাহব' নামক একখানি বিশাল গ্রন্থ সংকলণ করেছেন। দোঁহা তথা গেয় পদেই বাণী সমূহ রচিত। নানকের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে গুরু অঙ্গদ, অর্জুনদেব, গুরু তেগবাহাদুর, শেখ ফরিদী, আনন্দঘন, মলুকদাস, গুলাল সাহেব, গরীবদাস, চরণদাস, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই কিছু কিছু দোঁহা রচন করেছেন।

নানক রচিত দোহাগুলি বিভিন্ন রাগে রচিত যা এঁর বিশেষ সংগীত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এঁর রচিত 'জগৎমে ঝুটি দেখি প্রীত', 'কাহেরে বন খোজন আই' প্রভৃতি ভজন উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে আজও শোনা যায়। এঁর দুটি পুত্র, শ্রীচন্দ ও লক্ষীদাস। শেষ বয়সে ইনি গুরুদাসপুর জেলার কর্তারপুর গ্রামে ছিলেন। ১৫৩৯ সালে (মতান্তরে ১৫৩৩ খৃঃ) সেই খানেই এই মহান সাধকের তিরোধান ঘটে।

ভক্ত সুরদাস
(১৫শ শতাব্দী)

অতীতের পটভূমিতে একাধিক সুরদাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁর অন্ধত্ব, জন্ম ও মৃত্যু -কাল তথা পিতৃ পরিচয় নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইনি ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ ; মথুরার গোবর্ধনের কাছে পরাসৌলী গ্রামে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে এর জন্ম হয়। সেখানে অধিষ্ঠিত 'সুরকুঠি' আজও এই তথ্যের সাক্ষ্য

দেয়। ইনি নাকি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। অবহেলিত ও উপেক্ষিত সুরদাস তাই, মাত্র ৬ বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করেন, এবং চারক্রোশ দূরবর্তী এক পুকুর পাড়ে, একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে, যেখানে অনেক সাধু-মহাত্মাদের আড্ডা ছিল, সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের সেবা করে, সেই থানেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে গৌঘাট নামক স্থানে যান।

আবার কেহ বলেন আগ্রার রেণুকার (রূণকতা) কাছে গৌঘাট নামক স্থানে প্রসিদ্ধ কবি চন্দ বর্দাইয়ের বংশে তথা ব্রহ্মভট্টকুলে এর জন্ম হয়, এবং ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। পিতার নাম রামদাস। এঁর ছয় জন ভাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলে ইনি তাদের খুঁজতে গিয়ে এক কুয়ার মধ্যে পড়ে যান, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেন।

আবার কেহ বলেন দিল্লী-মথুরা রোডে বল্লভপুর থেকে দুই মাইল দূরবর্তী 'সীহী' গ্রামে ৬ই বৈশাখ (শুক্লপক্ষ) সংবৎ ১৫৩৫ (১৪৭৮ খৃঃ) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই এঁর চিত্তে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয় এবং গৃহত্যাগ করেন। কণ্ঠস্বর সুললিত হওয়ায় ইনি সংগীত চর্চা করতেন। ৩১ বছর পর্যন্ত ইনি রেণুকা এবং পরবর্তীকালে স্থায়ীরূপে ইনি গোঘাট নামক স্থানে ছিলেন। ইনি পূর্বোক্ত আচার্যের শিষ্য ছিলেন। বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান আদি সম্ভবত সৎসঙ্গ থেকেই হয়েছিল। বাদশাহ আকবরের সঙ্গে নাকি এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং এঁর সংগীতে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন।

ইনি ১৬ খানি (মতান্তরে ১৯ খানি) গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই পদাবলীকে কৃষ্ণলীলা, অবতার-কথা, বিনয়ের পদ ও দার্শনিক পদ এইরূপে বর্গীকরণ করা যায়। গবেষকদের মতে ইনি অন্ধ ছিলেন না, কারণ অন্ধজনের পক্ষে ওইরূপ রচনা সম্ভবপর নয়।

পরম ভক্ত সুরদাস গায়ক ও কবি প্রতিভায় অসাধারণ ছিলেন। এর রচিত সুর সাগর, সুর সারাবলী, সাহিত্য লহরী গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাগ ও তালের উল্লেখ এবং সুর সংযোজনায় সময়কালের দৃষ্টিতে রাগ প্রয়োগ থেকে এঁর অসাধারণ সংগীত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বিলাবল, তোড়ী, রামকলী, সারং, ধনাশ্রী, গৌরী, কেদার, মারু, বিহাগড়া প্রভৃতি রাগ ব্যবহার এবং রচনায় শান্ত, শৃঙ্গার, করুণ, ভক্তি প্রভৃতি রসের সমন্বয় করেছেন।

ইনি স্বয়ং দীনতা বৈরাগ্য ও বিনয়ের পদই অধিক গাইতেন। এঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনীও প্রচলিত। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে এঁর দেহান্তর ঘটে।

বৈজু বাওরা
(১৫শ শতাব্দী)

বৈজু বাওরার জীবন কথার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। এঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য কিম্বদন্তী থেকেই গৃহীত। বৈজু, বৈজুনাথ, বৈজুবাবর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এঁকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থে বৈজ-নাম যুক্ত অনেক গান আছে। এছাড়া বিক্ষিপ্ত ভাবেও কিছু গান পাওয়া যায়। এগুলির ভাব, ভাষা, ভণিতা, তাল প্রয়োগ প্রভৃতি পর্যালোচনা করে গবেষকগণ অন্তত দুইজন বৈজুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রথমজন সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন। তবে আকবর-রাজত্বকালের বৈজু উত্তর ভারতীয় গুনী এবং গুজরাটের চাপান গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৪৫৫-৬০ সালের কাছাকাছি) তাঁর জন্ম হয়। প্রকৃত নাম ছিল বৈজনাথ মিশ্র। বাল্যকালে তাঁর-উদ্ভট মতি গতির জন্য বাওরা (পাগল,) নামে খ্যাত হন। কেহ বলেন ইনি বাবর নামক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর গুরু কে? তা জানা যায় না, তবে তিনি ব্রজধামের কাছেই কোনো স্থানে থাকতেন। সেদিক থেকে হরিদাস স্বামীর গুরুত্ব অযৌক্তিক নয়। যদিও গুরুর বয়স শিষ্য থেকে কম হয়ে যায়, যা অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব নয়।

অসাধারণ প্রতিভাবান বৈজু অল্পকালের মধ্যেই রাগরাগিণীর শাস্ত্রবর্ণিত গুণ ও প্রভাব সৃজনের ক্ষমতা অর্জন করেন। একদিন বৈজুর গান শুনে কুছবাহ বংশের রাজসিংহ মুগ্ধ হন এবং তাঁর আগ্রহে চন্দেরীতে রাজাশ্রয়ে চলে যান। বৈজু নাকি ধ্রুপদগানের সংস্কার সাধন করে চারটি তুকযুক্ত ধ্রুপদের উদ্ভাবন এবং হোরীর নবীন গীতরীতি ধামার সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া গুজরীতোড়ী, মঙ্গলগুজরী, মৃগরঞ্জনী তোড়ী প্রভৃতি রাগও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ভৈরব তোড়ী মূলতানী-ধনাশ্রী জয়শ্রী ভীমপলাসী পরজ ও মালকোষ রাগে নাকি সিদ্ধ ছিলেন। অবশ্য এই সকল বিষয়ে নানা অভিমত প্রচলিত আছে।

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তাঁর বিবাহ উৎসবে বৈজুকে নিমন্ত্রণ করেন

এবং তাঁর গানে প্রভাবিত হয়ে সভাগায়ক তথা রানী মৃগনয়নীর সংগীত শিক্ষক-রূপে বরণ করেন। রানীর জন্য কয়েকটি রাগ সৃষ্টি, তারপর তানসেন ও গোপালের সঙ্গে সংগীত প্রতিযোগিতা এবং সংগীতের প্রভাবে জঙ্গলের হরিণ আনা পাথর গলানো প্রভৃতি, শেষ জীবনে কাশ্মীর রাজ দরবারে অলৌকিক প্রভাব যুক্ত সংগীত পরিবেশন ইত্যাদি কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে এই সকল কাহিনী থেকে একথা অনুমান করা যায় যে তিনি একজন অতি গুনী গায়ক শিল্পী অবশ্যই ছিলেন।

গোপাললাল
(১৫শ শতাব্দী)

গোপাললাল ও বৈজুর জীবনকথার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। এঁদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির মূলে আছে শুধুমাত্র এঁদের অথবা পরবর্তী-কালের রচিত কতগুলি গান। যার ভিত্তিতে এই সকল কাহিনী গঠিত।

কোনো মতে গোপাল ছিল বৈজুর পালিত পুত্র, যাঁকে যমুনাতীরে সংগীত সাধনাকালে পেয়েছিলেন এবং পরে সংগীত সাধনার সঙ্গী করেছিলেন। চন্দেরীতে বৈজুর সঙ্গে গোপালও গিয়েছিলেন। সেখানে গোপালের বিবাহ হয় প্রভা নামক বৈজুর এক শিষ্যার সঙ্গে। কিছুকাল পরে প্রভা একটি কন্যা সন্তানলাভ করে যার নামকরণ হয় মীরা। এই মীরার মোহে ছন্নছাড়া বৈজু নাকি সংসারী হয়ে পড়েন এবং মীরার সংগীত শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। কিন্তু গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের অনুরোধে বৈজুকে দরবারে থাকতে হোত। আর গোপাল চন্দেরীতে থাকতেন। একদিন গোপাল তন্ময় হয়ে গাইছেন, তখন কয়েকজন কাশ্মীরী ব্যবসায়ী সেই পথে যাচ্ছিলেন; তাঁরা গোপালের সংগীতে মুগ্ধ হন এবং কাশ্মীর রাজের গুণগ্রাহীতার কথা বলে গোপালকে কাশ্মীর যেতে অনুরোধ করেন। গোপাল এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং পত্নী ও কন্যার বিরোধিতা সত্ত্বেও কাশ্মীর চলে যান। সেখানে সংগীতকলা প্রদর্শন করে প্রধান সভাগায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

গোপালের চলে যাবার সংবাদে এবং মীরা মায়ের বিচ্ছেদে বৈজু অত্যন্ত মর্মাহত হন, ফলে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দেয়। তাই সবকিছু ছেড়ে একদিন

পথে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে বৈজু এসে কাশ্মীরে উপস্থিত হন। এদিকে গোপালকে তাঁর গুরুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে নিজেকে ভগবান প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী বলে প্রচার করেছিলেন। তাই বৈজুর ছিন্ন মলিন বেশ এবং উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে সবাই পাগল বলে হটিয়ে দেয়। ক্লান্ত বৈজু তখন একটি বাগানের মধ্যে বসে গান গাইতে আরম্ভ করেন। সেই সুমধুর সংগীতের প্রভাবে অল্পসময়ের মধ্যেই সেখানে অনেক জনসমাগম হয়। ক্রমে এই বিচিত্র ও ক্ষমাতাশালী গায়কের কথা রাজার কানে যায় এবং তিনি এঁর গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে গোপালের কৃতঘ্নতার কথা বৈজু জানতে পেরেছিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে, বৈজু গোপালকে উদ্দেশ করে 'কাহেকো গর্ব কিহ্নো জো কহায়ে রে' এই স্বরচিত পদটি ভীমপলাসী রাগে গাইতে আরম্ভ করলেন। সেই মর্মস্পর্শী সুরের প্রভাবে উপস্থিত সকলেই অশ্রুধারায় হতবাক হয়ে রইলেন। গোপালও তাঁর কৃতঘ্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে লজ্জা ও অন্তর্জ্বালায় অধীর হয়ে পড়লেন। বৈজু যখন তাঁর অন্তিম পদ 'কহত বৈজুবাবরে সুনিয়ো গোপাললাল গুরুকো বিসার কৈঁ কহা ফল পায়ো রে' গেয়ে গান শেষ করলেন, তখন গোপাল আর স্থির থাকতে পারলেন না, গুরুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বৈজু তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। কিন্তু আত্মগ্লানিতে গোপাল হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন। হিন্দু ধর্মানুসারে সিন্ধু নদীর তীরে গোপালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হোল। এই সময়ে মীরা ও প্রভা চন্দেরীতে গিয়েছিল। ফিরে এসে এই দুঃসংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। তারা গোপালের অস্থিপূজা করার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু অস্থি তো সিন্ধুতে অর্পণ করা হয়েছে। তবু বৈজু বললেন ঠিক আছে তাই হবে। আমি মীরা মাকে এমন একটি রাগ শেখাব যে তার প্রভাবে অস্থি ভেসে উঠবে। এই সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে শ্রীনগরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্দিষ্ট দিনে অসংখ্য লোক এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার জন্য সিন্ধুনদীর তীরে সমবেত হয়। যথা সময়ে মীরা মল্লার রাগ গাইতে আরম্ভ করে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই অস্থিগুলি ভেসে এসে তীরে একত্রিত হয়। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে সকলেই চমৎকৃত হয়। সেই থেকেই নাকি এই রাগকে মীরাকি মল্লার বলা হয়।

এরপর বৈজুর মানসিক অবস্থার আরো অবনতি হয় এবং একদিন হঠাৎ তিনি কাশ্মীরের জঙ্গলে অন্তর্ধান করেন।

গোপাল সম্পর্কে বিপরীত অভিমতও প্রচলিত। যাতে এঁকে বৈজুর গুরু বলা হয়েছে। কেহ বলেন এঁরা দুজন সমসাময়িক তথা একই গুরুর শিষ্য ছিলেন এবং বৈজু ক্রিয়াসিদ্ধ ও গোপাল শাস্ত্রগত অংশে সুপণ্ডিত ছিলেন।

স্বামী হরিদাস
(১৫শ শতাব্দী)

অতীতের পটভূমিতে স্বামী, গায়ক, ডাগুর, যবন, কবীরপন্থী প্রভৃতি অন্তত সাতজন হরিদাস নামধারী সংগীত সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতির সংরক্ষক ও প্রচারক হিসাবে স্বীকৃত, সংগীতসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং বাদ্য ও নৃত্যে পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন স্বামী হরিদাস যে কোনজন, তা নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই সকল গুণসম্পন্ন স্বামী হরিদাস একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে, হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থপর মানসিক প্রতিক্রিয়ায়ই এই ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক এঁর সম্পর্কে যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় তা মোটামুটি এইরূপ—

সহচরিশরণ-কৃত 'গুরুপুণালিকা'তে আছে—

ভাদোঁ শুক্লাষ্টমী মনহর পূনি বুধবার পুণীতা।
সম্বত পন্দ্রহসৌ সৈঁতিস কা, তা বিচ উচিত সুমীতা॥

অর্থাৎ ভাদ্র শুক্লাষ্টমী, বুধবার, সংবৎ ১৫৩৭ (১৪৮০ খৃষ্টাব্দ) এঁর জন্ম। এবিষয়ে মতভেদও আছে, তবে এই অভিমতই অধিক সমর্থিত।

ইনি প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, রাজা মানের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ মথুরা, বৃন্দাবন অঞ্চলে যখন প্রাচীন ধ্রুব পদ্ধতি প্রচলিত তখন এঁর আবির্ভাব হয়। সেদিক থেকে উপরোক্ত জন্ম সময়কে যুক্তিযুক্ত বলা যায়।

ইনি ব্রজভাষায় অনেক ধ্রুপদ রচনা তথা হোলী গীতরীতির সংস্কার সাধন করেছেন। বাদ্য ও নৃত্যে ইনি নানা নবীনতা এনেছেন। ব্রজধামে প্রচলিত রাসলীলার প্রবর্তন এঁরই ভক্তিপূর্ণ সংগীত চিন্তার অবদান। সংগীত রচনায়

ইনি মাত্র কুড়ি বাইশটি রাগ ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধিবিধানাদি যাবনিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যই সম্ভবত ইনি নবীন ও সংকীর্ণ রাগগুলি বর্জন করেছেন।

এঁর পিতার নাম ছিল আশুধীর এবং মাতার নাম গঙ্গা। এঁরা ছিলেন মূলতানের উচ্চগ্রাম নিবাসী, পরে আলীগড়ের খৈরবালী রাস্তায় খেরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে একটি গণ্ডগ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে সেই গ্রামের নাম হয় হরিদাসপুর। তবে আশুধীর স্বামী নাকি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল হরিদাস, যাকে স্বামী হরিদাস প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ স্বামী হরিদাস নাকি সনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মতান্তরে, এঁর পিতার নাম গঙ্গাধর ও মাতার নাম চিত্রা। জন্মস্থান, মথুরার রামপুর গ্রাম। এঁর পিতামাতা সাধু-মহাত্মাদের খুব ভক্ত ছিলেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী হরিদাস তাই বাল্যকাল থেকেই ভগবৎ প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শোনা যায়, মাত্র ২৫ বছর বয়সে এঁর স্ত্রী হরিমতীর মৃত্যু হয়। তখন থেকে এঁর মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় এবং ইনি বৃন্দাবনে নিধিবন-নিকুঞ্জের এক কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন আরম্ভ করেন। ইনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। ১৫৩০-৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে এঁর ইচ্ছাদ্বৈতবাদী হরিদাসী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তখন এঁর নানা বিভূতি প্রকাশ পায়। আকাশে বাতাসে সর্বত্রই কৃষ্ণলীলা ও বংশীধ্বনি এঁকে বিমোহিত করতো। এই প্রসঙ্গে কুয়ায় পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আলীগড়ের নবাবের মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রভৃতি বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

স্বামীজীর সংগীতে বৃন্দাবনের জনসাধারণের হৃদয় তথা আকাশ বাতাস ও যমুনার জল আলোড়িত হোত। দূর-দূরান্তর থেকে এঁর গান শোনার জন্য জনসমাগম হোত। অনেক রাজা-মহারাজারাও আসতেন, কিন্তু স্বামীজীর অন্তরের ইচ্ছা না হলে কখনোই গাইতেন না। এই প্রসঙ্গেও বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

এঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে বৈজু, গোপাললাল, মদনরায়, রামদাস, দিবাকর পণ্ডিত, তানসেন, রাজা সৌরসেন, মহারাজা সমোখন সিং প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন দিল্লী, সোমনাথ ও সৌরসেন পাঞ্জাব, তানসেন

রীবাঁ প্রভৃতি স্থানে চলে যান। অন্য সকলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

স্বামীজীর সম্প্রদায়ের সাধকেরা এখনো বাঁকেবিহারীজীর মন্দির, নিধিবন, শ্রীগোপালজীর মন্দির, শ্রীরসিকবিহারীজী'র মন্দির, টটটীস্থান প্রভৃতি নানাস্থানে বিদ্যমান আছেন। প্রতি বছর ভাদ্র-শুক্লাষ্টমীতে সেখানে বিরাট মেলা হয়। তখন স্বামীজী-ব্যবহৃত মাটির পাত্র প্রভৃতি জনসাধারণের সামনে বের করা হয়। ওই উৎসবে স্বামীজী ও তাঁর সম্প্রদায়ের পদাবলী গাওয়া হয়। বিরক্ত সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মারা পরম্পরাগত রীতিতে ধ্রুপদ গেয়ে স্বামীজীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের দুই দিনের জন্য এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

১৫৭৫ সালে স্বামীজীর তিরোধান ঘটে।

পুরন্দর দাস
(১৫শ শতাব্দী)

১৪৮৪ সালে (মতান্তরে ১৪৮০ খৃঃ) বিলারি জেলার হুম্পী'র নিকটবর্তী পুরন্দর গড় নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পুরন্দর দাসের জন্ম হয়। পিতা বড়দাপ্পা নায়ক অত্যন্ত ধনী জহুরী ছিলেন। যিনি ধনগৌরবের জন্য 'নায়ক' উপাধি পেয়েছিলেন। মাতার নাম ছিল কমলাম্বা। তিরুপদি নামক স্থানের ব্যংকট চলপদি নামক জাগ্রত দেবতার অনেক পূজা মানতের পরে এঁদের একমাত্র সন্তান পুরন্দরের জন্ম হওয়ায় আদর-বিলাসে রাজকীয়ভাবে প্রতি-পালিত হয়। এঁর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীনিবাস এবং আদরের নাম ছিল সিনাপ্পা।

অল্পবয়সেই পুরন্দর তেলেগু ও সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতবিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই সরস্বতী বাঈয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে পিতার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিতে হয়। সেখানেও ইনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। এঁর বন্ধুরা, অসাধারণ চতুরতার জন্য এঁকে নভকোটি নারায়ণ বলে ডাকতেন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ পুত্রের উপনয়নের জন্য এঁর কাছে কিছু সাহায্য ভিক্ষা

করেন। পুরন্দর তাঁকে 'কাল দেখা যাবে' বলে দেন। (বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় ধর্মমতানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্যাদায়, উপনয়ন ইত্যাদি কারণে প্রার্থীকে সাধ্যমত সাহায্য করার প্রথাই প্রচলিত)। কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ পুরন্দরের কাছে একই উত্তর লাভ করেন। এইরূপে কয়েকদিন বিফল হওয়ায়, হতাশ হয়ে ব্রাহ্মণ এঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে একই আবেদন করেন। সরস্বতী বাঈ তৎক্ষণাৎ তাঁর হীরক খচিত নোলকটি তাঁকে দিয়ে বলেন যে, এটা বিক্রি করে কাজ চালিয়ে নেবেন। ব্রাহ্মণ তখন সেই অতি মূল্যবান নোলকটি নিয়ে পুরন্দরের কাছেই বিক্রি করার জন্য হাজির হন। পুরন্দর নোলকটি দেখেই তাঁর স্ত্রীর বলে বুঝতে পারেন; কারণ ওইরূপ দুষ্প্রাপ্য হীরা ওই অঞ্চলে আর ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীর মারফৎ বাড়িতে স্ত্রীর কাছে নোলকটি চেয়ে পাঠান। সরস্বতীর কাছে নোলকটি চাওয়া হলে হঠাৎ তাঁর নিজেকে অত্যন্ত অপরাধিনী মনে হয় এবং তিনি আত্মহত্যার সংকল্প করেন। যখন পাত্রে বিষপান করতে যাবেন, তখন সেই পাত্রের মধ্যে তাঁর নোলকটি দেখতে পান। এই অলৌকিক ঘটনায় তিনি তার সংকল্প ত্যাগ করে নোলকটি পাঠিয়ে দেন। পুরন্দর দুটি হুবহু একই নোলক দেখে আশ্চর্য হন এবং বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে বিষয়ের সত্যতা জানতে চান। সরস্বতী তখন আনুপূর্বিক ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। তখন সেই ব্রাহ্মণকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ঘটনায় পুরন্দরের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হয় এবং তাঁর দিব্যদৃষ্টি উন্মোচিত হয়। তিনি যাবতীয় ধন সম্পত্তি দান করে ঈশ্বরোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত প্রথম ভজনটির অর্থ হোল, 'এই দীর্ঘ ৩০ বছর আমি হরিপাদপদ্মে বিশ্বাস না করে জাগতিক মোহে বৃথাই সময় নষ্ট করেছি।'

কথিত আছে ইনি এবং সরস্বতী একাধিকবার ঈশ্বর দর্শনলাভ করেছেন। পুরন্দর দাসই সর্বপ্রথম সংগীতের নিয়মাবদ্ধ সাধনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করাতে এঁকে আদি গুরু বলা হয়। ইনি অসংখ্য ভজন, কীর্তনম্ প্রভৃতি রচনা করেছেন। এঁর চারপুত্র ও এক কন্যা। ১৫৬৩ সালের ২রা জানুয়ারি এই মহান সাধকের দেহান্তর ঘটে।

শ্রীচৈতন্যদেব
(১৫শ শতাব্দী)

পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ সালের ১৮ই মার্চ ফালগুনী পূর্ণিমায় বাংলার নবদ্বীপ ধামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। শৈশবে ইনি নিমাই, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে চৈতন্যদেব নামকরণ হয় এবং এই নামেই ইনি জগদ্বিখ্যাত।

অসাধারণ প্রতিভাবান চৈতন্যদেব অল্পবয়সেই ব্যাকরণ, পুরাণ, কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, অলংকার, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তখনকার দিনে দেশের ধর্মজীবন ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সেই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁর আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চৈতন্য যুগেই কীর্তনগান সর্বশ্রীমণ্ডিত হয়ে সংগীত সভায় একটি বিশিষ্ট মান গ্রহণ করে।

গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দানার্থে গিয়ে এঁর সঙ্গে ঈশ্বর পুরী নামক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ হয়, যাঁর কাছে ইনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

পূর্ববঙ্গে প্রেমধর্ম প্রচারকালে এঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর সর্পঘাতে মৃত্যু হয়। এই সংবাদে ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এঁর চিত্তে বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয়। মাতার ইচ্ছানুসারে ইনি সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন, কিন্তু এঁর বৈরাগ্যভাবের তীব্রতা ক্রমে বাড়তেই থাকে এবং একদিন গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়াতে গিয়ে ইনি দণ্ডী কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।

অতঃপর ভারতের নানাস্থানে ইনি সাধুসঙ্গ এবং জ্ঞানার্জন ও সাধনা করেন। ক্রমে এঁর নানা অলৌকিক বিভূতির বিকাশ হয়। সেই সকল অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে এঁর জীবিতকালেই প্রচুর নাটক, কাব্য প্রভৃতি রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'মুরারীগুপ্তর কড়চা' বা 'শ্রীচৈতন্যের কথামৃত', 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়', 'গৌরগণেশদীপিকা', 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এঁর অলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিয়েও বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

১৫৩৩ সালে নীলাচলে থাকাকালীন একদিন সমুদ্রের নীল জলরাশি দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে, সাগরগর্ভেই এঁর তিরোভাব ঘটে।

মীরাবাঈ
(১৬শ (?) শতাব্দী)

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে মীরাবাঈ চিরস্মরণীয়। মেবারের রাণা বংশের রাঠোর দুদাজী (মতান্তরে যুধাজী বা দাদুজী) মেড়তা নামক স্থানের সামন্ত বা জায়গীরদার ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রতন সিং উত্তরাধিকার সূত্রে বারোটি গ্রামের জায়গীরদার ছিলেন। যোধপুরের প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্বে মেড়তার চৌখরি (কুড়কী ?) গ্রামে রতন সিংহের কন্যা মীরার জন্ম হয়। জন্মস্থানের মতো এঁর জন্মকাল নিয়েও মতভেদ আছে। কেহ ১৪৯৮ খৃঃ, কেহ ১৫০২ খৃঃ আবার কেহ ১৫০৪ আর কেহ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে মীরার জন্ম বলে থাকেন। এর মধ্যে সঠিক কোনটি, বলা না গেলেও পার্থক্যটা এতো সামান্য যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তেমনি এঁর তিরোধানও রহস্যাবৃত। কেহ বলেন যে, ইনি দ্বারকানাথ মন্দিরে আবার কেহ বলেন স্বীয় উপাস্য গিরিধারীর বিগ্রহে লীন হয়েছিলেন। এই অন্তর্ধানের সময় কেহ ১৫৬৯ খৃঃ, কেহ ১৫৭৩ খৃঃ আবার কেহ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ বলে থাকেন।

মীরার বিবাহ এবং বিবাহোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বেশি মতান্তর দেখা যায়। তবে তার মধ্যে সঙ্গত এবং অধিক সমর্থিত অভিমত হোল এই যে, এঁর বিবাহ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজের সঙ্গে হয়েছিল। মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই ইনি স্বামীহারা হন। তখন থেকে এঁর চিত্তে বৈরাগ্যভাব ও কৃষ্ণপ্রীতির তীব্রতা প্রকাশ পায়। দেবর বিক্রম সিং সেই কারণে এঁর প্রতি নাকি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেন। এমন কি এঁকে হত্যা করার জন্য চরণামৃত বলে বিষ এবং ফুলের মধ্যে বিষধর সর্প পাঠানো হয়। কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁর সহায়, সামান্য মানুষ তাঁর কী ক্ষতি করতে পারে।

মীরা অতি গুণী গায়িকা ছিলেন। ইনি অসংখ্য ভজন রচনা করেছেন। এঁর সংগীত নৈপুণ্য এবং ভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায় বাদশাহ আকবর ও তানসেনও ছদ্মবেশে এঁর গান শুনতে

এসেছিলেন। এমন একজন পরম ভক্তের বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি জানতে না পারায় আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনে থেকে যায় অতৃপ্তির বেদনা।

তানসেন

(১৬শ শতাব্দী)

সংগীতজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সংগীত সম্রাট তানসেনের নাম আজ কে না জানে? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁর সম্বন্ধেও আমরা সঠিকভাবে কিছু জানি না। এঁর সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত। এঁর জন্ম সময় সম্পর্কে নানা গ্রন্থে ১৪৯৩, ১৫০০, ১৫০৬, ১৫১৬, ১৫২০, ১৫৩২ প্রভৃতি সাল বলা হয়েছে। অবশ্য জন্মস্থান সম্পর্কে এমন মতভেদ নেই। এবিষয়ে অধিক সমর্থিত অভিমত হোল— গোয়ালিয়র থেকে কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী 'বেহট' নামক একটি গণ্ডগ্রামে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মকরন্দ পাণ্ডে বা মুকুন্দরাম মিশ্র এবং তানসেনের প্রকৃত নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে বা তন্না মিশ্র।

শোনা যায় মুকুন্দরাম ধনবান এবং লোকপ্রিয় গায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী মৃতবৎসা হওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। লোকপরম্পরায় একদিন ইনি জানতে পারেন যে, গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গৌস নামে এক সিদ্ধ ফকির আছে, যাঁর আশীর্বাদে কার্যসিদ্ধি হতে পারে। তখন একদিন গোয়ালিয়রে গিয়ে সেই ফকিরের সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। সেই ফকির তাঁকে একটি মাতুলি দেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বিধিমতো ধারণ করার উপদেশ দেন। যথা সময়ে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তন্নাকে এই ফকিরের কথা বলেন এবং তাঁর সেবা ও আদেশ মান্য করার উপদেশ দেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান তন্না বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন জীবজন্তুর ধ্বনি হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন। একদিন স্বামী হরিদাস তাঁর শিষ্য-মণ্ডলীর সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছেন। পথে বাঘের গর্জন অনুকরণ করে বালক তাঁদের ভয়ার্ত করে তোলেন। স্বামীজীর কিন্তু সন্দেহ হয় এবং অনুসন্ধানে তন্না আবিষ্কৃত হয়। বালকের অসাধারণ ক্ষমতা এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত কান্তি লক্ষ্য করে স্বামীজী এঁকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। এইরূপে এঁর সংগীত-জীবন শুরু হয়। অল্পকালের মধ্যেই এঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং ক্রমে চারিদিকে এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় একদিন বৈজুর মস্তিক বিকৃতির খবর আসে, এই দুঃসংবাদে

স্বামীজী অত্যন্ত মর্মাহত হন। স্বামীজীর এইরূপ দুঃখের কারণ স্বরূপ তখন তিনি বৈজুর অসাধারণ প্রতিভা, চরিত্রবল, ত্যাগ, মহানুভবতা প্রভৃতির পরিচয় পান। এই গুরুভাইয়ের জন্য তাঁর অন্তরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঞ্চার হয় এবং মনে মনে তাঁর দর্শনলাভের সংকল্প করেন।

ইতিমধ্যে পিতা ও ফকির সাহেবের মৃত্যু হয়। ইনি তখন মুক্তপুরুষ। সংগীত শিক্ষা সমাপ্ত করে, স্বামীজীর অনুমতিক্রমে তানসেন গোয়ালিয়রে বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানে মানসিংহের বিধবা পত্নী মৃগনয়নী তন্নার সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সংগীত বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেখানে সুকণ্ঠী হুসেনীর সঙ্গে, মহারানীর তত্ত্বাবধানে এঁর বিবাহ হয়। হুসেনী ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হুসেনীর প্রকৃত নাম ছিল প্রেমকুমারী, ধর্মান্তরের পরে এঁকে হুসেনী ব্রাহ্মণী বলা হোত। তানসেনও বিবাহের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামকরণ হয় মহম্মদ আতাআলী খাঁ।

বৈজুর চিন্তায় তানসেনের মনে শান্তি ছিল না। তাঁর খোঁজে একদিন ইনি রীঁবার রাজধানী বাঁদোগড়ে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা রামচন্দ্র বঘেলা এঁর সংগীতে মুগ্ধ হয়ে এঁকে সভাগায়কের পদে বরণ করেন। বাদশাহ আকবর একদিন সেখানে এঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। এক গানের আসরে বাদশাহ এঁকে 'তানসেন' উপাধিতে সম্মানিত করেন এবং সেই থেকেই ইনি তানসেন নামে পরিচিত।

তানসেন শুধু শিল্পীই নয়, উচ্চশ্রেণীর স্রষ্টা ও কবি ছিলেন। চারটি তুকযুক্ত বহু ধ্রুপদ গান ইনি রচনা করেছেন, যা বহু গায়কের কণ্ঠে আজও শোনা যায়। এগুলির ভণিতায় 'মিয়া' বা 'দরবারী' শব্দটি তাঁর পরিচয় বহন করছে। মিঁয়া কি তোড়ী, মিঁয়াকি সারং, মিঁয়াকি মল্লার প্রভৃতি বহু রাগ ইনি সৃষ্টি করেছেন। সংগীতের প্রভাবে ইঁনি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, আগুন জ্বালানো, বর্ষা নামানো, জীবজন্তু বশ করা প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। বৈজু নাকি এক সংগীত প্রতিযোগিতায় এঁকে পরাজিত করেন এবং আনন্দাশ্রুতে এই দুই মহান শিল্পী তথা গুরু ভাইয়ের মিলন হয়। এই প্রসঙ্গে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত।

তানসেনের চার পুত্র সুরতসেন, তরঙ্গসেন, শরৎসেন ও বিলাস খাঁ এবং

এক কন্যা সরস্বতী। (অনেকে শরৎসেনকে তাঁর পুত্র বলে স্বীকার করেন না)। কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে প্রসিদ্ধ বীণকার সমোখন সিংহের পুত্র বীণকার মিশ্র সিংহের (নিবাদ খাঁ) বিবাহ হয়। পুত্র কন্যারা সকলেই সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

তানসেনের মৃত্যুকাল নিয়েও মতভেদ আছে। কেহ ১৫৮৫ খৃঃ, কেহ ১৫৮৯ খৃঃ আবার কেহ ১৫৯৫ খৃঃ এঁর মৃত্যুকাল বলেছেন। তবে এর মধ্যে অধিক সমর্থিত মত হোল ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে ফকির সাহেবের সমাধির কাছে এঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর ভারতের নানা স্থান থেকে সংগীত-গুণীরা সেখানে এসে গান বাজনা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শোনা যায় এঁর সমাধির কাছে একটি তেঁতুল গাছ আছে যার পাতা খেলে নাকি কণ্ঠস্বর সুমধুর হয়।

রামামাত্য

(১৬শ শতাব্দী)

কর্ণাটক সংগীতের প্রসিদ্ধ 'স্বরমেলকলানিধি' গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত রামামাত্য বিজয়নগরের রাজা সদাশিব রাওয়ের (১৫৫২-৬৭ খৃষ্টাব্দ) প্রধানমন্ত্রী তিম্মিমাত্যের (তিম্বরাজের) পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে ইনিও পিতার পদে নিযুক্ত হন। রাজা সদাশিব অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী হওয়ায় ইনি বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং সংগীত চর্চার প্রচুর সুযোগ পান। কালক্রমে ইনি সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।

১৬শ শতকের প্রথম দিকে এঁর জন্ম হয় এবং আনুমানিক ১৫৫০-৫১ খৃঃ এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে ২০টি মেল তথা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ৬৯টি রাগের পরিচয় এবং সাংগীতিক উপাদানাদির বর্ণনা আছে। উত্তর ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকলেও সংগীত জিজ্ঞাসুদের কাছে এটি মূল্যবান। বর্তমানে এর হিন্দী-অনুবাদ সংগীত কার্যালয় হাথরস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল
(১৬শ শতাব্দী)

১৬শ শতকের প্রথমার্ধে মাদ্রাজের রামানাউ জেলায় সাওন্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে পুণ্ডরীক বিঠ্ঠলের জন্ম হয়। ইনি সংগীত এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সংগীত বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রথমে ইনি খান্দেশ রাজ্যের রাজধানী বুরহান নগরে যান। সেখানে তখন ফারুখী বংশীয় রাজা রাজত্ব করতেন, যিনি অত্যন্ত সংগীত ও ললিতকলাপ্রেমী ছিলেন। আনুমানিক ১৫৬০-৭০ খৃষ্টাব্দে, সহজেই ইনি রাজাশ্রয়লাভ করেন। সেখানে থাকাকালীন ইনি 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তাই ফারুখী বংশের রাজা তাজ খাঁ, আহমদখাঁ প্রমুখের স্তুতি করা হয়েছে।

কিছুকাল পরে ইনি মানসিংহের ভ্রাতা মাধবসিংহের সভায় যোগদান করেন এবং সেইখানে এঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাগমঞ্জরী' রচনা করেন। সেই সময়ে ইনি আকবরের গুণগ্রাহীতার খবরে আকৃষ্ট হন এবং মানসিংহের সহায়তায় আকবরের সভায় আশ্রয়লাভ করেন। সেখানে ইনি 'রাগমালা' ও 'নর্তননির্ণয়' নামক আরো দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয়েছে বলে গবেষকগণ স্থির করেছেন।

সদ্রাগচন্দ্রোদয় গ্রন্থে ১৯টি মেল এবং ৬৫টি রাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাগমঞ্জরীতে ২০টি মেল এবং ৬৫টি রাগ। এই গ্রন্থে আমীর খসরু প্রচারিত রাগের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় রাগগুলির তুলনামূলক আলোচনা আছে। রাগমালা গ্রন্থে আছে প্রাচীন রাগ-রাগিনী-পুত্র-পদ্ধতির আলোচনা। যেমন ৬টি রাগ তাদের ৬টি করে রাগিণী এবং ৫টি করে পুত্ররাগ ইত্যাদি।

তুলসীদাস
(১৫শ শতাব্দী)

সুকবি, সুগায়ক তথা পরমভক্ত তুলসীদাসের জন্ম সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও ১৫৩২ খৃষ্টাব্দই অধিক সমর্থিত। আর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশের বাঁদাউ

জেলার রাজপুর গ্রাম (মতান্তরে সোঁরো নামক স্থান)। এঁর পিতার নাম আত্মারাম দুবে এবং মাতার নাম হুলসী।

শোনা যায় রত্নাবলী নামক এক সুশীলার সঙ্গে অল্পবয়সেই এঁর বিবাহ হয় যাকে ইনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, কখনো বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন না। এইজন্য এঁর স্ত্রী এঁকে একদিন তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সেই আঘাতে এঁর অন্তরে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়, এবং ভক্তির প্লাবনে তা আত্মপ্রকাশ করে।

ইনি ছিলেন একনিষ্ঠ রামভক্ত। এঁর রচিত অমরকাব্য 'রামচরিত মানস' গ্রন্থের স্থান ও সম্মান য়ুরোপের বাইবেল ও সেক্‌সপিয়রের মতো। ১৫৭৪ সালে অযোধ্যায় এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করেন এবং পরবর্তীকালে কাশীতে সমাপ্ত করেন। এছাড়া ইনি বৈরাগ্য সন্দীপনী, রামললানহছু, বরবৈরামায়ণ, পার্বতীমঙ্গল, জানকীমঙ্গল, রামাজ্ঞাপ্রশ্ন, দোঁহাবলী, কবিতাবলী, গীতাবলী, শ্রীকৃষ্ণগীতাবলী, বিনয়পত্রিকা প্রভৃতি রচনা করেছেন।

এঁর দোঁহাগুলি ছিল গেয় পদে রচিত। স্বর রচনায় ইনি মারু, ভৈরব, সারং, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ ব্যবহার করেছেন, যা এঁর গভীর রাগজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দেয়। এঁর কাব্যের সুর ও ছন্দ তথা ভাব যেন মধুরতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে। ১৬২৩/১৬৩২ সালে কাশীতে এঁর তিরোধান ঘটে।

জ্ঞানদাস

(১৬শ শতাব্দী)

প্রাচীন বর্ধমান জেলার কাঙড়াগ্রামে (কাঁদড়া, কান্দুড়া) জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব সাধক কবি। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই ইনি বহু পদ রচনা করেছেন। তবে এঁর বাংলা পদগুলিই খুব সুন্দর। চৈতন্য-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের ইনি ছিলেন অন্যতম। এঁর পদগুলির ছন্দ, ভাব ও ভাষামাধুর্য এবং স্বাভাবিক সাবলীল আন্তরিকতার জন্য এঁকে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চণ্ডীদাসের সঙ্গে এঁর পদগুলির ভাব, ভাষা প্রভৃতির সাদৃশ্য এত বেশি যে অনেক পদ উভয় কবির নামেই প্রচলিত। জ্ঞানদাসের জন্ম ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

গোবিন্দ দাস
(১৬শ শতাব্দী)

চৈতন্য-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিযুগল হোল জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। ১৬শ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক স্থানে কবি গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব কবি ছিলেন। এঁর অধিকাংশ পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। ব্রজবুলি ভাষা বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার অনুক্রমে গঠিত। ভাষার মাধুর্যে এবং রচনাচাতুর্যে ইনি বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর প্রভৃতি সব দিক দিয়েই গোবিন্দদাসের পদগুলি অনুপম। রাধার বর্ষাভিসারের সেই বিখ্যাত পদ এঁরই রচনা— "কণ্টক গাড়ি, কমলসমপদতল, মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

সাগরী বারি ঢারি করু পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি—
দূতরপন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে জামিনী জাগি॥

গোবিন্দদাসের জন্ম ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না।

দাদু দয়াল
(১৬শ শতাব্দী)

১৫৪৪ সালে আহমদাবাদে সুলেমানের পুত্র দাদু'র জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম ছিল দাউদ। মতান্তরে কাশীর নিকটবর্তী জৌনপুর নামক স্থানে এক মুচির ঘরে এঁর জন্ম হয়। এঁর পূর্ব নাম ছিল মহাবলী। অল্প বয়সেই এঁর বৈরাগ্য জন্মে। মানুষের মাঝে যে ভেদাভেদ তাকে জয় করার মানসে রাম ও রহিম ভজনায় মগ্ন হন। সর্বধর্মসমন্বয় ছিল দাদুর উদ্দেশ্য। ১৫৭২ সালে ইনি ব্রহ্মসম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁর মতে—

ন তঁহা হিন্দু দেহরা, ন তঁহা তুরুক মসীতি।
দাদু আপৈ আপ হৈ নঁহী তঁহা রহে রীত॥

অর্থাৎ মন্দিরই বলুন আর মসজিদই বলুন ঈশ্বর কিছুই ভাবেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে আপনিই প্রকাশিত হন। সেখানে কোনোরূপ ভেদাভেদ নেই।

দাদু তাঁর ভজন গানের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই প্রচার করেছেন। এঁর গুরুর নাম ছিল 'বুরহানুদ্দীন'। গুরুর প্রতি এঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইনি বলেছেন যে, যখন ভগবানকে পাওয়ার পথ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়গত পথ ত্যাগ করলাম তখন গুরু ছাড়া সকলেই আমার উপর রুষ্ট হন। কিন্তু "সদগুরুকে পরসাদ থৈ মেরে হরখ ন সোক" সদগুরুর কৃপা থাকায় আমার কোনো দুঃখ ছিল না।

কবীর, নানক আদি সাধক ভক্তের মতো ইনিও সংসারে থেকেই সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতার উর্ধ্বে ওঠার পথ অনুসন্ধান করেছেন। ইনি বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রীর নাম ছিল হব্বা। গরীবদাস ও মসকীন নামে দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা-সন্তান ছিল। পরবর্তীকালে গরীবদাস ছিলেন দাদুপন্থের প্রকৃত উত্তরাধি-কারী।

শোনা যায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীতে বাদশাহ্ আকবর এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দাদুর বাণী সংগ্রহ করেছিলেন এঁর শিষ্য সন্তদাস ও জগন্নাথ দাস এবং নাম দিয়েছিলেন 'হরডেবাণী'। এই ভজনগুলি সব রাগনাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ইনি যে রাগসংগীতে বেশ জ্ঞানী ছিলেন, বোঝা যায়। এদেশের বাউলেরা দাদুকে গুরু বলে স্বীকার করেন। ১৬০৩ সালে দরানা নামক স্থানে এই মহান সাধকের তিরোধান ঘটে।

বিলাস খাঁ

(১৬শ শতাব্দী)

১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ ১৫৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে) জগৎবিখ্যাত তানসেনের চতুর্থ পুত্র বিলাস খাঁর জন্ম হয়। সংগীতে এঁদের জন্মগত অধিকার ছিল, তবে চার ভাইয়ের মধ্যে সংগীতবিদ্যায় ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন এবং সাধকোচিত জীবন যাপন করতেন। এর সংগীত সাধনার স্থান ছিল গভীর জঙ্গলে। এর দুই পুত্র উদয় সেন ও দয়াল সেন এবং এক কন্যা। বর্তমান সংগীতজগতের প্রায় সকল ওস্তাদকেই এই বংশোদ্ভূত বলা যায়।

বৃদ্ধবয়সে তানসেন পুত্রদের নিয়ে বাদশাহের কাছে গিয়ে একদিন বলেন যে, জাহাঁপনা আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি এবার আমাকে ছুটি দিন এবং পুত্রদের

আশীর্বাদ করুন। বাদশাহ এঁদের গান শোনেন এবং সকলকে পাঁচশত মুদ্রা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। বিলাস খাঁর গান শুনে বাদশাহ অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং বলেন যে স্বামী হরিদাস ও তানসেনের পরে এঁর মতো আর কারুর গান আমার ভালো লাগে নি।

শোনা যায় বৃদ্ধবয়সে তানসেন পুত্রদের বলেন যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার শবের চারপাশে বসে তোমরা গান গাইবে। যার গানে আমার হাত নড়ে উঠবে সেই হবে আমার সংগীতের প্রকৃত ধারক। তাঁর মৃত্যুর পরে যথারীতি পুত্রেরা গান আরম্ভ করেন। সকলের শেষে বিলাস খাঁ যখন টোড়ী রাগে "কৌন ভ্রম ভুলায়া মন অজ্ঞানী" এই ধ্রুপদ গানখানি গাইতে থাকেন তখন মৃত তানসেনের হাত সোজা হয়ে ওঠে। এই অভূতপূর্ব ঘটনা বহুলোকের সঙ্গে একজন ইংরাজ রাজদূতও প্রত্যক্ষ করেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। সেই থেকে এই রাগটি বিলাসখানী তোড়ী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

সোমনাথ

(১৬শ শতাব্দী)

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী নিবাসী মেংগনাথের পৌত্র ও মুদ্রলের পুত্র পণ্ডিত সোমনাথ ১৬শ শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বীণবাদনতত্ত্বজ্ঞ, উত্তর ও দক্ষিণী সংগীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায় ইনি নাকি হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। সেই যুগে সংগীতের শাস্ত্রগত ও ক্রিয়াত্মক অংশে প্রবল মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সেই অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য ইনি সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ 'রাগবিবোধ' গ্রন্থখানি (সম্ভবত ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) রচনা করেন।

এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'থাট' শব্দের ব্যবহার এবং অলংকার, গমকাদির চিহ্নযুক্ত স্বরলিপি পাওয়া যায়। স্বকীয় পদ্ধতিতে ইনি ৯৬০টি মেল উদ্ভাবন করেছেন, যদিও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইনি মাত্র ২৩টি মেলের কথাই বলেছেন। এছাড়া বহুবিচিত্র সাংগীতিক উপাদানাদির বর্ণনা তথা জন্য-জনক রীতিতে রাগ

বর্গীকরণ প্রভৃতিও করেছেন। তারপরে বিভিন্ন প্রকার বীণা তথা নবীন বাদন প্রণালীর এমন সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন, যার থেকে ইনি যে একজন উত্তম বীণকার ছিলেন তা বোঝা যায়। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সুন্দর ও সুললিত ছন্দে বহু রাগ-রাগিণীর রাগরূপ তথা ধ্যান-কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি সহজবোধ্য করার জন্য ইনি স্বয়ং এর টীকাও রচনা করেছেন। অর্থাৎ এই গ্রন্থকারের কাছে পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা অশেষ ঋণী।

সোমনাথ আমীর খুসরো প্রবর্তিত কয়েকটি রাগনাম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থেই তোড়ীর রূপবিবর্তনের সংবাদ জানা যায়, কল্যাণ যে ইমনের প্রভাবে নতুনরূপ গ্রহণ করেছিল বোঝা যায় এবং ইমনকল্যাণ নামটি যে প্রাচীন কল্যাণয়মন শব্দের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অনুমান করতে পারি। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত শিবমত ভৈরব রাগটি যে কিছুকাল আগে সোমমত ভৈরব নামে পরিচিত ছিল সে তথ্যও জানতে পারি। গ্রন্থকার এবং গ্রন্থখানি দক্ষিণ ভারতীয় হলেও সংগীত জিজ্ঞাসুদের কাছে এটি একটি অমূল্য সম্পদ। এঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না।

পণ্ডিত দামোদর
(১৬শ শতাব্দী)

মহারাষ্ট্রদেশীয় লক্ষীধরের পুত্র পণ্ডিত দামোদরের জন্ম সম্ভবত ১৬শ শতকের শেষের দিকে হয়েছিল। ইনি সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতের শাস্ত্রগত ও ক্রিয়াত্মক বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬৫৫-২৭ সালের কাছাকাছি) ইনি উত্তর-ভারতীয় সংগীতের বিষয়ে 'সংগীতদর্পণ' নামক একখানি সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি 'স্বরাধ্যায়', 'রাগাধ্যায়', 'প্রবন্ধাধ্যায়', 'তালাধ্যায়' ও 'নৃত্যাধ্যায়' এই ছয়টি পরিচ্ছদ নিয়ে গঠিত।

সংগীতরত্নাকর গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রায় অপরিবর্তিতরূপেই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত অধিকাংশ তথ্যাদিই ইতিপূর্বে অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই গ্রন্থের কিছু স্বকীয়তাও আছে যা অন্য কোনো গ্রন্থে নেই। যেমন, শারীরবিবেক-অন্তর্গত বিভিন্ন চক্র সম্বন্ধে

আলোচনা; গানের পাঁচটি নাম, যথা—গীত, রূপক, বস্তু, প্রবন্ধ ও গেয়; তাল অধ্যায়ে ৩২ প্রকার মঠের পরিচয়; নৃত্য অধ্যায়ে মুখচালি ইত্যাদির বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে ইনি মধ্যযুগে প্রচলিত নৃত্য ধারার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, যার থেকে আধুনিক নৃত্যধারা, ভরতনাট্যম আদির সুষ্ঠু বিকাশ হয়েছে। ইনি সা ও প কে অচলস্বর (অবিকৃত) এবং অন্যান্য স্বরের দুটি করে রূপ নিশ্চিত করে বহু রাগের পরিচয় দিয়েছেন। রাগ সমূহের ধ্যানরূপের বর্ণন ইনি দেব-দেবীর রূপের সঙ্গে করেছেন। স্বর সমূহের রঙ এবং রসের পরিচয়ও ইনি দিয়েছেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থের অনুবাদ নাকি বিভিন্ন ভাষায় হয়েছিল। ১৯৫০ সালে এর হিন্দী অনুবাদ 'হাথরস সংগীত কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জগন্নাথ কবিরায়
(১৬শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ কবিরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অসাধারণ সংগীত প্রতিভা এবং কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, প্রথম জীবনে ইনি তানসেনকে তাঁর সংগীত শোনাতেন। তানসেন নাকি এঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। তানসেন নাকি বলেছেন যে, কবি ও গায়ক হিসাবে তাঁর ঠিক পরেই এঁর স্থান। অবশ্য এই উক্তির সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। মনে হয় ওই প্রশংসা নিতান্তই মৌখিক ছিল। অবশ্য শেষ বয়সে ইনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারে আশ্রয়লাভ করেন এবং সেইখানেই এঁর গুণপনার স্বীকৃতি হিসাবে 'কবিরায়' উপাধি লাভ করেন। এঁর সম্পর্কে আর কোনো তথ্য জানা যায় না। ১৬৬০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

লাল খাঁ
(১৬শ শতাব্দী)

তানসেনপুত্র বিলাস খাঁর শিষ্য ও জামাতা লাল খাঁর জন্ম আনুমানিক ১৫৮৫-৯০ সালে হয়েছিল। ইনি অতি গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান এঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে এঁকে 'গুণসমুদ্র' উপাধি এবং তুল্য ওজনের

রৌপ্য দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন (১৬৩৬ সালের ১৪ই মার্চ)। আনুমানিক ১৬৭৫-৮০ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

দিরঙ্গ খাঁ

(১৬শ শতাব্দী)

এঁকে রঙ্গ খাঁ এবং দৈরঙ্গ খাঁ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইনিও সম্রাট শাহজাহানের দরবারী গায়ক ছিলেন এবং এঁকেও বাদশাহ তুল্য ওজনের রৌপ্য দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। শোনা যায় ইনি ও লাল খাঁ অতি গুণী ধ্রুপদগায়ক (কলাবন্ত) এবং সম্রাটের খুব প্রিয় ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে সঠিকভাবে আর কিছু জানা যায় না। ১৭শ শতকের শেষের দিকে এঁদের মৃত্যু হয়।

লোচন

(১৬শ শতাব্দী)

বিহারের মুজফ্‌ফরপুর জেলায় পণ্ডিত লোচনের জন্ম হয়। ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষ নাকি মিথিলার উত্যান বা উজান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইনি রাজা মহীনাথ ও নরপতি ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতের ক্রিয়াত্মক ও শাস্ত্রগত বিষয়ে ইনি অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন।

কেহ কেহ এঁকে ১৪শ শতকের গুণী বলেছেন, কিন্তু এঁর গ্রন্থে জয়দেব, বিদ্যাপতি, দামোদর প্রমুখের নামোল্লেখ থাকায় এবং অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এঁর জন্মসময় ১৬শ শতকের শেষে বলেই মনে হয়।

'রাগসর্বসংগ্রহ' ও 'রাগতরঙ্গিনী' নামে দুখানি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ ইনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন। বিদেশী প্রভাবে তখন ভারতীয় সংগীতে যথেষ্ট বিবর্তন শুরু হয়েছিল। সেই আবহাওয়ায় এই গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে ইনি প্রাচীন সংগীতের মূল্যবান তথ্যাদি সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন।

হনুমন্মতের ৬টি রাগ ও তাদের পাঁচটি করে রাগিণীর নামোল্লেখ করে তার নানা প্রকারভেদের ইনি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। ঠাট পদ্ধতির সমর্থন করে ইনি রাগগুলির স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সংকীর্ণ দেশীরাগ সম্বন্ধে

আলোচনাকালে ইনি ভাটিয়াল, বরাড়ী, জোগিয়া, মালব, সম্ভোগিনী প্রভৃতি অনেক নবীন রাগের নামোল্লেখ করেছেন। উক্ত আলোচনাকালে ইনি সর্বত্রই বিদ্যাপতির পদাবলী ব্যবহার করেছেন। যাতে ইনি যে বিদ্যাপতির সবিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন, সে-কথা বোঝা যায়। আর, নবীন রাগগুলি বিদ্যাপতির উদ্ভাবিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমীর খসরু উদ্ভাবিত সাংগীতিক উপাদানাদির অধিকাংশকেই ইনি প্রাচীন ভারতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। যে-কথা আজ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সত্য বলে স্বীকৃত। লোচন বর্ণিত বহু রাগ আজও প্রায় অপরিবর্তনীয় রূপেই প্রচলিত আছে।

আহোবল
(১৭শ শতাব্দী)

দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচণ্ড বিদ্বান পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র পণ্ডিত আহোবল সম্ভবত ১৭শ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁকে ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শতকের গুণী বলেও কেহ কেহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ১৭শ, ১৮শ শতকের অনেকে এঁর নামোল্লেখ করলেও ১৬শ শতক পর্যন্ত কেউ এঁর নামোল্লেখ করেন নি বা এঁর সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাই এঁর অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতকের শেষে কিম্বা ১৭শ শতকের প্রারম্ভে হওয়াই সম্ভব। এঁর গ্রন্থের তথ্যাদিও অনুরূপ অভিমতের অনুকূল।

পণ্ডিত আহোবল সংস্কৃত, সাহিত্য তথা সংগীতের শাস্ত্রগত ও ক্রিয়াত্মক উভয় অংশেই বিশেষ জ্ঞানী এবং দক্ষিণ ও উত্তরী সংগীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। গবেষকদের মতে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মহত্বপূর্ণ "সংগীতপারিজাত" গ্রন্থখানি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল।

এই গ্রন্থের মূল্যবান তথ্য হোল বীণার তারে স্বর স্থাপন পদ্ধতির বর্ণনা। ইনিই সর্বপ্রথম গণিতসিদ্ধ স্বর স্থাপন প্রণালীর ব্যাখ্যা করেন। বিপুল সংখ্যক মূর্ছনা ভেদ রচনাও এঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার দক্ষিণীমেল পদ্ধতির সঙ্গে উত্তরী সপ্তক (যমন তীব্র, কোমল, অতিকোমল ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন। ইনি কতগুলি অশ্রুতপূর্ব রাগের (যথা বঙ্গালী, মেঘনাদ, কুরঙ্গ, সারঙ্গ ও সিংহরব, যাদের পরবর্তী পণ্ডিত ব্যাংকটমুখী স্বওড্ডাদিত বলে প্রচার

করেছেন) পরিচয় দিয়েছেন। কল্যাণের পরিচয়ে ইনি ইমন বা য়মনের উল্লেখ করেন নি, যা পুণ্ডরীক বা সোমনাথ করেছেন। বড়ালী, তোড়ী, কল্যাণ প্রভৃতি অনেক নবীন ও প্রবীণ রাগেরও ইনি পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ইনি বরাটী প্রকার, নটপ্রকার ভেদ প্রভৃতিরও বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত শুদ্ধমেল মুখারী'র রূপ বর্তমান কাফী থাটের মতো ছিল, এইরূপ শোনা যায়।

১৭১৪ সালে শ্রীদীননাথ ফার্সীভাষায় এবং ১৯৪১ সালে শ্রীকলিন্দ হিন্দী-ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।

শাহজাহান
(১৭শ শতাব্দী)

বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ) অত্যন্ত সংগীত প্রেমী এবং ললিতকলার পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি স্বয়ং উত্তম গাইতে পারতেন। উর্দ্‌ভাষায় ইনি বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন বলে শোনা যায়। এঁর দরবারে লাল খাঁ, দিরঙ্গ খাঁ, জগন্নাথ কবিরায় প্রমুখ তৎকালীন বহু সংগীতগুণীরা আশ্রয়লাভ করেছিলেন।

হৃদয়নারায়ণ দেব
(১৭শ শতাব্দী)

১৭শ শতকের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রদেশের গড়া নামক স্থানে হৃদয়নারায়ণ দেবের জন্ম হয়। শোনা যায় এঁর পিতা প্রেমনারায়ণ দেবকে (প্রেমশাহ) গড়া রাজ্যটি ১৬৪০ স্লালে সম্রাট শাহজাহান দান করেছিলেন। কিন্তু ১৬৫১ সালে শত্রুর আক্রমণে তিনি নিহত হন এবং বালক হৃদয়নারায়ণ জব্বলপুরের কাছে মণ্ডলা নামক স্থানে পালিয়ে যান। পরে সেই স্থানের নামকরণ হয় 'গড়ামণ্ডলা' এবং ইনি সেখানকার রাজা হন। জয়গোবিন্দ নামক পণ্ডিত -কৃত শিলালিপিতে এই বংশ-পরিচয় বর্ণিত আছে।

ইনি সংগীত ও ললিতকলার গভীর অনুরাগী ছিলেন। সংগীত এবং সংগীত শাস্ত্রাদির চর্চাই এঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষায় 'হৃদয়কৌতুক'

ও 'হৃদয়প্রাশ' নামক দুখানি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রথমখানি লোচন -কৃত 'রাগতরঙ্গিণী' এবং দ্বিতীয়খানি আহোবল-কৃত 'সংগীতপারিজাত' গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। বহুস্থানে ভাষাও অপরিবর্তিত আছে। তবে শুদ্ধমেল, একটি বিকৃত স্বরযুক্ত, দুটি বিকৃত স্বরযুক্ত মেল প্রভৃতি বিভাগের কল্পনা এই গ্রন্থদ্বয়ের স্বকীয়তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকটি নবীন রাগ-নামও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ফকীরুল্লা
(১৭শ শতাব্দী)

১৭শ শতকের প্রথম দিকে ফকীরুল্লার জন্ম হয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৭-১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) ইনি কাশ্মীরের সুবেদার ছিলেন। বহু হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে এঁর হাত ছিল। তবে ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন এবং হিন্দু সংগীত তথা সংগীত গুণীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জীবনে যা কিছু ধনোপার্জন করেছেন, সব ইনি সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের সেবা ও প্রচারকার্যে ব্যয় করেছেন।

ইনি 'রাগদর্পণ' নামে একখানি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করেছেন। কারো মতে এই গ্রন্থখানি মানসিংহ তোমর রচিত 'মানকুতূহল' গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ মাত্র। কারণ এই গ্রন্থে মানকুতূহলের বহু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। যে-সকল বিষয় ইনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি সেই-সকল স্থানে ইনি নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ইনি বাদশাহ আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত প্রায় সকল সংগীত গুণীদের পরিচয় দিয়েছেন। ঔরঙ্গজেব যে ললিত-কলার ঘোরতর শত্রু ছিলেন সেকথা ইনি অস্বীকার করেছেন। কিছু কিছু ভারতীয় রাগের সঙ্গে ইনি ফারসী রাগাদির তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এবং সংগীত জিজ্ঞাসুদের কাছে গ্রন্থখানি যথেষ্ট মূল্যবান।

ভাবভট্ট
(১৭শ শতাব্দী)

ভাবভট্ট স্বয়ং আপন বংশ-পরিচয় দিয়েছেন। এঁর পিতা জনার্দন ভট্ট ও মাতা স্বপ্নভবা রাজপুতানার ঢোলপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ১৭শ শতকের প্রথমার্ধে এর জন্ম হয়। এর পিতা বাদশাহ শাহজাহানের দরবার-পণ্ডিত ছিলেন। যিনি সংগীতের অতি গুণী হওয়ায় সংগীতরাজ নামে সম্বোধিত হতেন।

ভাবভট্টও সংগীত তথা সংস্কৃত ভাষায় প্রকাণ্ড বিদ্বান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিকানীরের মহারাজা অনুপসিংহের (১৬৭৪-১৭০৯ খৃঃ) দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে ইনি সংস্কৃত ভাষায় সংগীত সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন 'অনুপসংগীতরত্নাকর,' 'অনুপসংগীতবিলাস', 'অনুপসংগীতাংকুশ,' 'মুরলী প্রকাশ', 'নষ্টোদিষ্ট প্রবোধক' ধ্রুপদের টীকা, 'সংগীত-বিনোদ' প্রভৃতি। ইনি হিন্দী ভাষায়ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর গ্রন্থগুলি পূর্বাচার্যদের অনুকরণেই রচিত, তবে ধ্রুপদ ইত্যাদি গীতরীতির সুষ্ঠু পরিচয়, নানাবিধ রাগের সুন্দর বর্ণনা প্রভৃতি এঁর স্বকীয়তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য; যেমন অনুপসংগীতবিলাসে ৭০টি রাগের বিবরণ, অনুপসংগীতরত্নাকরে ২০টি মেলকে আশ্রয় করে রাগ-বর্গীকরণ প্রভৃতি।

ব্যংকটমুখী
১৭শ শতাব্দী)

শার্ঙ্গদেবের গুরুপরম্পরা শিষ্য দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রী পণ্ডিত ব্যংকট-মুখী ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দিকে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা 'সংগীত সুধা' গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দ দীক্ষিত (অনেকে যাঁকে তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথ মনে করেন) এবং মায়ের নাম নাগমাম্বিকা। পিতা গোবিন্দ দীক্ষিত আসলে নায়ক বংশের অন্তিম রাজা বিজয় রাঘবের (১৬৬০ খৃঃ) দেওয়ান ছিলেন। এই রাজা ব্যংকটেশের (এঁর প্রকৃত নাম ছিল ব্যংকটেশ

দীক্ষিত) সংগীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শিক্ষাব্যবস্থা তথা পরবর্তীকালে সভা-গায়কের পদে নিযুক্ত করেন।

পরিণত বয়সে ইনি কর্ণাটক সংগীতের প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ 'চতুর্দন্ডী-প্রকাশিকা' রচনা করেন। এই ব্যাপারে ইনি নাকি পিতার কাছে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থে বহুবিচিত্র সাংগীতিক উপাদানাদির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্গ ও দেশী সংগীতের পরিচয়ে ইনি দশ শ্রেণীর রাগের (গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ) প্রথম ছয়টিকে গান্ধর্ব বা মার্গসংগীত এবং অবশিষ্ট চারটিকে দেশী সংগীতের অন্তর্গত বলেছেন। ইনি সপ্তকের ১২টি স্বরের ১২টি রূপ স্বীকার করে গাণিতিক হিসাবে ৭২টি থাট এবং প্রত্যেকটি থাট থেকে ৪৮৪টি করে রাগোৎপন্ন সম্ভব এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তবে ৭২টি থাটের নামকরণ কিন্তু ইনি করেন নি। নামগুলি পরবর্তীকালে অন্য কেহ প্রচার করেছেন। রাগলক্ষণ নামক গ্রন্থে এই নামগুলি পাওয়া যায় কিন্তু গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ব্যংকটমুখী স্বয়ং মাত্র ১৯টি থাটের অন্তর্গত মোট ৫৫টি রাগের নামোল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন। যার মধ্যে সিংহরব নামক তাঁর কল্পিত একটি মেল আছে (অবশ্য সিংহরব নামটি পূর্ববর্তী অহোবল রচিত সংগীতপারিজাত গ্রন্থে পাওয়া যায়)। ১৭ শতকের শেষের দিকে তাঞ্জোরেই এঁর মৃত্যু হয়।

সদারঙ্গ (ন্যামৎ খাঁ)
(১৭শ শতাব্দী)

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তানসেন বংশীয় খুশহাল খাঁর পৌত্র এবং প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ লাল খাঁর পুত্র ন্যামৎ খাঁর জন্ম হয় (১৬৭০ খৃঃ ?)। ইনি অতি উচ্চস্তরের বীণকার তথা ধ্রুপদ ও ধামার গায়ক ছিলেন। ইনি কবি ও সুরকার হিসাবেও অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। সহস্রাধিক খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামারাদি গানের রচয়িতা ও প্রচারক হিসাবে ইনি সংগীত জগতে চিরস্মরণীয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ বাদশাহ রোসন আখ্‌তার মহম্মদ শাহ নাম নিয়ে (১৭১৯-৪৮ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও সংগীত

ছিলেন। নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তাঁর দরবারী সংগীতজ্ঞ। একদিন চাটুকারদের প্ররোচনায় বাদশাহ এঁকে সারেঙ্গীর সঙ্গে বীণা অনুসরণ করতে বলেন। এই অপমানকর আদেশ পালন করা কঠিন ছিল, ফলে ইনি দরবার থেকে বহিষ্কৃত হন। এই অপমানে ইনি অজ্ঞাতবাস শুরু করেন।

ওই সময়ে ইনি গান রচনা আরম্ভ করেন। পূর্ববর্তী আমীর খসরু, সুলতান হুসেন শর্কী, রাজা বাহাদুর, চঞ্চল সেন, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ প্রমুখ সংগীতস্রষ্টারা খেয়াল গানের প্রচারে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে না পারায় ইনি উপলব্ধি করেন যে, গীত রচনায় বাদশাহের নাম যুক্ত থাকলে হয়তো তা অধিক জনপ্রিয় হতে পারে। বাদশাহকে খুশি করাও এই উপলব্ধির অন্যতম কারণ বা উদ্দেশ্য হতে পারে। সেই থেকে ইনি 'সদারঙ্গ' ছদ্মনামে মহম্মদ শাহের নাম যুক্ত করে গান রচনা শুরু করেন।

ইনি শিষ্যদের খেয়াল গান শেখালেও বংশের কাউকে ধ্রুপদ ছাড়া অন্য গান শেখাতেন না। এঁর শিষ্যদের মুখে এই সকল গান শুনে বাদশাহ রচয়িতার সন্ধান করেন এবং জানতে পারেন যে, এই সদারঙ্গ হোল ন্যামৎ খাঁ। অনুতপ্ত বাদশাহ তখন আবার পূর্ণ মর্যাদায় এঁকে দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে কব্বাল বালকদ্বয়, হসনঘাটি প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য।

পরবর্তীকালে বাদশাহ এঁর গানে প্রভাবিত হয়ে তাঁর অন্তঃপুরের গায়িকাদের খেয়ালগান শেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই দিনে, এঁর মতো শিল্পীর পক্ষে গায়িকাদের শিক্ষা দেওয়া অপমানকর বলে গণ্য হোত। তাই আবার মনান্তর হবার ভয়ে ইনি কৌশলে, শিষ্য হসনঘাটিকে সেই কার্যে নিযুক্ত করেন।

ইনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। যা উপার্জন করতেন সব দান করে স্বয়ং ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। এঁর দুই পুত্র ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) এবং ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ) অতি গুণী শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এঁরাও ছদ্মনামে কিছু গান রচনা করেন। আনুমানিক ১৭৪৭-৪৮ সালে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

শ্রীনিবাস
(১৭শ শতাব্দী)

শ্রীনিবাসের জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির স্থান কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে ইনি ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন এই অভিমতই অধিক সমর্থিত। এঁর সম্পর্কে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। এক মতে ইনি উত্তর-ভারতীয় এবং বাংলাদেশের কাছাকাছি কোনো স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আর-এক মতে ইনি দক্ষিণ-ভারতীয় এবং নরপতিপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই যাবতীয় সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি এঁর নাকি অদ্ভুত ঝোঁক ছিল, এবং যে কোনো উপায়েই হোক না কেন। এইরূপে এঁর গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি একত্রিত হয়। সেগুলি অধ্যয়ন এবং সংগীত-চর্চা করে ইনি অসাধারণ জ্ঞান ও খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু দৈবক্রমে একদিন আগুন লেগে এঁর গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়। এই শোকে ইনি উন্মাদ-প্রায় হয়ে যান। তখন স্থানীয় রাজা ব্যংকট নাকি নানা কৌশলে এঁর মনের শান্তি ফিরিয়ে আনেন। এই রাজার সহায়তায়ই সম্ভবত পরবর্তীকালে ইনি 'রাগতত্ত্ববিবোধ' গ্রন্থখানি রচনা করেন।

রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থখানিকে প্রায় অহোবল রচিত 'সংগীতপারিজাত' গ্রন্থের অনুকরণ বলা যায়। এছাড়া এতে রাগবিবোধ (সোমনাথ রচিত) গ্রন্থ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে। তবে শ্রীনিবাসের স্বকীয়তাও কিছু কিছু আছে। যেমন বীণাবাদন পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও ব্যবহৃত নানাবিধ গমকের নাম, অলংকারাদির পরিচয়, স্বরস্থান নির্ণয়-পদ্ধতির সহজতম ব্যাখ্যা ইত্যাদি। এঁর বর্ণিত শুদ্ধ থাট বর্তমান কাফী মেলের মতো ছিল। হিন্দুস্থানী-সংগীত পদ্ধতির বিকাশে এই গ্রন্থের অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের অন্তিম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সংগীতশাস্ত্রী হিসাবে শ্রীনিবাস স্বীকৃত।

অদারঙ্গ
(১৭শ শতাব্দী)

সদারঙ্গের প্রথম পুত্র অদারঙ্গের জন্ম ১৭শ শতকের শেষের দিকে হয়। এঁর প্রকৃত নাম ছিল ফিরোজ খাঁ। ইনি উত্তম বীণকার এবং ধামার গানে

কৃতবিদ্য ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি মহম্মদ শা'র দরবারে নিযুক্ত হন। ইনি উর্দু, পাঞ্জাবী তথা ব্রজভাষায় অদারঙ্গ ছদ্মনামে কিছু গান রচনা করেছেন। ইনি কয়েকটি রাগও সৃষ্টি করেছেন। অদারঙ্গী বা ফিরোজ খানি তোড়ী নামক রাগ নাকি এঁরই সৃষ্ট। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ১৮শ শতকের শেষভাগে এঁর মৃত্যু হয়।

মহারঙ্গ

(১৮শ শতাব্দী)

সদারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র মহারঙ্গের জন্ম সম্ভবত ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে হয়েছিল। এঁর প্রকৃত নাম ছিল ভূপৎ খাঁ। ইনি তৎকালীন অদ্বিতীয় বীণকার ছিলেন। ধামার ও খেয়াল গানেও ইনি কৃতবিদ্য ছিলেন। মহম্মদ শা'র রাজত্বের শেষের দিকে ইনিও দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ বীণকার জীবন খাঁ ও প্যার খাঁ এঁরই শিষ্য ছিলেন।

মনরঙ্গ

(১৮শ শতাব্দী)

সদারঙ্গের শিষ্য মনরঙ্গের জন্ম সম্ভবত ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে হয়েছিল। ইনি অসাধারণ সংগীত ও কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইনি অনেক ধ্রুপদ ও খেয়াল গান রচনা করেছেন, তাছাড়া দাদরা গানের প্রচলিত রূপটি এঁরই উদ্ভাবিত বলে শোনা যায়। প্রসিদ্ধ জয়পুরী খেয়াল ঘরাণার ইনিই প্রবর্তক বলে কথিত আছে।

গোলাম রসুল

১৮শ শতাব্দী

১৮শ শতকের গোড়ার দিকে গোলাম রসুলের জন্ম হয়। ইনি এবং এঁর ভাই মিয়াঁ জানী নাকি কবাল ঘরাণার বংশধর ছিলেন এবং পরে সদারঙ্গের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে এঁরাই সেই কব্বাল বালকদ্বয় যাঁদের সদারঙ্গ খেয়াল গানে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। সদারঙ্গের খেয়াল

গানের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হিসাবে গোলাম রসুল স্বীকৃত। তাছাড়া ইনি বহু শিষ্যকে তালিম দিয়ে খেয়ালের বহুল প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এঁর প্রধান শিষ্য শক্কর, মখ্‌খন প্রমুখ এবং পুত্র টপ্পা গানের সংস্কারক ও প্রচারক স্বনামধন্য গোলাম নবী (শোরী মিয়াঁ) উল্লেখযোগ্য।

গোলাম রসুল অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার (১৭৫৪-৭৫ খৃঃ) দরবারের শ্রেষ্ঠ গুণী রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী নবাব আসফউদ্দৌলার সভাতেও (১৭৭৫-৯৫ খৃঃ) ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি অতি উত্তম গীতরচয়িতা তথা অতি উচ্চস্তরের খেয়াল ও ধ্রুপদ গায়ক এবং অতি সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। শোনা যায় যখন বাড়িতে রেওয়াজ করতেন তখন বুলবুল আদি পাখিরা এসে এঁর চারপাশে বসে গান শুনতো। ইনি অনেক গান রচনা করেছিলেন যা আজও প্রচলিত, কিন্তু রচয়িতার নাম সংযুক্ত না থাকায় সেগুলি আজ আর চেনা যায় না। ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শবান তথা স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায় নবাবের দেওয়ান হসনরাজ খাঁর সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সপরিবারে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন। দেওয়ান নাকি তাঁর বাড়িতে সংগীত পরিবেশন করার অনুরোধ করে তাঁর অপমান করেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই এঁর মৃত্যু হয়।

নরহরি চক্রবর্তী
(১৮শ শতাব্দী)

১৮শ শতকের গোড়ার দিকে জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র বিখ্যাত লেখক ও গায়ক নরহরি চক্রবর্তীর জন্ম হয়। ইনি নিজেকে ঘনশ্যাম দাস বলে পরিচিত করেছিলেন। অসাধারণ কবিত্বশক্তি তথা সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্বান নরহরি অনেক কীর্তনপদ, পালাগান এবং সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁর গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত ভাষ্য থেকে ইনি যে, পূর্বাচার্যদের রচিত 'সংগীতসার', 'সংগীতশিরোমণি', 'সংগীতপারিজাত', 'কোহলীয় শাস্ত্র', 'সংগীতদামোদর', 'নারদসংহিতা', 'সংগীতরত্নমালা', 'সংগীতরত্নকোষ', 'ভরতসংহিতা', 'সংগীত-রত্নাকর' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সজ্ঞান ছিলেন, সেকথা বোঝা যায়।

এঁর রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থদ্বয়ের মূল্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতুলনীয়, কারণ বিভিন্ন কীর্তনরীতির উদ্ভব প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা এর সাহায্যেই জানতে পেরেছি। 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থে ইনি নিজের এবং অন্যান্য কীর্তনকারদের গীতরীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া ইনি 'সংগীতসারসংগ্রহ' নামক একখানি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন।

রামপ্রসাদ সেন
(১৮শ শতাব্দী)

১৭২৩ সালে ২৪ পরগনার কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামে সাধক রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। পিতা রামরাম সেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক (কবিরাজ) ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান রামপ্রসাদ অত্যন্ত মেধাবী ও চতুর ছিলেন। প্রথমে কিছুকাল সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের পরে ইনি তৎকালীন রাজভাষা ফার্সী এবং হিন্দি শিক্ষা করেন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি বিভিন্ন বিষয়ে উত্তম জ্ঞানার্জন করেন। অল্প বয়সেই সর্বাণী নামে এক সুশীলার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

গুরু আগমবাগীশের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরে সংসারের প্রতি এঁর নির্লিপ্ততা লক্ষিত হয়, কিন্তু গুরুর নির্দেশে মনযোগী হবার চেষ্টা করেন। পিতার মৃত্যুর পরে, পৈত্রিক সম্পত্তি বিশেষ কিছু না থাকায় এবং চারটি পুত্র-কন্যা লাভ করায় অত্যন্ত আর্থিক সংকটাপন্ন হন। চাকুরির চেষ্টায় ইনি যখন অত্যন্ত বিব্রত তখন ভাগ্যক্রমে তৎকালীন ধনী দুর্গাচরণ মিত্রের কাছারিতে হিসাব রক্ষকের কাজ পান।

ইনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি তথা সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। শোনা যায় ভজন, সাধন, বন্দনাগান, গজল প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার গান ইনি রচনা করেছেন যার অধিকাংশই বর্তমানে লুপ্ত। এঁর রচিত 'কালী-কীর্তন', 'কৃষ্ণকীর্তন', 'শিবকীর্তন' প্রভৃতি পালাগান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মাকে মেয়ে বলে ইনিই সর্বপ্রথম কল্পনা করেন। এঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনীও প্রচলিত।

গঙ্গাতীরে বসে ইনি প্রায়ই গান গাইতেন। একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং এঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও বসবাসের জন্য প্রচুর জমি দান করেন। সেই সময়ে ইনি প্রসিদ্ধ 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থখানি রচনা করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই গ্রন্থখানি ইনি মহারাজের নামে উৎসর্গ করেন। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাও একদিন গঙ্গাবক্ষ থেকে এঁর গান শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং কিছু জায়গীর দান করতে চান, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ইনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আনুমানিক ৭২ বৎসর ইনি বেঁচে ছিলেন। এঁর তিরোধান সম্পর্কে শোনা যায় যে, 'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন' গানখানি গাইতে গাইতে এঁর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি মিলিয়ে যায় এবং তিনি গঙ্গাবক্ষে ঢলে পড়েন।

বর্তমানে প্রচলিত রামপ্রসাদী-সংগীত তথা প্রসাদী গায়কী এঁরই অনবদ্য অবদান।

(১৮শ শতাব্দী)

ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর প্রতাপ সিংহের পুত্র তুলাজীরাও ভোঁসলে ১৭৬৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭১ সালে নবাব মহম্মদ আলী এঁকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। ইংরেজদের সহায়তায় ১৭৭৩ সালে ইনি আবার রাজত্ব ফিরে পান। কিন্তু তার জন্য এঁকে ইংরেজদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে হয়।

ইনি তেমন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন না বটে, কিন্তু নানা বিদ্যা ও ললিত-কলায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য ও সংগীত-বিদ্যায় এঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ইনি অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির হওয়ায় বহু মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করিয়েছেন।

ইনি কর্ণাটক সংগীতপদ্ধতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সংগীতসমর্য়স রামৃতম্" (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি পণ্ডিত ব্যংকটমুখীর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা'র অনুসরণে রচিত। ইনিও ৭২টি থাট স্বীকার করে, তার থেকে মাত্র ২১টি থাটের সাহায্যে উৎপন্ন ১১০টি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি কর্ণাটক সংগীতের প্রামাণিক পুস্তক হিসাবে স্বীকৃত।

সেই সময়ে তাঞ্জোরের এক গৃহস্থের কাছে 'রাগলক্ষণ' নামে কর্ণাটক সংগীতের আর-একখানি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের পরিচয়হীন এই গ্রন্থেও ৭২টি থাট স্বীকার করে অনেকগুলি রাগের পরিচয় দেওয়া আছে।

তুলজাজীর জন্মের সময়কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এঁর তিন পুত্র ও তিন কন্যা এঁর জীবিতকালেই মারা যায়। ১৭৮৬ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)
(১৮শ শতাব্দী)

১৭৪১ সালে হুগলী জেলার চাঁপতা গ্রামে প্রসিদ্ধ টপ্পা-গায়ক নিধুবাবুর জন্ম হয়। আদি নিবাস ছিল কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে কিন্তু বর্গিদের উৎপাতে তাঁরা হুগলীতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন।

বাল্যকাল থেকেই নিধুবাবু অসাধারণ সংগীত-প্রতিভা এবং কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। অধ্যয়ন শেষে ইনি ছাপরা জেলায় কোম্পানীর কাজে যোগদান করেন এবং সেখানে ইনি সংগীত শিক্ষার সুযোগ পান। এঁর সংগীত-প্রতিভা ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়। অল্পকালের মধ্যেই ইনি সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অন্যান্য গুণপনার জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং নিধুবাবু নামে সমগ্র দেশে পরিচিত হন।

বাংলাভাষায় ইনিই সর্বপ্রথম উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনা ও পরিবেশন করেন। এঁর রচিত গানগুলি গীতিকবিতা হিসাবেও স্বীকৃত। ইনি টপ্পাগান রচনা ও গায়নেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তৎকালীন সংগীত-সমাজে এঁর গানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই সেই যুগকে বাংলাদেশের সংগীত-প্রগতির একটি বিশেষ অধ্যায় বলা হয়। ১৮৩৪ সালে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

শ্রীধর কথক
(১৮শ শতাব্দী)

নিধুবাবুর সমসাময়িক শ্রীধর কথক নামে আর-একজন প্রতিভাবান শিল্পীর নাম শোনা যায়। ইনিও বহু টপ্পাগান রচনা করেছিলেন। এঁদের রচিত

গানগুলিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য এবং প্রায় সমান স্তরের প্রতিভা লক্ষিত হওয়ায় একই রচয়িতার সৃষ্টি বলে ভ্রম হয়। শ্রীধর কথক সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

ওমরাও খাঁ
(১৮শ শতাব্দী)

১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে তানসেনের কন্যাবংশীয় গুণী প্রসিদ্ধ বীণকার ও সুরবাহার যন্ত্রের স্রষ্টা ওমরাও খাঁর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বীণকার ছোটে নৌবাদ খাঁর পুত্র এবং নির্মল শাহের জামাতা। এঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ বীণকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে কুতুববকৃস (কুতুবুদ্দৌলা), গোলাম মহম্মদ ও তৎপুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ, হসমৎ খাঁ (বান্দার নবাব) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইনি পুত্রদের বীণা এবং শিষ্যদের বীণার সঙ্গে সেতার আদি শিক্ষা দিতেন। অতি প্রিয় শিষ্য গোলামকে শিক্ষাদানের জন্য ইনি সুরবাহার নামক একটি নবীন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন।

অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার গুণে গোলাম সুরবাহারের শ্রেষ্ঠ বাদকরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন, এবং এই যন্ত্রের বহুল প্রচলনও হয়। গোলাম বীণা ও সেতার বাদনেও দক্ষ ছিলেন। ইনি বান্দা নামক স্থানের অধিবাসী হলেও জীবনের অধিকাংশ গুরুর সেবাতে রামপুরেই কাটান এবং সেখানেই আনুমানিক ১৮৫৭ সালে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর পুত্র সাজ্জাদ সেতারী হিসাবে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং ভারতজোড়া খ্যাতিলাভ করেছিলেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত সভায় নিযুক্ত ছিলেন।

সেকেন্দ্রাবাদ নিবাসী কুতুব বকস প্রথম জীবনে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের (১৮৪৭-৫৬ খৃঃ) মন্ত্রী ও দরবারী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কারণ সংগীতবিদ্যার সঙ্গে ইনি ফারসী ও উর্দূ ভাষায় অতি পণ্ডিত তথা প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ছিলেন। লক্ষ্ণৌর নবাবের পতনের পরে ইনি রামপুরে যান এবং ওমরাও খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ইনি বংশীয় তালিম পেয়ে, প্রতিভা ও সাধনার গুণে প্রসিদ্ধ গায়করূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইনি

অতি গুণী সেতারী রূপেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। শাহশোয়ান ঘরাণার আলী হোসেন ও মহম্মদ হোসেন (বীণকার ভ্রাতৃদ্বয়) এঁর জামাতা ছিলেন।

১৮৪০ সালে ওমরাও খাঁ'র মৃত্যু হয়।

Wolfgang Amadeus Mozart.

(b. 27 Jan. 1756, Salzburg. d. 5 Dec. 1791, Vienna.)

অসাধারণ প্রতিভাবান তথা শ্রুতিধর Mozart অস্ট্রিয়ার চিত্রবৎ Salzburg শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পূর্বপুরুষ Augsburg-এর অধিবাসী ছিলেন। এঁর পিতা Leopold শৈশবে আইন অধ্যয়নের জন্য Salzburg-এ এসেছিলেন, কিন্তু বেহালার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় অধ্যয়ন ত্যাগ করে ধর্মযাজকের সংগীত-গোষ্ঠীতে যোগদান করেন, এবং ক্রমে অত্যন্ত সুবাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

শৈশবেই Mozart-এর সংগীতশিক্ষা অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধভাবে পিতার কাছে আরম্ভ হয়, এবং অল্পকালের মধ্যেই এঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ সকলকে চমৎকৃত করে। ১৭৬৩ সালে Leopold তাঁর দুই সন্তানকে (পুত্র Wolfgang ও কন্যা Nannerl) নিয়ে সংগীত-সফরে বেড়িয়ে পড়েন এবং ভিয়েনার রাজ-পরিবারে আমন্ত্রিত হন। Mozart সেখানে কাপড় দিয়ে ঢাকা পিয়ানোতে সিম্ফনী বাজিয়ে সকলকে অবাক ও মুগ্ধ করেন। ক্রমে এঁরা জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা স্থানে সার্থক সংগীত-সফর করেন এবং সর্বত্রই এঁরা বিশেষভাবে সমাদৃত হন।

Mozart-এর জীবনে সংগীত-সফরগুলি বিশেষ মহত্বপূর্ণ। লণ্ডনে থাকা-কালীন প্রসিদ্ধ Bach-এর কনিষ্ঠ পুত্র Johann Christian Bach-এর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে, যাঁর কাছে ইনি সংগীতের বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ওই সময়ে এর অসাধারণত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক Daines Barrington এর প্রতিভার এক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক গবেষণা করেন এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকাতে একটি নিবন্ধ লেখেন।

১৭৬৯ সালে Mozart পিতার সঙ্গে ইতালীতে যান, সেখানে Bologna-তে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংগীতশাস্ত্রী Padre Martini-র কাছে Counter-

point আদি সংগীতের বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর শ্রুতিজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

১৭৭৭ সালে Mozart মাতার সঙ্গে Paris-এ যান, কিন্তু সেখানে তখন তৎকালীন প্রসিদ্ধ Gluck এবং Piccini-র সংগীত-প্রভাবের জন্য সেখানকার জনসাধারণ বিভ্রান্ত থাকায় Mozart-এর প্রতি ছিল উদাসীন। তার উপরে হঠাৎ মায়ের মৃত্যুতে ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং বাড়ি ফিরে আসেন। Salzburg-এ ইনি উতধর্ব ন বিশপের অধীনে নিযুক্ত হন এবং বহু চার্চ-সংগীত রচনা করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিশপ এঁর প্রতি বিরক্ত হন এবং অত্যন্ত দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেন। তখন বাধ্য হয়ে Mozart পদত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে ইনি বহু বিখ্যাত অপেরাদি রচনা করেন।

১৭৮২ সালে Mozart Vienna-তে স্থায়ীরূপে বসবাস শুরু করেন। সেই সময়ে Konstanze-এর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। Konstanze সংগীতানুরাগিণী তথা মোটামুটি গাইতে পারতেন বটে, কিন্তু Mozart-এর প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৭৯১ সাল পর্যন্ত ইনি বহু বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবু সেই দিনে এঁর আর্থিক ও শারীরিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। এঁর বিখ্যাত অপেরা The Magic flute সেই সময়েরই রচনা। ইনি তখন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। সেই সময়ে একদিন এক রহস্যজনক আগন্তুক গোপনে এঁর সঙ্গে দেখা করে এঁকে মৃতদের জন্য একটি Mass রচনার অনুরোধ করেন। ইনি তখন একটি শবানুষ্ঠানের গান রচনা আরম্ভ করেন। তখন এঁর মনে হোত যেন, নিজের শবানুষ্ঠানের জন্যই এই সংগীত রচনা করছেন। সেই সময়ে হঠাৎ প্রাগ থেকে বোহেমিয়ার রাজ্যাভিষেকের জন্য একটি Opera রচনার দায়িত্ব এঁকে দেওয়া হয়। ১৮ দিনের মধ্যেই ইনি Titus নামক অপেরা তৈরি করেন এবং প্রথম অনুষ্ঠানের জন্য প্রাগে যাবার আয়োজন করেন। তখন আবার একদিন পূর্বোল্লিখিত রহস্যজনক আগন্তুক গোপনে সাক্ষাৎ করে শবানুষ্ঠানের সংগীত রচনার কথা মনে করিয়ে দেন। এই ঘটনা এঁর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কল্পনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

প্রাগ থেকে ফিরে এসে সারাক্ষণ ইনি সংগীত রচনায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাজ করেছেন। অবশেষে ৫ই ডিসেম্বর ১৭৯১ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়।

Mozart ছিলেন অতি উচ্চস্তরের শিল্পী-ভাবাপন্ন তথা অত্যন্ত সুপুরুষ ও বিলাসী ব্যক্তি। অর্থকরী বিষয় ও জৈবিক চাহিদা প্রভৃতির প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে এঁকে চিরকাল নানা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এমন-কি, এঁর মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে ভিক্ষোপজীবীর মতো। অথচ সারাজীবন ধরে ইনি অসংখ্য Opera, Orchestra, Piano Conecrto, Violin Conecrto, Chamber Music, Piano Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন যার অধিকাংশই অতুলনীয় সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। মৃত্যুকালে এঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন এবং সুস্থ হয়ে যখন স্বামীর সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য যান, তখন কেহ সেই সমাধির হদিশই দিতে পারে নি।

শ্যাম শাস্ত্রী
(১৮শ শতাব্দী)

দক্ষিণ-ভারতীয় তামিল ব্রাহ্মণ শ্যাম শাস্ত্রীর পূর্বপুরুষ কুরনৌল জেলার কুমবুম নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁরা কাঞ্চিপুরমের (চিংলেপুট জেলা) অধিবাসী হন। তাঁরা পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু একটি অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁরা পূজারীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঞ্জোরের তিরুতরুর (শ্রীনগর) নামক স্থানে ১৭৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল বিশ্বনাথ আয়ারের পুত্র শ্রীশ্যাম শাস্ত্রীর জন্ম হয়। এঁর মাতা এক বছর পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণীর সাহায্যে এই পুত্র লাভের, তথা এই বংশে এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা জানতে পেরেছিলেন।

অল্পবয়সেই ইনি তেলেগু ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন। সংস্কৃতসাহিত্য অধ্যয়ন কালে ইনি ক্রমে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর তথা অসাধারণ সংগীতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এঁদের বংশে তেমন সংগীতচর্চা না থাকায়, গুরুজনেরা সংগীতের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তবে এঁর মামা এই বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন, যাঁর কাছে এঁর প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তেমন অগ্রসর হয় নি।

যেমন কথিত আছে যে, মহাগুণী ত্যাগরাজকে নাকি স্বয়ং নারদ ছদ্মবেশে সংগীতশিক্ষা দিতে এসেছিলেন এবং মুথুস্বামীকে যোগী চিদাম্বরনাথ, তেমনি শ্যাম শাস্ত্রীকে সংগীতশিক্ষা দিতে এসেছিলেন বেনারসের এক নর্তক সন্ন্যাসী, নাম সংগীতস্বামী। পরবর্তীকালে, গুরুর নির্দেশে শ্রীশাস্ত্রী 'ধারিবোনী' বর্ণের (ভৈরবী রাগ) অবিস্মরণীয় রচয়িতা অতিগুণী পচ্ছিমিরিয়ম আদি আপ্পার কাছে সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ শ্রবণ তথা জ্ঞানার্জন করেছিলেন।

ইনি শুধু অতিগুণী সংগীতজ্ঞই নয়, অতি উচ্চস্তরের সংগীত রচয়িতাও ছিলেন। এঁর রচিত "জননী নটজানা" (সংস্কৃত, সাবেরী রাগ) অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। ইনি প্রায় ৩০০ প্রবন্ধ, ৩২টি কৃতি তথা বিবিধ ছন্দ রচনা করেছেন। তবে এঁর রচিত সংগীত তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করতে পারে নি, কারণ এগুলি এমন উচ্চস্তরের যে, সংগীতে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত না হলে, সঠিকরূপে সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। তাই যে সকল সংগীতজ্ঞ এঁর রচনা গাইতে বা বাজাতে পারেন তাঁদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়।

এঁর মতো সুপুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়; তেমনি ছিল এঁর পোশাক পরিচ্ছদ। কপালে চন্দন, গলায়-রুদ্রাক্ষের স্বর্ণমণ্ডিত মালা দিয়ে যখন তিনি পথে চলতেন, তখন পথের দু'ধারে সকলে দাঁড়িয়ে দেখতেন। পথচারীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁকে পথ ছেড়ে দিতেন। বাস্তবিকই ইনি ছিলেন সংগীতজ্ঞদের সম্রাট।

ইনি অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন এবং কামাক্ষীদেবীর প্রতি ছিল আন্তরিক ভক্তি। শোনা যায় ইনি দেবীর সঙ্গে কথা বলতেন এবং একাধিকবার দর্শনলাভ করেছেন। সাধারণত প্রতি শুক্রবার ইনি বিশেষ এক প্রার্থনায় বসতেন, এবং যখন আত্মসমাহিত হতেন, তখন ভাবাবেশে এমন গান করতেন, যা ছিল অতুলনীয়। তবে ইনি শিষ্যদের প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না। এঁর দুই পুত্র, পাঞ্জু ও সুব্বারাও। সুব্বারাও (১৮০৩-৬২) পিতার যোগ্য ধারক ছিলেন এবং সংগীতে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৮২৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এই মহান সংগীতসাধকের মৃত্যু হয়।

ত্যাগরাজ

(১৮শ শতাব্দী)

১৭৬৭ সালের ৪ঠা মে তাঞ্জোরের তিরুবরুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ত্যাগরাজের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম রামব্রহ্ম ও মাতার নাম সিতাম্মা দেবী। এর পিতামহ তাঞ্জোররাজের সভাকবি ছিলেন। ইনি একাধারে সংগীত-পণ্ডিত, কবি, সুরকার, সাধক তথা কর্ণাটক সংগীতের এক মহান সংস্কারক ছিলেন। কথিত আছে যে ভারতীয় সংগীতাকাশের উজ্জ্বলতম দুটি তারকার মধ্যে একটি তানসেন এবং অপরটি ত্যাগরাজ। কেহ কেহ এঁকে উত্তর ভারতের সুর, কবীর, তুলসী প্রমুখ ভক্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাল্মীকি বিরচিত ২৪,০০০ শ্লোকের মতো ইনিও ২৪,০০০ কীর্তন রচনা করেছেন। তাই কেহ কেহ এঁকে মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। জীবনের অধিকাংশ সময় এঁর তিরুবরুরেই কেটেছে। ব্যংকটমুখী রচিত 'চতুর্দ্দণ্ডীপ্রকাশিকা' অধ্যয়ন করে ইনি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছিলেন। কর্ণাটক সংগীতের বহু নবীন রাগ ইনি রচনা করেছেন। এঁর রচিত পদাবলীর মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৫০০টি পাওয়া যায়, যা রাগ, তাল, স্বর প্রভৃতি সহযোগে 'ত্যাগরাজ হৃদয়' নামে এক বিশাল গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'দিব্যনাম-সংকীর্তন', 'উৎসব-সম্প্রদায়-কীর্তন', 'প্রহ্লাদভক্ত-বিজয়' ও 'নৌকা-চরিত্রম' (নাটক) প্রভৃতিও এঁর রচিত। ইনি সংগীতরচনায় প্রায় ২০০ রাগ ব্যবহার করেছেন। ইনি জটিল রাগেও বহু কীর্তন রচনা করেছেন।

মৃত্যুর পূর্বে ইনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। নিজের মৃত্যুক্ষণ ইনি ৮ দিন আগেই জানিতে পারেন এবং শিষ্যমণ্ডলীকে একত্রিত করেন। সকলের সামনে এঁর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি, অপরূপ সংগীত সৃষ্টি করতে করতে মিলিয়ে যায়। ১৮৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারি এঁর তিরোধান ঘটে। কাবেরী নদীর তীরে এঁর সমাধি আজও বিদ্যমান।

Ludwig Van Beethoven

(b. 16 Dec, 1770, Bonn. d. 26 May, 1827, Vienna.)

বিশ্ববিখ্যাত বেতোভেনের পিতামহ Ludwig ১৭৩০ সালে Antwerp থেকে Bonn-এ সভাগায়কের পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং সেই থেকে এই পরিবারের ক্রমাবনতি ঘটে। পিতা Johann ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপ এবং অসংযমী, ফলে অসাধারণ প্রতিভাবান শিশুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধান হয় না। যদিও শিশুর প্রতিভা সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান ছিলেন এবং বন্ধু Pfeiffer-এর সহায়তায় শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু সেই শিক্ষাপদ্ধতি ছিল যেমন অনিয়মিত তেমনি প্রাণহীন ও নির্মম। যেমন, এই দুই মদ্যপ বন্ধুর হয়তো হঠাৎ খেয়াল হল যে শিশুকে অনেকদিন শিক্ষা দেওয়া হয় নি, তৎক্ষণাৎ, সেই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত শিশুকে টেনে তুলে বেহালা বা পিয়ানো শিক্ষা দেওয়া হত। ফলে শিশুমনে সংগীতের প্রতি বিতৃষ্ণাই সঞ্চারিত হয়।

বেতোভেনের লেখাপড়া বা সংগীতপ্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ হয়তো কিছুই হত না, যদি না ইনি একবার (১৭৮১ সালে) মায়ের সঙ্গে Holland যেতেন। সেখানে সৌভাগ্যবশতঃ ইনি Breuning পরিবারে আশ্রয়লাভ করেন, যাঁরা এঁর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইখানে ইনি ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন, এবং ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন তথা Breuning-এর পুত্র Stephan-কে বন্ধুরূপে লাভ করেন। ক্রমে ইনি সংগীতবিদ্ Christian Neefe-কে সংগীতগুরু রূপে লাভ করেন। তিনি এঁকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মাত্র ১১ বছর বয়সে ইনি প্রথম সংগীত রচনা করেন। সেই সংগীত সম্পর্কে তৎকালীন পত্রিকার অভিমত এইরূপ: "Three Piano sonatas, an excellent composition by a young genius of 11 years, dedicated to the Elector of Cologne. One guilder and 30 kreutzer."[১]

এঁর শৈশব ছিল অত্যন্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যপূর্ণ। পরিণত বয়সে প্রচুর সচ্ছলতা লাভ করলেও আজীবন একাকীত্ব ও অশান্তি ভোগ করেছেন। যদিও সামাজিক হওয়ার জন্য এঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল কিন্তু সে বিষয়ে প্রতিবন্ধক

১ *The world of music*, Vol. 1, K. B. Sandved. p. 177

ছিল এঁর পারম্পর্যহীন তথা অদ্ভুত খেয়ালী স্বভাব। কারণ এর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য। বহু অভিজাত এবং উচ্চবংশীয় সুন্দরীর সঙ্গে এঁর প্রণয় হয়েছে কিন্তু বিবাহের অন্তরায় ছিল পদমর্যাদা। অথচ সাধারণের প্রতি এঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ফলে ইনি চিরকুমার থেকে গেছেন। মৃত্যুর পরে একটি গুপ্তস্থান থেকে এঁর বহু চিঠিপত্র তথা দিনলিপি পাওয়া যায়, যার থেকে এই সকল তথ্য জানা গেছে।

মাত্র ৩৮ বছর বয়সে এঁর শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য সংগীত-সৃষ্টি ব্যাহত হয় নি। সারাজীবন ধরে ইনি অসংখ্য সংগীত ও অপেরাদি রচনা করেছেন। যার মধ্যে অপেরা, অর্কেস্ট্রা, চেম্বার মিউজিক, বেহালা অর্কেষ্ট্রা, পিয়ানো সোনাটা, পিয়ানো ও বেহালা সোনাটা, চেলো ও পিয়ানো সোনাটা, কণ্ঠসংগীত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জীবনের অধিকাংশই ইনি ভিয়েনাতে কাটিয়েছেন। ইনিই সেখানকার শেষ ক্লাসিক্যাল সংগীতস্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য মনে প্রাণে ইনি ছিলেন রোমাণ্টিক সংগীতজ্ঞ, যা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। এঁর মতে পূর্ববর্তী সংগীতজ্ঞেরা যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকে ইনি আরম্ভ করেছেন। এঁর রচনাগুলি সম্বন্ধে অপরে প্রশংসা না করা পর্যন্ত ইনি স্বয়ং কোনো ধারণা করতে পারতেন না। ভিয়েনাতেই এঁর মৃত্যু হয় এবং এখানেই এঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে প্রায় ২০,০০০ জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মুথুস্বামী দীক্ষিতর
(১৮শ শতাব্দী)

১৭৭৬ সালের ২৪শে মার্চ (১৫ই ফাল্গুন) তাঞ্জোরের তিরুবরুর (শ্রীনগর) নামক স্থানে রামস্বামী দীক্ষিতরের পুত্র মুথুস্বামীর জন্ম হয়। বৈথীশ্বরণ কোভিলের ভগবান মুথুকুম্পার স্বামীর অনেক প্রার্থনার পরে নাকি এই পুত্রের জন্ম, তাই এই নামকরণ।

সংগীতে এঁদের বংশগত অধিকার। কারণ ক্লাসিক্যাল সংগীতে এই বংশের একটি বিশেষ স্থান ছিল; যাঁরা শতাধিক বর্ষ এই সংগীত-পরম্পরা জীবিত

রেখেছিলেন। অল্প বয়সেই মুথুস্বামী সংস্কৃত সাহিত্য তথা সংগীতে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন।

বেনারসের প্রসিদ্ধ যোগী চিদাম্বরনাথ তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে রামস্বামীর কাছে এসে কিছুদিন ছিলেন। তিনি অতি উচ্চস্তরের সংগীতসাধকও ছিলেন। ফেরার সময় তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান মুথুস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যান। বেনারসে ইনি ৫ বছর ছিলেন এবং ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তাই এঁর রচনা-গুলিতে ধ্রুপদের প্রভাব লক্ষিত হয়। গুরুর তত্ত্বাবধানে ইনি সংগীতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

গুরুদেব যখন বলেন যে, তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে, এখন তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তখন ইনি তার প্রমাণ দেখতে চান। গুরুদেব তখন বললেন যে, বেশ, তুমি গঙ্গায় কোমর-সমান জলে দাঁড়িয়ে জলে হাত ডুবিয়ে যা ইচ্ছা কল্পনা করো, তাই পাবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ইনি গঙ্গায় গিয়ে একটি বীণা পেয়েছিলেন, যা এখনো এঁর বংশধরদের কাছে আছে। সেটির আকৃতি তাঞ্জোরের বীণার চেয়ে ছোটো এবং ভিন্ন।

এইরূপ আরো অনেক কাহিনী এঁর সংগীত-শক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। যেমন— একদিন ইনি কিডালুর মন্দিরে দেবদর্শনে যান, কিন্তু পূজারী তখন দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন। এঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে পূজারী এঁকে পরে আসতে বলেন। ইনি তখন হৃদয়াবেগের সঙ্গে "অক্ষয়লিঙ্গ ভিভো স্বয়ম্ভু" গানখানি শংকরাভরণ রাগ ও চাপুতালে গাহিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মন্দিরের দরজা খুলে যায়। তখন পূজারী অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বার বার ক্ষমাভিক্ষা করতে থাকেন।

একদিন এঁর ছোটো পত্নী (এঁর দুটি পত্নী ছিল) মুক্তাভরণ ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এঁর শিষ্যেরা এঁকে তাঞ্জোরের মহারাজার কাছে যেতে বলেন, কারণ তাহলে হয়তো মহারাজা এঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে মুক্তাদি উপহার দিতে পারেন। কিন্তু ইনি গান গেয়ে তার উত্তর দিলেন। যার অর্থ হল— "যখন স্বর্ণলক্ষ্মীই আমার কাছে আছে তখন তুচ্ছ পাথর দিয়ে কী হবে।" সেই রাত্রেই এঁর পত্নী স্বপ্নে অম্বিকা দেবীকে সম্পূর্ণ মণি-মুক্তায় অলংকৃতরূপে দেখতে পেলেন। তারপরে আর তিনি ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

একবার এক শিষ্য শুদ্ধ মড্ড্লম তাম্বিআপ্পা দারুণ পেটের ব্যথায় কষ্ট

পাচ্ছিল। তার আত্মীয়দের মতে গুরু ও শনি বক্রী হওয়ায় নাকি এই বিপত্তি। ইনি তখন ওই দুই গ্রহরাজের তুষ্টির জন্য আথানা রাগে 'বৃহস্পতি' এবং যদুকুল-কাম্ভোজী রাগে 'দিবাকর তনুজম' সংগীত রচনা করেন এবং শিষ্যকে বার বার গাইতে বলেন। গুরুর নির্দেশ অনুসারে উক্ত সংগীত অভ্যাস করাতে এক সপ্তাহের মধ্যে তাম্বিআপ্পা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এদিকে অন্যান্য গ্রহগুলির জন্য ইনি আরো পাঁচটি সংগীত রচনা করেন। এইরূপে এঁর প্রসিদ্ধ "বীর কীর্তন" রচিত হয়।

একদিন দারুণ গরম, পথে সকলেই পিপাসার্ত। একটি গাছতলায় সকলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময়ে এঁর পত্নী এক শিষ্যকে কোথাও জল পাওয়া যায় কি না খোঁজ নিতে বললেন। দীক্ষিতর যদিও তন্দ্রার ঘোরে ছিলেন কিন্তু ওই কথা শুনতে পান এবং মনে মনে ব্যথিত হয়ে ওঠেন। তখন ইনি বিখ্যাত "আনন্দামৃত করশানী" গানখানি 'অমৃত বর্ষিণী' রাগে রচনা করেন, (এটি ৫১তম মেলের একটি জন্য তথা উপাঙ্গ রাগ, যার আরোহাবরোহী হল 'সা গ ম প নি র্সা—র্সা নি প ম গ সা')। কিছুক্ষণ গাইবার পরে, চারি দিক মেঘে ছেয়ে যায় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

ইনি শুধু অতি উচ্চস্তরের গায়ক তথা সংগীত রচয়িতাই ছিলেন না, অতি উত্তম বীণা ও বেহালা বাদকও ছিলেন। ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রেও এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেও ইনি উল্লেখযোগ্য উন্নতি বিধান করেছেন। ইনি অসংখ্য কীর্তন, কৃতি, জাতি, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। ১৮৩৫ সালে দীপাবলীর দিন এই মহান সংগীতসাধকের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ রজা

(১৮শ শতাব্দী)

পাটনার নবাব মহম্মদ রজা একজন উচ্চস্তরের সংগীতবিদ্বান ছিলেন। ১৮১৩ সালে ফার্সী ভাষায় 'নগমাতে আসফি' নামে ইনি একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইনি প্রাচীন রাগ-রাগিণী ব্যবস্থাকে সমতাহীন ও অবৈজ্ঞানিক বলে, সেগুলির নানা ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইনিই প্রথম বিলাবলকে শুদ্ধ থাট নিশ্চিত করে 'হনুমন্মতের' রাগ-

রাগিণীর নামে নবীন স্বরবিন্যাস রচনা করেছেন। এঁর রচিত থাট পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ রূপেই হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতির সৃষ্টি বলা যায়।

এঁর জন্ম ও মৃত্যুর স্থান, কাল প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

সবাই প্রতাপ সিং
(১৮শ শতাব্দী)

জয়পুরের মহারাজা সবাই প্রতাপ সিং (১৭৭৯-১৮০৪ খৃঃ) একজন উচ্চস্তরের সংগীতবিদ্বান ছিলেন। সংগীতের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বিরাট এক সংগীত-সম্মেলনের আয়োজন করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে একত্রিত করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে সংগীতের শাস্ত্রগত ও ক্রিয়াত্মক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পূর্ব প্রচলিত ধারার সংস্কার সাধনের প্রয়াসে 'সংগীতসার' নামে উত্তর-ভারতীয় সংগীতের একখানি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইনিও বিলাবলকে শুদ্ধ থাট রূপে নিশ্চিত করে জন্য-জনক রীতিতে রাগ-বর্গীকরণ করেছেন। এঁর জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক তথ্যাদি জানা যায় নি।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস
(১৮শ শতাব্দী)

পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সম্বন্ধেও সঠিক তথ্যাদি বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আনুমানিক ১৮৪২ সালে 'সংগীতরাগকল্পদ্রুম' নামে একখানি বিশাল গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। ওই গ্রন্থে নানাবিধ সাংগীতিক উপাদানাদির বর্ণনা এবং তৎকালীন প্রচলিত সহস্রাধিক ধ্রুপদ, খেয়ালাদি গান রাগ ও তাল নামসহ প্রকাশিত হয়েছে।

গোলাম নবী (শোরীমিঞা)
(১৮শ শতাব্দী)

১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রসিদ্ধ টপ্পাগায়ক গোলাম নবীর জন্ম হয়। এঁর পিতা গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌর নবাব আসফউদ্দৌলার (১৭৭৫-১৭৯৭ খৃঃ)

সভাগায়ক ছিলেন। তিনি অতিগুণী গায়ক-শিল্পী তথা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। অতি সামান্য কারণে তিনি দরবার ত্যাগ করেছিলেন, (গোলাম রসুল দ্রষ্টব্য)।

সেই বিপ্লবী শিল্পীর সকল গুণই উত্তরাধিকারসূত্রে গোলাম নবী পেয়েছিলেন। তবে এঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত চটুল প্রকৃতির, তাই ধ্রুপদ বা খেয়াল আদি গানের উপযোগী ছিল না। তখনকার দিনে পাঞ্জাবী টপ্পা গান ছিল নিম্নস্তরের, কিন্তু ইনি এইসব গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংস্কারসাধনে লিপ্ত হন। কিছুকালের মধ্যেই ইনি স্বরচিত টপ্পাগান উচ্চাঙ্গসংগীতাসরে পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন, এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর তথা গায়কীর গুণে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। টপ্পার সংস্কারক ও প্রচারক হিসাবে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় অনেকে এঁকেই টপ্পা গানের স্রষ্টা বলে ভুল করেন।

পিতার কাছে ছাড়া, রামপুরের প্রসিদ্ধ বাহাদুর সেনের কাছেও ইনি তালিম পেয়েছেন। এঁর রচিত সকল গানেই 'শোরী' শব্দটি পাওয়া যায়। এটি নাকি এঁর স্ত্রী'র (প্রেমিকা ?) নাম। এইজন্য অনেকে এঁকে শোরী মিঞাও বলে থাকেন।

গম্মু নামে এঁর এক শিষ্য ছিল, কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে নিঃসন্তান গোলাম নবীর মৃত্যু হয়।

ভোলা ময়রা
(১৮শ শতাব্দী)

১৮শ শতকের শেষের দিকে, কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে রামগোপাল মোদকের পুত্র ভোলানাথ মোদকের (ভোলা ময়রা) জন্ম হয়। সেই দিনে বিখ্যাত কবিয়াল হারুঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ভোলা ময়রা ও রাম বসুর কবিগানের লড়াই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নানা উৎসবাদিতে গীতিকবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর সহযোগে কবিগান করা হত। এই গানে ভোলা ছিলেন অদ্বিতীয়। হিন্দি, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি সাহিত্যেও এঁর চলনসই জ্ঞান ছিল। হিন্দু পুরাণ তথা ধর্মশাস্ত্রাদির আখ্যানসমূহ সম্বন্ধেও ইনি যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন।

ইনি প্রায় ৭৩ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু এঁর জন্ম, মৃত্যুর স্থান কাল প্রভৃতি

সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এঁরই নাত-জামাই নবীনচন্দ্র দাস ১৮৬৩ সালে বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি রসোগোল্লা উদ্ভাবন করেন।

এণ্টনি ফিরিঙ্গী

(১৮শ শতাব্দী)

সুপ্রসিদ্ধ পর্তুগীজ কবিয়াল এণ্টনি ফিরিঙ্গী জাতিতে খৃষ্টান হলেও হিন্দু-ভাবাপন্ন এবং কালীমায়ের পরম ভক্ত ছিলেন। এঁর জন্ম-মৃত্যুর সময়কাল বা স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে ইনি ভোলা ময়রার সমকালীন ছিলেন। এঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক বাঙালি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন।

ভোলা ময়রা ও এঁর কবির লড়াই শুনতে তখন বহু দূর-দূরান্ত থেকে জনসমাগম হত। বয়স এবং অভিজ্ঞতায় অনেক বড়ো হলেও ভোলাকে একবার ইনি অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের কয়েকটি উক্তি আজও মুখে মুখে বেঁচে আছে। যেমন,

সাহেব মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
তোর পাদ্রীসাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চুনকালি।

তবে ভোলাকে ইনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন সেকথা এর উক্তিতে বোঝা যায়। উত্তরে ইনি বলেন

খৃষ্ট আর কৃষ্টতে কিছু ভেদ নাই রে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই
... ইত্যাদি।

এঁর সম্পর্কে নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। বউবাজার ষ্ট্রীটের কালীবাড়ি নাকি এঁরই প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ইনি সিদ্ধি তথা দর্শন লাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

দাশরথি রায়
(১৯শ শতাব্দী)

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে বাঁদমুড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পাঁচালি গায়ক দাশরথি রায় (দাশুরায়) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি পীলা গ্রামে, মাতুলালয়ে পালিত হন এবং অল্প কিছু বাংলা ও ইংরাজি শিক্ষা করে কোম্পানির নীলকুঠিতে চাকরি নেন। ইনি রাঢ়িশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সংগীতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

উক্ত গ্রামে অক্ষয়া পাটনী নামে এক স্ত্রী-কবিয়াল কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর নারী বাস করত, যার দলে ইনি যোগদান করেন। তবে আত্মীয়স্বজনের বিরূপতায় সেই দল ত্যাগ করে সঙ্গীদের নিয়ে নিজেই একটি দল গঠন করেন। এঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্য অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হন। ক্রমে ইনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচালি গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইনি প্রায় ৬০টি পালাগান রচনা করেছেন। ১৮৫৭ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

বাহাদুর সেন
(১৯শ শতাব্দী)

১৯শ শতকের প্রারম্ভে তানসেন বংশীয় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ রবাব, সুরশৃঙ্গার ও বীণার অদ্বিতীয় সাধক বাহাদুর সেনের জন্ম হয়। ইনি অসাধারণ সংগীত-প্রতিভার অধিকারী এবং জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ প্রমুখ অতিগুণী মাতুলদের উত্তরাধিকারীরূপে সংগীত বিদ্যা লাভ করেছিলেন। প্যার খাঁ ছিলেন অকৃতদার তাই তিনি এঁকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং উত্তমরূপে সংগীত-শিক্ষাদান করেন। অল্প বয়সেই ইনি উচ্চশ্রেণীর কলাকাররূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান এঁর বেশি ছিল না, কিন্তু সাধনালব্ধ ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় ইনি শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতেন।

একবার কাশীতে এক বিরাট সংগীত সম্মেলন আয়োজিত হয়। শর্ত ছিল সকলকেই সেখানে বেহাগ রাগ পরিবেশন করতে হবে। বহু গুণীর পরে এঁর

সুযোগ আসে। ইনি দুই ঘণ্টাকাল বেহাগ রাগের আলাপ করে সমবেত গুণীজন তথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন এবং শ্রেষ্ঠ কলাকাররূপে অভিনন্দিত হন। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ইনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন।

বহু শিষ্যকে ইনি রবাব, সুরশৃঙ্গার, বীণা তথা কণ্ঠসংগীত শিক্ষা দিয়েছেন। সাধারণ ওস্তাদদের মতো ধন সম্পত্তির প্রতি এঁর কোনো আসক্তি ছিল না। পরিণত বয়সে ইনি রামপুরের নবাব কলবে আলী খাঁ'র সভা-সংগীতজ্ঞ ছিলেন। শোনা যায়, নবাবের ভ্রাতা নবাব হৈদরআলী খাঁ সেনী ঘরাণার সম্পূর্ণ তালিম গ্রহণের জন্য এঁকে একলক্ষ মুদ্রা দেন। ইনি তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে পূর্ণ তালিম দেবার পরে সেই লক্ষমুদ্রা ফেরত দিয়ে বলেন যে, 'বিদ্যা অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায় না। এতদিন এই অর্থ শুধু পরীক্ষার্থে রেখেছিলাম, এতে আমার প্রয়োজন নেই।'

ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই বালক উজীর খাঁ'কে নিজের সন্তানের মতো শিক্ষাদান করেন। এছাড়া এঁর শিষ্যদের মধ্যে ইনায়েত খাঁ (সেতার), আলীহোসেন (বীণা), বুনিয়াদ-হোসেন (ধ্রুপদ, খেয়াল), গোলাম নবী (শোরী), মজরু খাঁ (সরোদ), পান্নালাল বাজপেয়ী (সেতার), মহম্মদ হোসেন (বীণা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯শ শতকের শেষের দিকে এঁর মৃত্যু হয়।

স্বাতি তিরুনল
(১৯শ শতাব্দী)

১৮১৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ত্রিবাংকুরের মহারাজা রাজারাজা ভর্মা ও রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের পুত্র মহারাজা স্বাতি তিরুনলের জন্ম হয়। এই রাজপরিবারের প্রথানুযায়ী জন্মনক্ষত্র অনুসারে এঁর এই নামকরণ হয়। মাত্র দুই বছর বয়সে ইনি মাতৃহারা হন। ১৮২৯ সালের ২০শে এপ্রিল ইনি সিংহাসনে আরোহন করেন। অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভার অধিকারী তিরুনল অল্প বয়সেই সংস্কৃত, ফার্সী, কানাড়ি, তেলেগু, মলয়ালম, মারাঠি, হিন্দী, উর্দু, ইংরাজী প্রভৃতি সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানার্জন করেন। সংগীতজ্ঞ, শিল্পী ও স্রষ্টা হিসাবে ইনি ছিলেন অতুলনীয়। সমুদ্রগুপ্ত, নান্যভূপাল, রাজা ভোজ, রাজা কুম্ভকর্ণ,

রাজা রঘুনাথ, মহারাজা শাহজী, তুলজাজী প্রমুখ যাবতীয় রাজবংশীয় সংগীতজ্ঞ-দের মধ্যে ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। ইনি ভারতীয় ছয়টি ভাষায় এমন অসংখ্য সুন্দর ও সুললিত সংগীত রচনা করেছেন, যা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বিরল।

ইনি অসংখ্য কৃতি, বর্ণ, কীর্তন (রামায়ণ তথা ভগবৎ বিষয়ক) প্রভৃতি রচনা করেছেন। প্রতিটি রচনাই এক একটি স্বকীয়তাপূর্ণ আদর্শ বিশেষ। এঁর কতগুলি রচনা তো সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ তথা সমাদৃত হয়েছিল।

এঁর দরবারে বহু উচ্চশ্রেণীর সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ইনি পরমভক্ত সংগীতজ্ঞ মহাপুরুষ ত্যাগরাজের প্রত্যক্ষ শিষ্য কন্নিয়া ভগবতের কাছে ত্যাগরাজের বহু রচনা শুনেছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৮৪৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এই সংগীতজ্ঞ মহারাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অমৃত সেন
(১৯শ শতাব্দী)

১৮১৩ সালে তানসেন বংশীয় তথা মসীদ খাঁর ঘরাণার প্রসিদ্ধ সেতার বাদক রহিম সেনের পুত্র অমৃত সেনের জন্ম হয়। ইনি অসাধারণ সংগীত-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সংগীতময় পরিবেশে বর্ধিত হওয়ায় অল্প বয়সেই উচ্চস্তরের সেতারবাদকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সেতারবাদনের কলা-চাতুর্যে ইনি সাধনার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। সংগীত জগতে এঁর মতো জনপ্রিয়তা, যশ ও ধন আর কেহ অর্জন করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। এঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল। আজও জয়পুরের সেতারীরা নিজেদেরকে অমৃত সেনের ঘরাণার বাদক বলে গর্ববোধ করেন।

ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ তথা কোমল ও অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। এঁর কোনো প্রকার বিলাসপ্রবণতা ছিল না। কঠোর সাধনা তথা সাধকোচিত জীবন যাপন করতেন।

জয়পুরের মহারাজা রামসিংহের দরবারে নিযুক্ত হওয়ার পরে ইনি ক্রমাগত আটদিন রাত্রিকালে কল্যাণ রাগ শুনিয়েছিলেন। অষ্টম দিনে দেওয়ান ফতে-সিংহ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কি কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো রাগ জানেন না ? উত্তরে মহারাজ বলেন যে ইনি একই রাগ রোজ নতুন নতুন রূপে

পরিবেশন করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন, এই কার্য যে কতখানি সাধনাসাপেক্ষ এবং প্রতিভার পরিচায়ক সে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই।

নবম দিনে ইনি অন্য একটি রাগ বাজালে মহারাজ প্রশ্ন করেন যে, ওস্তাদজী আজ কল্যাণ রাগ বাজালেন না কেন? উত্তরে ইনি বলেন যে, মহারাজ, আমি তো একমাস ধরে আপনাকে কল্যাণ রাগ শোনাবো ভেবেছিলাম কিন্তু দরবারের কিছু কিছু অরসিক ব্যক্তির উক্তি শুনে আজ আমি রাগ বদল করেছি।

ঝাঝর নগরে থাকাকালীন একজন বাঙালি যুবক এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন এঁর বাজনা শুনে সে এমন প্রভাবিত হয় যে বার বার বলতে থাকে যে, 'হায় হায়, আমি কোনোদিন ওইরকম বাজাতে পারবো না'। এবং কিছুদিনের মধ্যে সে পাগল হয়ে যায়। এই ঘটনায় অমৃত সেন অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং বহুদিন সেতার শেখানো বন্ধ রাখেন।

মহারাজ রামসিংহের মৃত্যুর পরে ইনি দিল্লী যান, সেখান থেকে আলবরের মহারাজা শিবদান সিংহ এঁকে তাঁর সভায় নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে ইনি জয়পুরে চলে যান এবং সেখানে ১৮৯৩ সালে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
(১৯শ শতাব্দী)

১৮১৩ সালে, বিষ্ণুপুরে, রাধাকান্ত গোস্বামীর পুত্র প্রখ্যাত সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্যের শিষ্য এবং বিখ্যাত যদুভট্টের গুরুভ্রাতা। রামশংকরের পিতা গদাধর ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অতি বড়ো পণ্ডিত এবং তানসেনের পুত্রবংশীয় বাহাদুর খাঁ'র শিষ্য। রামশংকরের প্রধান গুরু ছিলেন আগ্রা-মথুরা অঞ্চলের এক পণ্ডিতজী।

গুরুর অনুমতিক্রমে ৩৫ বছর বয়সে ক্ষেত্রমোহন কলকাতায় আসেন এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক রূপে নিযুক্ত হন। ক্ষেত্রমোহন সংগীতের ক্রিয়াত্মক ও শাস্ত্রগত উভয় বিষয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া বাংলা হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যেও ইনি যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে ইনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ইনিই সর্বপ্রথম ঐক্যতান

(কনসার্ট) গঠন করেন। প্রণালীবদ্ধ সংগীততত্ত্বের আলোচনাতেও এঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়। সৌরীন্দ্রমোহনের সহযোগিতায় ইনি সংগীতলিপির-উদ্ভাবন করেন। স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তক হিসাবে তাই ইনিই স্বীকৃত। এঁর রচিত 'কণ্ঠকৌমুদী', 'সংগীতসার' আদি গ্রন্থ এঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় দেয়। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের অনেক পদাবলী ইনি স্বকীয় সংগীতলিপি-সহ প্রকাশ করেন। ১৮৭২ সালে ২৫টি পদাবলী নিয়ে 'গীতগোবিন্দের সংগীতলিপি' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ; যার সাহায্যে প্রাচীন প্রবন্ধগানের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। রামশংকর সম্ভবত তাঁর গুরুর কাছে এই গানগুলি শিখেছিলেন এবং এঁকে শিখিয়েছিলেন। এছাড়া বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক গান ইনি রচনা করেছেন।

এঁর শিষ্য সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় পৃথিবীজোড়া সুনাম অর্জন করেছিলেন। এছাড়া মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন শিষ্য ছিল। 'বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক' এঁকে 'সংগীতনায়ক' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। ১৮৯৩ সালে এই মহান প্রতিভার মৃত্যু হয়।

কুদ্দ্ সিং
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮১৫ সালে উত্তর প্রদেশের বাঁদাউ নামক স্থানে প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ বাদক কুদ্দ্ সিংয়ের জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ছিল গপ্পে বা গুপ্ত সিং। ইনি তৎকালীন প্রখ্যাত ভগবান সিংয়ের (দাসজী) কাছে মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা করেন।

সেই দিনে লক্ষ্ণৌর শাসক নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এবং গোয়ালিয়রের মহারাজ জয়জীরাও অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁদের দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞেরা স্থান পেয়েছিলেন। একবার ওয়াজেদ আলীর দরবারে পাখোয়াজ বাদন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তখন নবাব এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীকে এক হাজার মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেই প্রতিযোগিতায় তৎকালীন

শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী জোতসিংহকে পরাজিত করে ইনি শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-বাদক বলে স্বীকৃত হন। নবাব এঁর সংগীতকলায় মুগ্ধ হয়ে পুরস্কারের সঙ্গে এঁকে 'কুঁবরদাস' উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

এঁর সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত। একবার প্রসিদ্ধ সুরশৃঙ্গার বাদক হুসেন খাঁ'র সঙ্গে এঁর এক অবিস্মরণীয় প্রতিযোগিতা হয়। দ্রুতলয়ে প্রায় বারো ঘণ্টা বাজানোর পরে হুসেন খাঁর আঙুল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়। তখন নবাব স্বয়ং উভয়ের যন্ত্রের উপরে হাত রাখেন, কিন্তু কুদ্‌ সিং অবশিষ্ট রাত সেই লয়েই পাখোয়াজ বাজাতে থাকেন। তানসেনের বংশধর প্রসিদ্ধ সেতারী অমৃতসেনের সঙ্গেও নাকি একবার এঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

ইনি প্রায় একহাজার পরণ রচনা করেন। এঁর রচিত 'গজপরণ' এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শোনা যায়, পরীক্ষার্থে একবার এঁর সামনে হাতি ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এই অদ্ভুত 'গজপরণ' বাজানোর ফলে হাতি পালিয়ে যায়।

কিছুকাল পরে ইনি গোয়ালিয়রে যান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। মহারাজা জয়জীরাওয়ের দরবারে ইনি আশ্রয়লাভ করেন। কিন্তু 'অহংকারীর পতন অনিবার্য' এই প্রবাদই সত্য হয়। দৈব দুর্বিপাকে একদিন দরবারের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে গানের 'সম' নির্ণয়ে অসমর্থ এবং সর্বসমক্ষে অপমানিত হন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইনি দতিয়া যান এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ এবং কিঞ্চিৎ উগ্র প্রকৃতির অথচ দয়ালু ছিলেন। এঁর অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আজমগড়ের অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক মদনমোহন 'সিতারেহিন্দ' এবং টিকমগড়ের হরচরণলাল ভল্লী উল্লেখযোগ্য।

আনুমানিক ১৮৮০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

ওয়াজিদআলী শাহ (অখতর পিয়া)
(১৯শ শতাব্দী)

১৯শ শতকের গোড়ার দিকে লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদআলী শাহের জন্ম হয়। ইনি ১৮৪৭ সালে সিংহাসন লাভ করেন এবং ১৮৫৬ সালে

ব্রিটিশ সরকার এঁকে অযোগ্য বলে পদচ্যুত করে বারো লক্ষ টাকা পেনসন দিয়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। মাত্র ৯-১০ বছর রাজত্বকালের মধ্যেই ইনি যেমন বহু বিচিত্র আনন্দোৎসবাদিতে জীবন-যাপন করেছেন তা কবি ও সাহিত্যিকেরা শুধুমাত্র কল্পনাই করতে পারেন।

এঁর মতো কলাপ্রেমী, শৌখিন, মেজাজী ও পরম রসিক, হিন্দু ও মুসলমান রাজা-মহারাজাদের মধ্যে কেহ হয়েছেন কিনা সন্দেহ। সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের ইনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইনি মনেপ্রাণে ছিলেন অতি উচ্চস্তরের শিল্পী। স্বয়ং অতি গুণী-গায়ক তথা রচয়িতা ছিলেন। 'অখতরপিয়া' ছদ্মনামে ইনি বহু গীত রচনা করেছেন। এঁর সংগীত সভাকে টপ্পা, ঠুংরি আদি গীতরীতি উৎকর্ষের পীঠস্থান বলা যায়। নৃত্যকলাতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় নর্তক। তৎকালীন প্রসিদ্ধ নর্তক কহ্হৈয়া এঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্ণৌর কেসরবাগে ইনি বিরাট এক ভবন নির্মাণ করেছিলেন, যাতে ৩৬০টি নাট্যশালা ছিল। হোলি উৎসবে ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ এবং নাট্যশালার অভিনেত্রীদের গোপীগণ সাজিয়ে নৃত্যক্রীড়া করতেন। সেই উৎসবে, প্রতি বছর, শুধু আবীর, রঙ প্রভৃতিতেই দশহাজার টাকা ব্যয় হত। মাঝে মাঝে এঁর রাজসভায় 'সংগীত ইন্দ্রসভা' নাট্যোৎসব হত, যাতে ইনি স্বয়ং ইন্দ্র এবং অভিনেত্রীরা বহু বিচিত্র সাজে পরী ও নর্তকীদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন সকালে সেই চরমপত্র এলো। ইনি অবিচলিতচিত্তে রাজসভায় গেলেন এবং সিংহাসনে বসে ভৈরবী রাগের প্রসিদ্ধ সেই "বাবুল মোরা নৈহর ছুটো যায়" গানখানি গেয়ে সকলকে সংবাদটি দিলেন।

কলকাতা আসার সময়ে ইনি অনেক প্রিয় গায়ক ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং শিল্পোচিত জীবনযাপন করেন। ১৮৮৭ সালে কলকাতাতেই এঁর মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী

(১৯শ শতাব্দী)

১৯শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ all-rounder বাঙালী সংগীতশিল্পী লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় জানা যায় না। এমনকি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হওয়ায় এঁর পদবীটিও হারিয়ে গেছে। এঁর মতো শক্তিধর সংগীতজ্ঞ শুধু বাংলা দেশেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষেও দুর্লভ। ইনি ছিলেন একাধারে খেয়াল গায়ক ও ধ্রুপদী ; ঠুংরী ও টপ্পা গানে পারদর্শী ; উত্তম বীণকার, সেতার বাদক ও এস্রাজী। আবার উত্তম তবলা বাদক ও পাখোয়াজী। এঁর সকল গুণের মধ্যে ধ্রুপদীর পরিচয়ই ছিল বড়ো।

বাল্যকালে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মতো ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাটান জীবনের অনেকখানি। তাই 'বাবাজী' কথাটি এঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে জানা অজানা বহু ওস্তাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন অনেক বাধাবিঘ্ন ও কষ্ট সহ্য করে। সংগীত শিক্ষায় তাঁর কোনো অভিমান বা সংকোচ ছিল না। যেখানে যার কাছে ভালো কিছু আছে জেনেছেন, তাঁর কাছেই গেছেন, তা সে বয়সে বা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর চেয়ে যত ছোটোই হোক না কেন।

এঁর প্রধান গুরু ছিলেন পশ্চিমের এক সন্ন্যাসী পাখোয়াজী ও ধ্রুপদী। তাঁর নাম ঠাড়িদাস। তিনি অনেক সময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কাজ করতেন বলেই নাকি এই নামকরণ। ঠাড়িদাস অনেক তীর্থ পর্যটন করতেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। তাঁর কাছে ইনি পাখোয়াজ ও ধ্রুপদ শিখেছিলেন। অবশ্য ইনি বহু গুণীর কাছে তালিম পেয়েছেন যার মধ্যে রামকুমার মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, হৈদর খাঁ, রমজান খাঁ, শ্রীজানবাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বীণা, সেতার, এস্রাজ, তবলা প্রভৃতি ইনি কাশীতে শিখেছিলেন, তবে কার কার কাছে সেকথা জানা যায় না। কলকাতায় এসে ইনি বাবু খাঁর কাছেও তবলা শিক্ষা করেছিলেন।

সাধারণত ইনি ধ্রুপদ গাইতেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে আরম্ভ করে কলকাতার অনেক বড়ো বড়ো আসরে এঁর আমন্ত্রণ হত। তৎকালীন সংগীতজগতে ইনি

ছিলেন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি। এঁর গানের সঙ্গে কেশব মিত্র, বসন্ত হাজরা, মুরারী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিবাংলার শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীরা সঙ্গত করেছেন। কেশববাবু অনেকবার নিজের বাড়িতে আসর করেছেন এঁর সঙ্গে বাজাবার জন্য। অন্যান্য যন্ত্রে ইনি কেমন দক্ষ ছিলেন সেকথা নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে জানা যায়। যেমন, বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ-আলীর সঙ্গে ইনি সঙ্গত করেছেন। এবং নানা আসরে নানাবিধ যন্ত্র- সংগীতা নুষ্ঠান করেছেন।

অনেক বাঙালী গুণীদের মতো ইনিও ছিলেন অপেশাদার। কিন্তু এঁর জীবনের অবলম্বন ছিল সংগীত। এঁর গুণগ্রাহী শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষকেরা তাই এঁর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। পাইকপাড়ার পূর্ণচন্দ্র সিংহ, ঠাকুরবাড়ির যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন প্রমুখেরা এঁকে মাসিক বৃত্তি দিতেন।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাতকড়ি মালাকর, শরৎচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ রায়, লালমোহন বসু, ব্রজজীবন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন।

কলকাতাতেই এঁর মৃত্যু হয়, সম্ভবত ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

কেশবচন্দ্র মিত্র
(১৯ শতাব্দী)

১৯শ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের মিত্র বংশে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় অগ্রজ। সেকালের অনেক বাঙালী গুণীর মতো ইনি ছিলেন অপেশাদার। বরং নিজেই খরচ করে ওস্তাদদের বাড়িতে এনে রাখতেন, সঙ্গত করার জন্য। পশ্চিম থেকে কোনো ওস্তাদ এসেছেন অথচ কেশব বাবুর বাড়িতে আসর হয় নি, এমন বড়ো একটা ঘটত না। ভারত বিখ্যাত মুরাদ আলীর মতো গুণীকেও ইনি ছ'মাস তাঁর বাড়িতে রেখেছিলেন তাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্য। এঁর মতো উচ্চশ্রেণীর পাখোয়াজী এদেশে জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

ইনি ছিলেন ঠনঠনিয়ার শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য, যিনি লক্ষ্ণৌ নিবাসী লালা কেবল কিষণ ও লালা হরিকিষণের শিষ্য ছিলেন। রামচন্দ্র কেমন দরের গুণী ছিলেন সেকথা তাঁর শিষ্যবর্গ থেকে বোঝা যায়। বাংলার প্রখ্যাত পাখোয়াজীরা প্রায় সকলেই এঁর শিষ্য-পরম্পরা-শ্রেণীভুক্ত। তৎকালীন বিখ্যাত মুরারীমোহন গুপ্ত, দুর্লভ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ দে, নিতাই চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী, সত্যচরণ গুপ্ত প্রমুখ মৃদঙ্গাচার্যেরা সকলেই এঁর শিষ্য ছিলেন।

কেশববাবুর কোনো সার্থক শিষ্য নেই। শোনা যায় বিখ্যাত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে কিছুদিন এঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, পরে তিনি দীননাথ হাজরার কাছে চলে যান। এছাড়া বিহারী মিশ্র নামে একজন অনেকদিন এঁর কাছে যাতায়াত করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি।

মুরারীমোহন গুপ্ত
(১৯শ শতাব্দী)

শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য মুরারীমোহন গুপ্ত অতি গুণী পাখোয়াজী ছিলেন। যত জ্ঞান বা বোলের সংগ্রহ এঁর ছিল ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গতকার হিসাবে তেমন কৃতী ছিলেন না। তবে ইনি শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পরে সকলের শিক্ষাভার ইনিই গ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত পাখোয়াজী গোপালচন্দ্র মল্লিক, সত্যচরণ গুপ্ত, দুর্লভ ভট্টাচার্য, আনন্দনারায়ণ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ দে, নিতাই চক্রবর্তী, চারুচরণ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ এঁর শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে সত্যচরণ গুপ্ত অত্যন্ত খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

সত্যচরণ গুপ্ত
(১৯শ শতাব্দী)

সত্যবাবু অতি গুণী পাখোয়াজী তথা অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও সত্যবাদী ছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়, যা এখানে বলা সম্ভব নয়।

তবে এঁর গুণপনা সম্বন্ধে একটি ঘটনা না বললেই নয়। কারণ আগেকার গুণীদের পরিচয় শুধুমাত্র বিভিন্ন সংগীতের আসরের ঘটনার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

উত্তর জীবনে ইনি কাশীবাসী হয়েছিলেন, ঘটনাটি সেই সময়ের। আসরটি হয়েছিল কাশী রাজদরবারে দেশীয় নৃপতিদের একটি সম্মেলন উপলক্ষে। সেই আসরের প্রধান গায়ক ছিলেন গোয়ালিয়রের দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী গুরুবালাজীরাও (হদ্দু খাঁর শিষ্য)। তাল ও লয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও কুট এবং গুণে ও বয়সেও অতি প্রবীণ। সেই বয়সেও তিনি দাপটের সঙ্গে গাইতে পারতেন। গুরুজী সেই আসরে রাগমালা গেয়েছিলেন। যার প্রতিটি রাগ বিভিন্ন তালে গেয়ে তিনি অসাধারণ গুণপনা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু বিপদ হয়েছিল সঙ্গতকারদের নিয়ে। কারণ কেহই তাঁর সঙ্গে বাজাতে পারছিলেন না। কাউকে একবার জুৎমতো ধা মারতে শোনা গেল না। শ্রোতা ও গায়ক সকলেরই সেকথা মনে হচ্ছিল। গায়ক তো কাজেই সেকথা প্রকাশ করতে লাগলেন। একজন দুজন নয়, কাশীর বিখ্যাত পাখোয়াজীরা একের পর এক তাঁর সঙ্গে বাজাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়লেন। তখন উদ্যোক্তাদের একজন সত্যবাবুকে বাজাবার জন্য অনুরোধ করলেন। যদিও সেখানে এঁর বাজানোর কথা ছিল না, কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। নতুন করে পাখোয়াজে সুর মিলিয়ে বাজাতে বসলেন। এতক্ষণ পরে সত্যকার সঙ্গতের পরিচয় পেয়ে গায়ক এবং শ্রোতরা সকলেই চমৎকৃত হলেন। সেই আসরে অসাধারণ লয়কারী ও দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গত করে সকলকে মুগ্ধ তথা বাংলার গৌরববৃদ্ধি করেছিলেন সত্যবাবু।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নুলো গোপাল)
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৩০ সালে বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়কদের অন্যতম গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম হয়। এঁর বংশ পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। ইনি অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুপুরুষ ছিলেন, তবে হাত দুটি অপেক্ষাকৃত ছোটো হওয়ায় ইনি 'নুলো গোপাল' নামে পরিচিত হন।

ইনি অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা তথা অত্যন্ত সুমধুর ও লালিত্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন অঙ্গের গানেই ইনি সমান পারদর্শী ছিলেন। স্রষ্টাশিল্পী হিসাবে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর গানে একটি নিজস্ব শৈলী ছিল। গানের মাঝে মাঝে তরাণা, সরগম ইত্যাদি বিবিধ অলংকার, হঠাৎ এমনভাবে প্রয়োগ করতেন, যে আসরের সকলেই অবাক মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

সেই দিনে হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের সঙ্গে একই আসরে সমান মর্যাদায় বহুবার ভারতের বহুস্থানে ইনি সংগীত পরিবেশন করেছেন। বাঙালী গায়কদের মধ্যে এঁর তুল্য খ্যাতিমান আর কেউ হয়েছেন কিনা সন্দেহ। ইনি ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক এবং তাঁরই আনুকুল্যে ইনি পশ্চিমাঞ্চল থেকে রীতিমত সংগীতশিক্ষা করে আসেন। এর প্রধান গুরু ছিলেন বারাণসীর বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া গোপালপ্রসাদ মিশ্র। এছাড়া ইনি হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁর কাছে শিখেছিলেন খেয়াল। সেই যুগে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো প্রতিভাবান গুণী এবং প্রসিদ্ধি সমগ্র ভারতবর্ষে বেশি ছিল না। গোপাল-চন্দ্র ছাড়া অন্য কোন বাঙালীকে তাঁরা শিক্ষাদান করেন নি।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে আলাউদ্দীন খাঁ, সাতকড়ি মালাকর (অন্ধগায়ক), লালচাঁদ বড়াল, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), রামতারণ সান্যাল, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গোপালবাবুর শিক্ষাপদ্ধতি যে অত্যন্ত কঠোর ছিল সেকথা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বিবৃতিতে জানা যায়। যেমন এক পায়ে তাল, অন্যপায়ে মাত্রা, এক হাতে তানপুরা এবং অন্যহাতে তবলা। এঁর নির্দেশে খাঁ সাহেব এই পদ্ধতিতে রেওয়াজ করতেন। ইনি খাঁ সাহেবকে সাত বছর সরগম ও পালটি শেখান।

শেষ বয়সে এঁর গলা চাপা ও ঝিম-ধরা হয়েছিল। এঁর এক ছাত্র নাকি আক্রোশবশে পানের সঙ্গে সিঁদুর ও পারা খাইয়ে এঁর গলার চরম ক্ষতিসাধন করেছিল। ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

বন্দেআলী খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৩০ সালে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ বীণকার এবং কিরাণা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ বন্দেআলী খাঁর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন উত্তর ভারতের পেশাদার সংগীতজ্ঞ 'ধারী' সম্প্রদায়ের গুণী। এঁর পিতা গোলাম জাকির খাঁ'ও অতি উচ্চস্তরের গুণী ছিলেন।

ইনি তানসেনের কন্যাবংশীয় (বীণকার) নির্মল শাহের শিষ্য ছিলেন। ইনি যেমন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, এই ঘরানার একমাত্র আব্দুল করিম খাঁ তেমন সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক হদ্দু খাঁ'র কন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। গোয়ালিয়র, জয়পুর, ইন্দোর প্রভৃতি রাজদরবারে ইনি অবস্থান ও কলাপ্রদর্শন করেছেন। অতি উচ্চস্তরের গুণী হলেও এঁর বিচিত্র স্বভাবের জন্য কোথাও বেশি দিন থাকতে পারতেন না। তবে শোনা যায় ইন্দোর দরবারেই ইনি অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

একবার গোয়ালিয়রের মহারাজা এঁর বাদনে মুগ্ধ হয়ে এঁকে ইচ্ছামত পুরস্কার প্রার্থনা করতে বলেন। ইনি তখন সেই দরবারের প্রসিদ্ধ গায়িকা সুন্দরী চুন্না বাঈকে প্রার্থনা করেন। এইরূপে এঁর দ্বিতীয় বিবাহ (নিকা) হয়।

এঁর দুই কন্যা। উদয়পুরের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ জাকিরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁ'র সঙ্গে এই দুই কন্যার বিবাহ হয়। এঁর শিষ্যদের মধ্যে আছেন—আবদুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণা), ইমদাদ খাঁ (ঘরাণার স্রষ্টা), ওয়াহিদ খাঁ (বীণকার), চুন্না বাঈ (দ্বিতীয় পত্নী), জোহরা বাঈ, ভাইয়া সাহেব গণপত রাও ও ভ্রাতা বলবন্ত রাও (এঁরা গোয়ালিয়রের চন্দ্রভাগা বাঈয়ের পুত্র), মঙ্গলু খাঁ ও তৎপুত্র, মুরাদ খাঁ (সেতার), রজবালী (ধ্রুপদ, খেয়াল ও বীণা), রহিম খাঁ (বীণ), শম্মু, হৈদর বক্স (সারেঙ্গী) ও জামালুদ্দীন প্রমুখ সংগীতাচার্যেরা।

আনুমানিক ১৮৯০ সালে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

বিন্দাদীন মহারাজ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৩০ সালে বিন্দাদীনের জন্ম হয়। পিতা দুর্গাপ্রসাদ এবং খুল্লতাত লক্ষ্ণৌ'র নৃত্য ঘরানার প্রবর্তক ঠাকুরপ্রসাদ। এঁদের পরিবারের সকলেই ছিলেন নৃত্যকুশলী। বিন্দাদীনের খুল্লতাত ভ্রাতা কালিকাপ্রসাদ। সেই দিনে কালিকা-বিন্দাদীন ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগলবন্দী নৃত্য ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিন্দাদীন মহারাজই কত্থক নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

শোনা যায় মাত্র বারো বছর বয়সে, নবাব ওয়াজিদআলী শাহের দরবারে, প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী কুদ্দু সিংহের সঙ্গে বিন্দাদীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যাতে ইনি লয়কারী আদি গুণপনায় প্রবীণ পাখোয়াজীকে বেসামাল করে তুলে-ছিলেন। সংগীতপ্রেমী এবং সংগীতবিশারদ বাদশাহ বালকের অসাধারণ লয়জ্ঞান ও ক্ষিপ্রতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হন এবং বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন।

বিন্দাদীন অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও সরল জীবনযাপন করতেন। ইনি শুধু নৃত্যবিশারদই ছিলেন না, ঠুংরী গানেও এঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইনি প্রায় দেড় হাজার ঠুংরী গান রচনা করেছেন বলে শোনা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বাঈজীরা তাঁর কাছে ঠুংরী গানের তালিম নিতে আসতেন। কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত গহরজান বাঈ এবং পাটনার জোহরা বাঈ তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। সারাজীবন মুসলমান বাদশাহের দরবারে থাকলেও এবং বাঈজীদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা করলেও ইনি স্বধর্মে চির-দিনই ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং চারিত্রিক নির্মলতাও ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯১৭ সালে নিঃসন্তান বিন্দাদীনের মৃত্যু হয়।

রামদাস সহায়
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৩০ সালে কাশীধামে পণ্ডিত রামদাস সহায় মহারাজের জন্ম হয়। কাশীনগরী বহু প্রসিদ্ধ তবলীয়ার জন্ম দিয়েছে, যার মধ্যে তবলার পাঁচটি মুখ্য ঘরানা হল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফরুকাবাদ, বেনারস ও মীরাট) বেনারস ঘরানার

প্রবর্তক রামদাস সহায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ, কিষন মহারাজ, সামতাপ্রসাদ প্রমুখ এই ঘরানারই উজ্জ্বল রত্ন।

দুই বছর বয়সেই ইনি এঁর কাকার তবলা নিয়ে বাজাতে চেষ্টা করতেন। বাড়ির সকলে শিশুর এই অদ্ভুত প্রচেষ্টায় বিস্মিত হন। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই এঁর কাকা এঁকে নিয়মিত শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং ৯-১০ বছর বয়সে ইনি পাকা তবলীয়ার মতো বাজাতে আরম্ভ করেন। সংযোগবশতঃ একবার ওস্তাদ মোদু খাঁ এঁর তবলা বাদন শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন এবং এঁর পিতার কাছে, এঁকে তালিম দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শোনা যায় মোদু খাঁর পত্নীর নানাবিধ তবলার বোল কণ্ঠস্থ ছিল এবং একবার যখন কার্যোপলক্ষে মোদু খাঁ কিছুকাল অনুপস্থিত ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী এঁকে পাঁচ শতাধিক বোল শিক্ষা দেন। দীর্ঘ বারো বছর একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে ইনি মেদু খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ওয়াজেদআলী শাহ লক্ষ্ণৌর নবাব হলে, সেই উপলক্ষে এক বিরাট সংগীত-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই জলসায় রামসহায়ও অংশগ্রহণ করেন। এবং সংগীতকলা প্রদর্শন করে সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। সেই জলসায় প্রসিদ্ধ কুদ্দু সিংহ এবং ভবানী সিংহও ছিলেন। তাঁরা এই যুবকের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে এবং হস্ত চুম্বন করে অভিনন্দিত করেন। নবাবও খুশি হয়ে এঁকে এবং মোদু খাঁকে মোতির মালা, স্বর্ণমুদ্রা, হাতি প্রভৃতি প্রচুর পুরস্কার দান করেন।

এর পরে কাশীতে ফিরে এসে ছোটো ভাই জানকীরামকে নৃত্য ছেড়ে তবলা শিখতে উৎসাহ দেন এবং স্বয়ং শিক্ষাদান শুরু করেন। পরবর্তীকালে জানকীরামও উত্তম তবলীয়া হয়েছিলেন। পিতা ও কাকার মৃত্যুর পরে ইনি সাধুর মতো জীবন যাপন করতেন। এঁর ভাইপো ভৈরব সহায়কে ইনি ছয় বছর বয়স থেকেই তবলা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, যিনি পরবর্তীকালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে ভৈরব সহায়, জানকীরাম, প্রতাপ, ভগতশরণ, রঘুনন্দন, যদুনন্দন এবং বৈজু'র নাম উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় 'বেনারস-বাজ' নামে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তা প্রকাশিত হওয়ার আগেই লুপ্ত হয়ে যায়।

১৯১৩ সালে অবিবাহিত এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

বাদল খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৩৪ সালে পাঞ্জাবের পানিপথ নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সারেঙ্গী-বাদক তথা সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী বাদল খাঁ'র জন্ম হয়। ইনি ছজ্জে খাঁ'র বংশধর এবং মাতার তরফ থেকে কিরাণা ঘরাণার প্রসিদ্ধ গায়ক আব্দুল করিম খাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। ফলে এঁর মধ্যে এই দুই গায়কীর সমন্বয় হয়েছে।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে সিংহাসন লাভের জন্য কিছুকাল অত্যন্ত গোলযোগ চলতে থাকে। ১৭১৯ সালে মহম্মদ শাহ বাদশাহ হবার পরে আবার রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। মহম্মদ শাহ বাদশাহ আকবরের মতোই গুণগ্রাহী এবং সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তাঁর দরবারে তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞেরা স্থান পেয়েছিলেন। মহম্মদ শাহ ন্যামৎ খাঁকে 'শাহ সদারঙ্গ' উপাধি দান করলে অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়, কারণ তাঁরা এই উপাধি দানকে পক্ষপাত-দুষ্ট আখ্যা দেন-এবং বহু সংগীতজ্ঞে দরবার ত্যাগ করে চলে যান ; তাঁদের মধ্যে ছজ্জে খাঁ ছিলেন অগ্রণী। এখনো অনেকের ধারণা ছজ্জে খাঁ'র ঘরানার থেকেই বর্তমানে প্রচলিত 'ফিরত খেয়াল' গীতরীতির উৎপত্তি। অবশ্য এবিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ ফৈয়াজ খাঁ'র 'আগরা ঘরানার' মতো ছজ্জে খাঁ'র ঘরানাও ছিল ধ্রুপদ অঙ্গের এবং সদারঙ্গের কাছ থেকেই নাকি 'খেয়াল' পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

ছজ্জে খাঁর পরে তাঁর পুত্র হৈদর খাঁকে দরবারী সংগীতজ্ঞরূপে দেখা যায়। ইনি সারেঙ্গী বাদনের সঙ্গে কণ্ঠসংগীতেরও অনুশীলন করেন এবং অতি উত্তম গাইতে পারতেন। ইনি ছিলেন বাহাদুর শাহের দরবারী সংগীতজ্ঞ।

বাদল খাঁ হৈদর খাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্র। কাকার কাছেই বাদল খাঁ সংগীত-শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাকার সঙ্গে দরবারে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন সংগীত বিদ্বানদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের সংগীত শোনারও সুযোগ ঘটে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের হাঙ্গামায় এঁরা ইংরাজ কারাগারে বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহীবদাস নামে প্রভাবশালী এক জমিদারের সহায়তায় এঁরা মুক্ত হন। মুক্তিলাভের পরে এঁরা স্বগ্রামে (পানিপথ) চলে আসেন।

কিন্তু অর্থোপার্জনের জন্য আবার দিল্লী যাত্রা করেন। রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য দিল্লীশহর তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল, তাই এঁরা আগরা যান কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় এঁরা গোয়ালিয়রে চলে যান এবং সেখানে সিন্ধিয়ার দরবারে স্থান পান। সেখানে তৎকালীন প্রসিদ্ধ খেয়ালীয়া হদ্দু খাঁ হস্সু খাঁ, নথ্থু খাঁ প্রমুখ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল এই নবীন জীবন কাটানোর পরে হৈদর খাঁ রামপুর রাজদরবার থেকে আমন্ত্রিত হন। রামপুর দরবারে থাকাকালীন হৈদর খাঁ'র মৃত্যু হয়।

কাকার মৃত্যুর কিছুকাল পরে বাদল খাঁ কলকাতা চলে আসেন। তখন থেকে এঁর মধ্যে কিছুটা বৈরাগ্যভাব লক্ষিত হয়। কলকাতায় ইনি দুলিচন্দ বাবুর দমদমের বাগানবাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইনি সেইখানেই ছিলেন। এঁকে দরবারে নিযুক্ত করার জন্য রামপুরের নবাব, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোল্‌কর, নবাব ওয়াজেদআলী শাহ প্রমুখ অনেক রাজা-মহারাজারা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দরবারের হৈ চৈ ও স্বার্থান্বেষীদের রেষারেষি প্রভৃতির জন্য কোথাও যান নি।

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ গিরিজাশংকর যখন ভারত ভ্রমণ করে ছম্মন খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, ইনায়তহুসেন খাঁ প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের কাছে তালিম নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন তখন তাঁর ধারণা ছিল বাদল খাঁ একজন সারেঙ্গী বাদক মাত্র, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে কণ্ঠসংগীতেও ইনি অদ্বিতীয় এবং রামপুরের মেহদীহুসেন খাঁ এবং খাদিমহুসেন খাঁ প্রমুখ এঁরই শিষ্য তখন তিনিও এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ইনি অসংখ্য ধনী ও নির্ধন শিষ্যদের শিক্ষাদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনিল হোম, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জমীরুদ্দীন খাঁ, ডঃ অমিয়নাথ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ দাস (মতিলাল), সতীশচন্দ্র অর্ণব, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট)
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে (ভট্টপাড়ায়) যদুনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। পিতা মধু ভট্টাচার্যও সংগীতচর্চা করতেন। অসাধারণ প্রতিভাবান যদুনাথ শ্রুতিধর এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর ও কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বড়ো বড়ো সংগীতের আসরে প্রসিদ্ধ ওস্তাদদের গান শুনে তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করে গাইতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে বহু কাহিনী প্রচলিত। কালক্রমে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে 'যদুভট্ট' নামে প্রসিদ্ধ হন।

শৈশবে যদুনাথ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতাচার্য বিষ্ণুপুর নিবাসী রামশংকর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর মৃত্যুর পরে গুরু-ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহায়তায় ইনি কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ খণ্ডারবাণী ধ্রুপদীয়া গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে ইনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে সংগীত শিক্ষার্থে পর্যটন করেন। এই সময় ইনি তানসেন বংশীয় কাশিম আলীর কাছে কিছুদিন সংগীত শিক্ষা করেন। সংগীত গুণপনায় যদুনাথ ভারতের কতগুলি বিখ্যাত কেন্দ্রে এঁর সুনাম প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেন। এঁর গানে মুগ্ধ হয়ে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও পঞ্চকোটের রাজা এঁকে 'রঙ্গনাথ' ও 'তানরাজ' উপাধি দান করেন। যদুভট্ট রচিত বহু গানের ভনিতার অংশে এই উপাধিগুলি এঁর পরিচয় বহন করছে। এঁর রচনাশক্তিও ছিল অসাধারণ। এঁর রচিত হিন্দিগানগুলি যে-কোনো হিন্দুস্থানী রচয়িতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

এঁর গুণমুগ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত গুরুর পদে বরণ করেন। যদুভট্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও গভীর শ্রদ্ধার কথা জীবনস্মৃতিতে জানা যায়। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৮৩) এই মহান শিল্পীর দেহান্তর ঘটে।

ভৈরব প্রসাদ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৪০ সালে পাটনাতে প্রসিদ্ধ তবলীয়া ভৈরব প্রসাদের জন্ম হয়। এঁর পিতা শিবপ্রসাদ মিশ্র অতি উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং আরা জেলার অধিবাসী ছিলেন। সংগীত ব্যবসার জন্য তিনি পাটনাতেও থাকতেন। তিনি কাশীর বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক বিহারী মিশ্রের ভগ্নী কদম্বদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সূত্রে এঁদের বেনারস ঘরানার সঙ্গে সংযোগ ঘটে।

ভৈরব প্রসাদ মাত্র দু'বছর বয়সেই পিতৃহীন হওয়ায় মামা বিহারী মিশ্র এঁকে তাঁর কাছে নিয়ে যান এবং পুত্রের মতো লালন পালন করেন। কাশীর বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ (আলীমহম্মদ খাঁ'র শিষ্য) মিঠাইলালজীর পিতা প্রয়াগজী তখন কাশী রাজদরবারে সংগীতজ্ঞ ও নাজির রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে সংগীত শিক্ষার জন্য এঁকে পাঠান হয়। এছাড়া তবলা-শিক্ষার জন্য ইনি তৎকালীন বিখ্যাত তবলীয়া ভগৎ মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভাবান ভৈরব প্রসাদ অল্পকালের মধ্যেই তবলা বাদনে অত্যন্ত খ্যাতিমান হন। ইনি শুদ্ধ বেনারসী তথা মর্দানা বাদক হিসাবে স্বীকৃত। ইনি প্রায় চার হাজার কায়দে, গৎ, টুকড়ে, পেশকার, রেলা ইত্যাদিতে সিদ্ধ ছিলেন। তাছাড়া ইনি ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদি গায়নেও অতি গুণী শিল্পী ছিলেন।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে মহাদেব মিশ্র, মহাবীর ভাঁট, নাগেশ্বর প্রসাদ, মৌলবীরাম মিশ্র (মামাতোভাই) এবং প্রসিদ্ধ আনোখেলাল উল্লেখযোগ্য।

এঁর ব্যবহার কিঞ্চিত কঠোর হলেও অন্তরে ইনি অত্যন্ত কোমল ছিলেন। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, এঁর কোনো নেশা ছিল না। গীতাপাঠ এঁর নিত্যকর্ম ছিল। এঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যার এঁর জীবিতকালেই মৃত্যু হয়। ১৯৪০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর এঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময়েও এঁর হাতে ছিল এঁর প্রিয় গ্রন্থ গীতা।

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
(১৯শ শতাব্দী)

বাংলাদেশের ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য সম্বন্ধে আজ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের অনেকেই জানেন। এই পরিবারে ১৮৪০ সালে সৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। ঠাকুর পরিবার ছিল দুইভাগে বিভক্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় এবং সৌরীন্দ্রমোহনের পিতা হরকুমার (মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন। তানসেন বংশীয় প্রসিদ্ধ গায়ক বাসৎ খাঁ এবং গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গায়ক হস্সু খাঁ'র শিষ্য ছিলেন হরকুমার ঠাকুর। বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণীরা ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই আসতেন। কারণ সেই দিনে ঠাকুর পরিবার ছিল সংগীত, সাহিত্য ও অন্যান্য কলাবিদ্যার পীঠস্থান।

মাত্র ৮ বছর বয়সেই সৌরীন্দ্রমোহন পিতার কাছে সংগীত শিক্ষারম্ভ করেন। পরবর্তীকালে ইনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার সঙ্গে ইনি লেখাপড়ায়ও খুব মেধাবী ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ইনি 'ভূগোল এবং ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত' গ্রন্থখানি রচনা করেন। ১৬ বছর বয়সে ইনি 'মুক্তাবলী' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' গ্রন্থদ্বয় রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরিণত বয়সে ইনি বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার অধিকাংশ সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ। যেমন, 'Hindu Music', 'Hindu Music from various authors', 'English verse said to Hindu Music,' 'Six Principal Ragas', 'Prince Panchsat', 'Victoria Samrajan', 'হারমনিয়ম সূত্র', 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা', 'সংগীতসার গ্রন্থ', 'জাতীয় সংগীত প্রস্তাব', 'মৃদঙ্গ মঞ্জরী', 'ঐকতান', 'যন্ত্রকোষ', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'গান্ধর্বকলাপ ব্যাকরণ প্রভৃতি। প্রাচীন রাগ-রাগিণীর নূতন পদ্ধতি এবং দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন ইনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন।

সেই যুগে আমাদের দেশের সংগীতের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ছিল, কারণ ভদ্র পরিবারে তখন সংগীত ছিল নিষিদ্ধ। সেই কুসংস্কার দূর করে ইনি সাধারণের সংগীতরুচি বৃদ্ধি এবং সংগীত শিক্ষা প্রসারের জন্য "বঙ্গ সংগীত

বিদ্যালয়' তথা 'Bengal Academy of Music' নামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুতরাং বাংলাদেশের সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে এঁর অবদান অতুলনীয়।

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে এঁর খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সংগীতবিদদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এঁর রচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় দেশ-বিদেশের মনীষীদের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ ঘটে এবং পরিচিত হন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতেই ইনি পণ্ডিত ছিলেন। ভারতবর্ষে ইনিই সর্ব-প্রথম আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৭৫ সালে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে ডক্টর অব মিউজিক (D. Musc) উপাধি-লাভ করেন। হিন্দু-বিধি অনুসারে সেই যুগে বিদেশে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। তাই বিদেশ থেকে বার বার আমন্ত্রণ পেয়েও ইনি কখনো বিদেশে যান নি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৮০ সালে রাজাবাহাদুর সি. আই ই. এবং ১৮৮৪ সালে নাইট উপাধি দান করে দু'বার এঁকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ জানান, বেল-জিয়ামের সম্রাট লিওপোলডও অনুরূপ সম্মান সহকারে এঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ইনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তাঁর মর্যাদা যে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি তার প্রমাণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত এঁর প্রস্তর মূর্তি এবং বিরাট তৈলচিত্র সংরক্ষণ থেকে পাওয়া যায়। অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সৌরীন্দ্রমোহন দেশেও কম খ্যাতিলাভ করেন নি। 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন (১৮৮০ সালে) সংগীতের জন্য, অর্থসম্পদের জন্য নয়।

সংগীতের শাস্ত্রগত ও ক্রিয়াত্মক উভয় বিষয়েই যে তিনি অতিগুণী ছিলেন তার প্রমাণ তৎকালীন নানা পত্র-পত্রিকাতে পাওয়া যায়। গুরুভাই কালী-প্রসন্নের সঙ্গে এঁর দ্বৈত সেতারবাদন সেই যুগে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

আচার্য ক্ষেত্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন যন্ত্রসংগীতে তালিম পান বেনারসের বিখ্যাত বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। এছাড়া সৌরীন্দ্রমোহন বিখ্যাত সেতারী সাজ্জাদ মহম্মদের কাছেও তালিম পান। সুরবাহার যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাদক গোলাম মহম্মদের পুত্র সাজ্জাদ শেষ বয়সে বহুদিন এঁর আশ্রয়ে ছিলেন।

১৯১৪ সালের ৫ই জুন এই মহান সংগীতাচার্যের মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়
(১৯শ শতাব্দী)

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৪২ সালে। এঁর বংশ পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে ইনি অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী তথা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য এবং স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গুরুভাই ছিলেন।

ইনি সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া ইনি ন্যাসতরঙ্গ বাদনেও অতি নিপুণ ছিলেন। ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র যেমন অনেকের কাছে অপরিচিত তেমনি এর বাদকও দুর্লভ। তবে কালীপ্রসন্ন এই যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের অতি কঠিন প্রক্রিয়া ভিন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাজানো অসম্ভব। এই কষ্টকর প্রক্রিয়ায় ন্যাসতরঙ্গ বাজানোর ফলেই দুরারোগ্য শ্বাসরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অতি কষ্টকর অকাল মৃত্যু বরণ করেন।

সংগীত প্রতিভার তথা উচ্চশিক্ষার জন্য ইনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া থেকে সর্বপ্রথমে ১৮৭৫ সালে বৈদেশিক সম্মানলাভ করেন। তারপরে ১৮৮০ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৮৮১ সালে ইতালী থেকে এবং ১৮৮৪ সালে প্যারিস থেকে বহু স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্রাদি পান। ১৯শ শতাব্দীতে সৌরীন্দ্র-মোহন ছাড়া অন্য কোন সংগীতজ্ঞ এঁর মতো সম্মানলাভ করেন নি। কিন্তু স্বদেশে তখন পর্যন্ত তেমন খ্যাতিলাভ করেন নি। তাই জগদ্বিখ্যাত বেহালা-বাদক এডওয়ার্ড রেমেণী উক্তি করেছিলেন যে, 'বাবু আপনার দেশের লোক আপনাকে চেনে না, এই সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা'।

ভারতের তিনজন বড়লাট লর্ড লিটন, লর্ড রিপন ও লর্ড নর্থব্রুক, ভারতের শিক্ষা কমিশনের সভাপতি স্যর উইলিয়ম হাণ্টার প্রমুখ এঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত লা মার্টিনীয়ার কলেজের অধ্যক্ষ জে. এ. অলডিস শুধু গুণমুগ্ধই ছিলেন না, এঁর শিষ্য হয়ে ছ'মাস সেতার শিখেছিলেন। কালী-প্রসন্ন ও সৌরীন্দ্রমোহনের দ্বৈত সেতার বাদন সেই দিনে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে য়ুরোপের বিখ্যাত বেহালা শিল্পী পর্যটনে বেরিয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁর নাম এডওয়ার্ড

রেমেণী জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান। যিনি 'King of Violin' নামে সমগ্র য়ুরোপে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে তাঁর নিমন্ত্রণ হল। সেই আসরে সৌরীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন দ্বৈত সেতার বাজিয়েছিলেন। বাজনা শুনে সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শুধু মৌখিক প্রশংসাই নয়, সেই সংগীত তাঁর কেমন লেগেছিল সে বিষয়ে তিনি লিখলেন Englishman কাগজে (১৪ই জানুয়ারী ১৮৮৬ সালে) সেই লেখার বঙ্গানুবাদ সংক্ষিপ্তরূপে এইরূপ—

"আমার সৌভাগ্য যে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে ক'দিন আগে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রন পাই হিন্দুসংগীত শোনবার জন্য। আমার কাছে এটি বড়ই স্বাগত মনে হোল। কারণ ইতিপূর্বে এই সংগীতজ্ঞ রাজার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছিলাম।...রাজার বাড়িতে যাবার পরে বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।...রাজা বাজাতে লাগলেন একরকমের হিন্দু সেতার। বাবু কালীপ্রসন্নের হাতে ছিল একটি খাঁটি হিন্দু সেতার। হিন্দু-সংগীত ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর হাতে যেমন দেখা যায়। আর আমার এও মনে হল যে, এই দুই গুণীর সুর-সৃষ্টির সময় সেই পৌরাণিক দেবী তাঁদের মাথার উপরে তাঁর অভয় পক্ষ বিস্তার করে আছেন। তাঁদের বাজনা শুনে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর অকপটে আমার সেই আনন্দ প্রকাশ করি। এই প্রকৃত সংগীত আমি অটুট মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। কোন বিদেশী প্রভাব এই সংগীতকে স্পর্শ করে নি। শুনতে শুনতে তাঁদের সংগীতের সমস্তই আমার কাছে চমৎকার পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি বেশ বুঝতে পারি তার মর্ম। যা সব চেয়ে মহান তা সবচেয়ে সরল আর্ট একথা বড় সত্য। গ্যেটে ঠিকই বলেছেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন অতি উঁচু দরের গুণীর মতো রাজার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম তিনি তাঁর দ্বৈত বাদনে নানারকম অতি জটিল সুর উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করেছেন। আর সে সব কাজ অতি সুন্দর। আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে তাঁদের চমৎকার অনুষ্ঠানের সময় আবিষ্কার করলাম যে, আমাদের য়ুরোপীয় সংগীতের মতো হিন্দু সংগীতও সম্পূর্ণ একই ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। য়ুরোপীয় সংগীতও অবশ্য প্রাচ্য থেকেই এসেছিল।

উপসংহারে আমি শুধু অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাই রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ও বাবু

কালীপ্রসন্নকে। তাঁরা আমাকে সংগীতের এই রহস্য উন্মোচন করে কি আনন্দই দিয়েছেন। আর আমার ধারণা ছিদ্রান্বেষী য়ুরোপের অনেক সংগীত পণ্ডিতই এই সংগীত থেকে এমন আনন্দলাভ করবেন।"

এই লেখা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, প্রফেসর রেমেণী সংগীতের কত বড় সমঝদার ছিলেন। তাঁর শিল্পী-সত্তা বিজাতীয় এবং ভিন্ন পদ্ধতির দূরত্ব অতিক্রম করে ভারতীয় সংগীতের মর্ম কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিল। এবং কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি এই দ্বৈত সেতার শুনেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন অবশ্য শেষ বয়সে 'বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক' থেকে 'সংগীত উপাধ্যায়' ও একটি স্বর্ণকেউর উপহার পেয়েছিলেন, কিন্তু তাও বিদেশী স্বীকৃতিলাভের পরে এবং গুণগ্রাহী গুরুভাই সৌরীন্দ্রমোহনের উদ্যোগের ফলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৪৪ সালে (১২৫০ সালের ৫ই ফাল্গুন) কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে নীলকমল ঘোষের পুত্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় এঁর অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ ছিল। তবে পরবর্তীকালে ইনি প্রচুর পড়াশুনা করেছেন, যার পরিচয় এঁর রচিত নাটকগুলিতে পাওয়া যায়।

অল্পবয়সেই বন্ধুদের সহায়তায় ইনি একটি সখের থিয়েটার-দল গঠন করেন এবং সর্বপ্রথম 'সধবার একাদশী' পালাটিতে 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় অভিনয় করে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। সেই ছোট দলটি কালক্রমে 'ন্যাসনাল থিয়েটার' নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আদর্শ-শিল্পী গিরিশবাবু কিন্তু এইরূপ ব্যবসা অপছন্দ করেন। তাই ইনি বিডন ষ্ট্রীটের 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' অবৈতনিক অভিনেতারূপে যোগদান করেন। কিছুকালের মধ্যেই ইনি সেখানে ম্যানেজারের পদে মাসিক একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। সেই সময় থেকে ইনি নাটক লেখা আরম্ভ করেন। ইনি একাধারে ম্যানেজার, পরিচালক, অভিনেতা ও লেখক ছিলেন। নিজে রঙ্গমঞ্চ ছাড়া ষ্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড প্রভৃতি মঞ্চে ইনি বহু নাটক পরিচালক রূপে মঞ্চস্থ করেছেন। এদেশের

নাট্যজগতে যুগান্তর সৃষ্টিকারী গিরিশচন্দ্র সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক প্রভৃতি প্রায় সত্তরখানি নাটক রচনা করেছেন। এঁর শেষ নাটক সম্ভবত 'গৃহলক্ষ্মী'। এঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বিল্বমঙ্গল', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের ইনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকের প্রয়োজনে তিনি বহু গানও রচনা করেছেন। এঁর নাট্যরচনা, গীতরচনা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতিতে অসাধারণ দক্ষতার জন্য এঁকে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র বলা হত।

গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার পদ্ধতিটি ছিল অভিনব। শোনা যায় ইনি নাকি অভিনয়ের ছন্দে এবং অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অনর্গল দৃশ্যের পর দৃশ্য, বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একই সঙ্গে বলে যেতেন। এঁর সঙ্গীরা সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। পরে অবশ্য সেগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ইনি সংশোধন করতেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে এই মহান নাট্যকারের মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৪৫-৪৬ সালে উত্তর কলকাতার হোগলকুড়িয়াতে (ভীম ঘোষ লেন) এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ১৯শ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ ছিল সংগীতবিকাশের কেন্দ্র। সেই সময়ে সংগীতের অনেক মহাগুণীর আবির্ভাব হয়েছিল বাংলাদেশে। কৃষ্ণধন তাঁদেরই একজন।

এঁর জীবনে প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর হল মাইকেল রচিত শর্মিষ্ঠা নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয়। সুকুমার কান্তি ও সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী এবং প্রতিভাদীপ্ত কৃষ্ণধনের সেই প্রথম রাত্রির অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ তৎকালীন বাংলার মান্যগণ্য শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। সেই অভিনয় কেমন হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন— "When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic

spectator was charmed by the character Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell"…। এই অভিনয় হয়েছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ শৌখিন রঙ্গমঞ্চ বেলগাছিয়া থিয়েটারে। সেই ছিল এঁর প্রথম অভিনয়। তার আগে ইনি কখনো অভিনয় করেন নি। এঁর শখ ছিল কুস্তি লড়বার আর স্বাস্থ্যচর্চার। এই অভিনয় সূত্রেই এঁর পরিচয় হয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে এবং তাঁর কাছে সংগীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। অবশ্য এছাড়া ইনি পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী ও বীণকার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস গোস্বামী, গোয়ালিয়রের সেতারী আমহদ খাঁ প্রমুখ আরো কয়েকজন গুণীর কাছেও সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে ইনি সেতার, পিয়ানো ইত্যাদি যন্ত্রসংগীতেরও চর্চা করেছিলেন। উত্তম পিয়ানোবাদক হিসাবেও ইনি সংগীতজগতে পরিচিত ছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান তথা ক্ষুরধার বুদ্ধি কৃষ্ণধন প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন সংগীতক্ষেত্রে। মাত্র ২১ বছর বয়সে ইনি স্টাফ নোটেশনের অনুকরণে রচিত রেখামাত্রার সংগীত-লিপি যুক্ত গ্রন্থ 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭ খৃঃ) প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে অনেক ধ্রুপদ, ধামার খেয়ালাদি -যুক্ত গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার' অনুরূপ স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশ করেন। য়ুরোপীয় সংগীতের সংগীত-লিপি প্রণালী তথা সংগীত-লিপি-যুক্ত গ্রন্থ ইনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় সংগীতে প্রয়োগ করেছিলেন। রাগসংগীতে Harmony রচনার প্রথম কৃতিত্বও এঁর।

কঠোর জীবনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইনি লেখাপড়া তথা সংগীতশিক্ষা করেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় স্কলারশিপ পেতেন এবং অতি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের বাঙালীর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পদ সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগের জন্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। সংগীতশিক্ষার ব্যাপারে এঁর অদম্য আগ্রহ এবং গ্রহণ করার অপরিসীম্ ক্ষমতা ছিল।

শেষ বয়সে ইনি কুচবিহারে থাকতেন এবং সেইখানেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এঁর মৃত্যু হয়।

ইমদাদ খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৪৮ সালে উত্তর প্রদেশের এটোয়া শহরে ইমদাদ খানি বাজের প্রবর্তক এবং সেতারের অদ্বিতীয় সাধক ইমদাদ খাঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা সাহেবদাদ খাঁ (হদ্দু সিং) ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়কদের অন্যতম ছিলেন। এছাড়া তিনি সারেঙ্গী ও জলতরঙ্গ বাদনেও অতি গুণী ছিলেন।

ইমদাদ খাঁ পিতার কাছে ছাড়া বন্দেআলী খাঁ, রজবালী ও সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁর কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি সেতার ও সুরবাহার বাদক হিসাবে নওগাঁয়ের মহারাজা, বেনারসের মহারাজা এবং কলকাতার স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে ছিলেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে 'কোর্ট মিউজিসিয়ান' হিসাবেও ইনি কিছুদিন ছিলেন। অন্তরের অনুসন্ধিৎসার জন্য ইনি কোথাও বেশিদিন থাকতে পারতেন না। শেষ বয়সে ইনি বরোদার রাজদরবারেও কিছুকাল ছিলেন।

এঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু রাজপুত ছিলেন। এই বংশের সুরজন সিং নাকি এঁদের ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁর পুত্র ইনায়ত খাঁ ও বহিদ খাঁ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

১৯২০ সালে এটোয়া থেকে ইন্দোর যাবার পথে ট্রেনে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

বালকৃষ্ণ বুবা (ইচলকরংজীকর)
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৪৯ সালে কোলাপুরের চন্দুর গ্রামে প্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী বালকৃষ্ণ বুবার জন্ম হয়। পিতা রামচন্দ্র বুবাও ভাল গাইয়ে ছিলেন। ভাউবুবা, দেবজীবুবা, জোশীবুবা, হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীর কাছে বালকৃষ্ণ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করেন।

অসাধারণ সংগীত-প্রতিভার অধিকারী বালকৃষ্ণ বুবা ভারতবর্ষ এবং নেপালের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। বম্বেতে থাকা কালীন, সংগীত প্রচার ও প্রসারের জন্য 'গায়ন-সমাজ' নামে ইনি

একটি সংগীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এবং সেই সঙ্গে 'সংগীত-দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কিছুকালের মধ্যেই এঁকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বম্বে ত্যাগ করতে হয়। পরে ইনি অন্ধ্রপ্রদেশে স্টেট গায়কের পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে যান। কিছুকাল পরে ইনি অন্ধ্রপ্রদেশের ইচলকরংজীকর রিয়াসতে রাজগায়করূপে নিযুক্ত হন। এইখানে থাকাকালীন ইনি 'ইচলকরংজীকর' নামে খ্যাত হন। শেষ বয়সে আর একবার ইনি সংগীতপ্রচারের জন্য ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

•

অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তী
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৫১-৫২ সালে চব্বিশ পরগণার সোনারপুরের কাছে রাজপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম হয়। কম বয়স থেকেই ব্যবসার জন্য কলকাতা যাতায়াত করতে হত। ইনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং অসাধারণ সংগীত-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে তাই ইনি কলকাতার সংগীতজগতের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

ইনি তানসেন-বংশীয় ওস্তাদ আলীবক্সের কাছে রীতিমত তালিম পেয়েছেন। এছাড়া মহাগুণী ধ্রুপদী মুরাদ আলী ও দৌলত খাঁর কাছেও ধ্রুপদ শিখেছিলেন। তারপর শ্রীজান বাঈয়ের কাছে টপ্পা ও ভোলানাথ দাসের কাছে ভজন গীতাবলী শিখেছেন। এঁর গায়কী ও আসর মাত করার সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যায়। ইনি রেকর্ডে কণ্ঠদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে এঁর অজ্ঞাতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে, বিনা প্রস্তুতিতে চারখানি গান রেকর্ড করা হয়েছিল। গান চারখানি হল, 'বিফল রজনী', 'আনন্দবন গিরিজা', 'নজরা দিলবাহার' ও 'গোবিন্দ মুখারবিন্দ'। গানগুলি বিনা যন্ত্রে ও সঙ্গতে শুধু গলায় গাওয়া। সুতরাং এর থেকে অঘোরবাবুর গানের বিচার করা যায় না।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে অমরনাথ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্ত চক্রবর্তী, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ

উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষের দিকে ইনি কাশীবাসী হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এঁর কাশীতেই মৃত্যু হয়।

আল্লাদিয়া খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৫৫ সালে যোধপুরের এক বিশিষ্ট সংগীত-পরিবারে ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা খাজা আহমদ খাঁ, খুল্লতাত জহাঙ্গীর খাঁ প্রমুখ অত্রৌলী ঘরানার অতি গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁদের পূর্বপুরুষ, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিশ্বম্ভর ডাগুর বংশীয় এবং হনুমন্নাতের সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাদশাহ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান আল্লাদিয়া খাঁর সংগীতশিক্ষা বংশপরম্পরাগত রীতিতে গুরুজনদের কাছেই হয়। অল্প বয়সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর তথা অন্যান্য শিল্পোচিত গুণের জন্য ইনি অত্যন্ত খ্যাতিবান এবং অতি গুণী সংগীতজ্ঞ নবাব কল্লন খাঁর দরবারে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বছর পরে ইনি বরোদা, বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে সংগীত-ভ্রমণ আরম্ভ করেন। সেই সময়ে কোলহাপুরের ছত্রপতি শাহু মহারাজা এঁকে আমন্ত্রণ করেন। এঁর গান শুনে মহারাজা এমন প্রভাবিত হন যে, এঁকে দরবারেই নিযুক্ত করে রেখে দেন। মহারাজার মৃত্যুর পরে ইনি বম্বেবাসী হন। সেখানের জনসাধারণ এঁর সংগীতে এমন মুগ্ধ হন যে, এঁকে 'সংগীতসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং মধুর স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এঁর কোনো নেশা ছিল না। সংগীত পরিবেশনকালে শ্রোতাদের রুচি ও স্তর সম্বন্ধে এঁর অদ্ভুত উপলব্ধির ক্ষমতা এবং সচেতনতা ছিল। জ্ঞানী-গুণীদের আসরে যেমন নানাবিধ জটিল ও কারুকার্যময় সংগীত পরিবেশন করতেন সাধারণ আসরে তেমন করতেন না। ইনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও তরানা গাইতেন। এঁর দ্বিতীয় পুত্র মঞ্জী খাঁ, যিনি সংগীতে অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তিনি অবশ্য ঠুংরীও গাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৩৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ বয়সে অল্পদিনের ব্যবধানে সুযোগ্য পুত্র এবং ছোটো ভাই হৈদর খাঁর মৃত্যুতে ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সংগীত-সেবা বন্ধ করে দেন।

কিছুকাল পরে শিষ্যমণ্ডলী ও শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ অনুরোধে ইনি

আবার সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন। ইনি অপ্রচলিত রাগের প্রতি অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। হিন্দোল, মালশ্রী, মারবা, বসন্ত, ভৈরববহার, বসন্তবহার, মারুবেহাগ, নায়কীকানাড়া, গোরখকল্যাণ, খটতোড়ী, ললিতমঙ্গল, জৈতমল্লার প্রভৃতি রাগে ইনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বম্বের আকাশবাণীতে গাইবার জন্য এবং রেকর্ড করার জন্য এঁকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হয়, কিন্তু ইনি রাজি হন নি। এঁর ধারণা এতে তাঁর সংগীত হাতছাড়া হয়ে যাবে। মুখে বলতেন যে, শুদ্ধ জিনিস অশুদ্ধ লোকের হাতে পড়লে অশুদ্ধতা বাড়তেই থাকবে।

১৯৪৬ সালের ১৬ই মার্চ বম্বেতে এঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে এঁর শিষ্যরা এঁর মূর্তি কোলহাপুরের টেবল ক্লাবের সামনে স্থাপিত করেন। সেই স্থান এখন 'আল্লাদিয়াচৌক' নামে খ্যাত।

এঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অজমত হোসেন খাঁ, ইনায়ত হোসেন খাঁ (সেতার), কেশরবাঈ কেরকর, গোবিন্দ বুয়া শালিগ্রাম, গুল্লুভাই জসদান, দিলীপচাঁদ বেদী, নথন খাঁ, বরকতুল্লা খাঁ (সেতার), মঘুবাঈ কুরডিকর, লীলুবাঈ স্থরঙ্গারকর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রসন্নকুমার বণিক্য
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৫৭ সালে পূর্ববাংলার ঢাকা শহরে মদনমোহন বণিক্যের পুত্র প্রসিদ্ধ তবলীয়া প্রসন্নকুমার বণিক্যের জন্ম হয়। বাল্যকালেই এঁর অসাধারণ সংগীত-প্রতিভা লক্ষিত হয়। ফলে তৎকালীন ঢাকার শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী গৌরমোহন বসাক এঁর শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি নিজগুণে খ্যাতি-লাভ এবং বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমে ইনি ঢাকার শ্রেষ্ঠ তবলীয়া হিসাবে স্বীকৃত হন।

মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারের সুবিখ্যাত তবলীয়া আতাহোসেন তখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে। ইনি তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুর অনুমতিক্রমে মুর্শিদাবাদ যান এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পরিণত বয়সে ইনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগীতকলা প্রদর্শন করে অসাধারণ খ্যাতি এবং প্রচুর ধনোপার্জন করেন। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন

ঠাকুর এঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তখন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ তবলীয়া হিসাবে আতাহোসেনের পরে ইনি স্বীকৃত ছিলেন।

এঁর বহু শিষ্যের মধ্যে রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী, রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর, আসাম), প্রাণবল্লভ গোস্বামী, অক্ষয়কুমার কর্মকার, হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, হেমেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় এঁর বোল সংগ্রহের সংখ্যা দুই সহস্রের অধিক ছিল। 'তবলা তরঙ্গিণী' ও 'মৃদঙ্গ প্রবেশিকা' নামে দুখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেছেন। এঁর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

উজীর খাঁ

(১৯শ শতাব্দী)

১৮৬০ সালে, তানসেনের কন্যাবংশীয় সংগীতনায়ক উজীর খাঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা সুপ্রসিদ্ধ বীণকার আমীর খাঁ রামপুরের নবাব কলবে খাঁর সংগীতগুরু তথা সভা-সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বংশীয় গুরুজনদের কাছে শৈশব থেকেই খাঁ সাহেব যন্ত্র ও কণ্ঠ -সংগীতের শিক্ষারম্ভ করেন। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে এঁর অসীম আগ্রহ ছিল। সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ ছাড়াও ইনি উপযুক্ত পণ্ডিতদের কাছে সংগীতশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি তথা হিন্দী, আরবী, ফার্সী এমন-কি কিছু ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করেন। কলকাতায় থাকাকালীন ইনি কিছুটা বাংলা ভাষাও শিখেছিলেন। ইনি অবসর সময়ে পুরাণাদি অবলম্বনে নাটক, কবিতা ইত্যাদি রচনা করতেন, এছাড়া চিত্রাঙ্কনেও এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। অর্থাৎ ইনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন পরিপূর্ণ কলাপ্রেমী।

সংগীতবিদ্যায় ইনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই ইনি অতুলনীয় ছিলেন। যন্ত্রসংগীতে ইনি বীণা অপেক্ষা সুরশৃঙ্গার বেশি বাজাতেন। ভারত ভ্রমণ-কালে ইনি বিভিন্ন স্থানে সুনাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরিণত বয়সে ইনি রামপুরের নবাব হামিদ আলী খাঁর সংগীতগুরুর পদে অভিষিক্ত হন। সেখানে সংগীতের নানা বিভাগে ইনি বহু শিষ্যকে শিক্ষা দেন। বৃদ্ধবয়সে সরোদবাদক হাফিজআলী খাঁ এবং বাংলার গৌরব ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এঁর খ্যাতি ও কীর্তি আরো বৃদ্ধি করেন। এঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আব্দার রহিম খাঁ, তারপদ ঘোষ, নাসির আলী, মহম্মদ হোসেন, প্রমথনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, যাদবেন্দ্র মহাপাত্র, সৈয়দ ইব্বন আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

খাঁ সাহেবের তিন পুত্র। নাজির, নাসির ও সগীর খাঁ। এঁরা সকলেই পিতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। তবে নাজিরই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কণ্ঠসংগীতের অধিক অনুরাগী ছিলেন। পিতার প্রায় সকল শিষ্যের শিক্ষাভার তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধবয়সে এমন সুযোগ্য পুত্রকে হারিয়ে খাঁ সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। তবু বংশগত সংগীতবিদ্যা রক্ষার্থে কনিষ্ঠ সগীর এবং পৌত্র দবীর খাঁর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তবে পুত্রের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই ১৯২৭ সালে এই মহান সংগীতশিল্পীর লোকান্তর ঘটে।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৬০ সালের ১০ই আগস্ট (জন্মাষ্টমীর দিন) বম্বের বালকেশ্বর গ্রামে 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি'র প্রবর্তক, সুপ্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের জন্ম হয়। পিতামাতার সংগীতপ্রিয়তা বাল্যকাল থেকেই এঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিয়মিত সংগীতচর্চা করতেন। পরিবারের সকলেই এঁকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। ছাত্রাবস্থায় স্কুল-কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ইনি প্রচুর পুরস্কার ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৯০ সালে ইনি যথাক্রমে বি. এ , এবং এল. এল বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বম্বেতে ওকালতি করার সময়ে ইনি বহু ভারত-বিখ্যাত শিল্পীদের সংগীত শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময়ে বিভিন্ন ওস্তাদদের স্বর ও রাগরূপ প্রকাশের বিষয়ে অজ্ঞতা বা উদাসীনতা, অহমিকা, সংকীর্ণতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি এবং ঘরানার দোহাই দিয়ে যথেচ্ছাচারিতা এঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে। তখন থেকে ইনি সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রাদিতেও গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং শাস্ত্রীয় তথ্যাদি সংকলন ও নিজকৃত 'হিন্দুস্থানী স্বরলিপি' পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহীত সংগীত লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে আরম্ভ করেন।

পণ্ডিতজী অনেকের কাছেই সংগীত-শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন। এঁর

গুরুবর্গের মধ্যে তানসেন বংশীয় নিসার আলীর প্রশিষ্য শেঠ বল্লভদাসদমলজী, আলীহোসেন বীণকারের শিষ্য গোপাল জয়রাজগীর, তানসেন বংশীয় মহম্মদ আলী, জয়পুরের মহম্মদ আলী, আশাক আলী, আহমদ আলী, আগ্রার মহম্মদ হোসেন ও বিলায়ত হোসেন, রাওজী বুয়া বেলবাঘকর, গোয়ালিয়রের একনাথ পণ্ডিত, রামপুরের উজীর খাঁ ও নবাব কলবে খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি বম্বের 'জ্ঞানউত্তেজক মণ্ডল' নামক একটি প্রতিষ্ঠানেও কিছুকাল সংগীতচর্চা করেন। কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে ইনি সেতার ও বাঁশীও মোটামুটি বাজাতে পারতেন।

জ্ঞানবুদ্ধি ও উপলব্ধি অনুসারে ইনি যাবতীয় রাগ ও শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য এঁকে যে কী অপরিসীম দুঃখ কষ্ট স্বীকার, স্বার্থত্যাগ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তা বর্ণনাতীত। এ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত। যখন ওস্তাদেরা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সংগীতকে পৈতৃক সম্পত্তির মতো রক্ষা করতেন, সেই আবহাওয়ায় পণ্ডিতজীর মতো উদারচেতা সংগীত-শাস্ত্রীর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে সংগীত-সমাজের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে, পণ্ডিতজী বিভিন্ন প্রান্তীয় ওস্তাদদের সংগীত শোনা এবং সংগ্রহ করার জন্য এক ঐতিহাসিক যাত্রা করেন। সর্বপ্রথম তিনি দক্ষিণ ভারতে যান, সেখানে ব্যংকটমুখী প্রবর্তিত ৭২ থাট থেকে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির ১০ থাট প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনি বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীরা যাতায়াত করতেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তিনি বরোদার মহারাজার সহায়তায় বরোদাতে এক বিরাট. সংগীত-সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ক্রিয়াসিদ্ধ ও ঔপপত্তিক উপাদানাদি সম্বন্ধে গম্ভীরতা পূর্বক আলোচনা চলে। সেই সম্মেলনে পণ্ডিতজী-প্রস্তাবিত 'All India Music Academy' স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সময়ে পণ্ডিতজী একটি মহত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন, যা পরবর্তীকালে 'A Short Historical Survey of the Music of

Upper India' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর হিন্দি অনুবাদও হাথরস 'সংগীত কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পণ্ডিতজীর প্রচেষ্টায় নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হয়, এবং লক্ষ্ণৌ 'মরিস কলেজ অব মিউজিক' (বর্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ) স্থাপিত হয় তথা দিল্লীতে ন্যাশনাল একাডেমী অব মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংগীতশাস্ত্রাদি রচনায় ইনি প্রাচীন সংগীতের বৈশিষ্ট্য এবং অসামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত ভাষায় 'অভিনব রাগমঞ্জরী' ও 'শ্রীমলক্ষ্যসংগীতম্' গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের টীকাটিপ্পনী স্বরূপ, 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি'র ঔপপত্তিক বিষয়ক, (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ) মারাঠি ভাষায় 'ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র' রচনা করেন। এছাড়া বিভিন্ন ঘরানার ওস্তাদদের মুখে শোনা অসংখ্য গান স্বরলিপিসহ 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' (ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ) রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি কয়েকশত রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয়, স্বর মালিকা, আলাপ-বিস্তার, ছোটো ও বড়ো খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, তারানা, লক্ষণগীত প্রভৃতি সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতজী শুদ্ধ থাট বিলাবল নিশ্চিত করে ১০টি থাটে যাবতীয় রাগ বর্গীকরণ করেছেন। তিনি ইংরাজি, সংস্কৃত, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় বহু নিবন্ধাদি রচনা করেছেন, যাতে 'চতুর পণ্ডিত', 'বিষ্ণু শর্মা', 'মঞ্জরীকার' প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে পণ্ডিতজী রচিত যাবতীয় গ্রন্থ এবং নিবন্ধাদির হিন্দি অনুবাদ হাথরস 'সংগীত কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে পণ্ডিতজী দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস প্রভৃতি নানাস্থানে সংগীত-সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সংগীত-সম্মেলনের প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন পণ্ডিতজী স্বয়ং, কিন্তু বর্তমানে এগুলি যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর উদ্দেশ্য তেমন ছিল না। তাঁর স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে, পণ্ডিতজী প্রবর্তিত ও নির্দ্ধারিত স্বরলিপি ও পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উপাধিদান-সহ শিক্ষার্থীদের একটা মান নির্ধারণ করা হয়।

বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের সংগীত প্রেমীরা পণ্ডিতজীর গ্রন্থাদির সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত।

পণ্ডিতজীর শিষ্যদের মধ্যে বাদীলাল শর্মা, রবীন্দ্রলাল রায়, রাজাভাইয়া

পুঙ্খওয়ালে, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, হেমেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর (গণেশ চতুর্থী তিথিতে) এই মহান সংগীতাচার্য পরলোক গমন করেন।

আপ্পা তুলসী
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী আপ্পা তুলসীর জন্ম হয়। এঁর জন্মের সময় ও স্থান সম্পর্কে সঠিক কিছু না জানা গেলেও ইনি ভাতখণ্ডের সমসাময়িক তথা পরম সুহৃদ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের উচ্চস্তরের সংগীত পণ্ডিত আপ্পা তুলসী হায়দরাবাদ নিজামের দরবারী গায়ক ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর জ্ঞান থাকায় ইনি বহু প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি 'সংগীত সুধাকর', 'রাগ-কল্পদ্রুমাংকুর', 'রাগচন্দ্রিকা', 'অভিনব তালমঞ্জরী', 'রাগচন্দ্রিকাসার' প্রভৃতি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রী হলেও এঁর রচিত গ্রন্থগুলি হিন্দুস্থানী সংগীতেরও প্রামাণিক পুস্তক হিসাবে স্বীকৃত। এঁর লেখন ভঙ্গিটিও অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট।

১৯২০ সালে হায়দারাবাদেই এঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৬১ সালের ৭ই মে (১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, সংগীত-প্রতিভা প্রভৃতি বাল্যকাল থেকেই প্রকাশ পায় এবং কৈশোরেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

১৮৮২ সালে এঁর রচিত 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হবার পরে, রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলার বিবাহ সভায় প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলায় মালা এঁকে

পরিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমাদের আগামী দিনের কবি'।

সংগীত, সাহিত্য ও ললিতকলার সর্ববিভাগে ইনি সমান দক্ষ ছিলেন। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, ব্যঙ্গকৌতুক, প্রার্থনা, ধর্মোপদেশ, রূপকথা, নাটক, রূপকনাট্য, গদ্যকবিতা, প্রহসন, শিক্ষা, রাজনীতি, দেশপ্রেম, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, তত্ত্বকথা, বিবিধ প্রসঙ্গ, সংগীত বিষয়ক অজস্র রচনা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই এঁর অবাধ বিচরণ ও অতুলনীয় রচনা বিস্ময়কর। এপর্যন্ত কোনো দেশে, কোনো কালে, কোনো একজনের দ্বারা সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির এইরূপ পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় নি। ইনি তিন সহস্রাধিক বিভিন্ন কবিতা এবং আড়াই সহস্রাধিক সংগীত রচনা করেছেন। এছাড়া ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী এবং ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছেন।

১৯০২ সালে এঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। ১৯১৩ সালের ১২ই নভেম্বর ইনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে 'নোবেল প্রাইজ' পান। ইতিপূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ডি. লিট্ উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯১৫ সালে ইনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ এই 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে একাদশতম বিদেশ ভ্রমণে য়ুরোপে যান এবং নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করেন।

মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে এঁর জন্মদিনে পঠিত একটি প্রবন্ধে (সভ্যতার সংকট) ইনি ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আধুনিককালের, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণকে সত্যপথের জন্য যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ) এই বিরাট প্রতিভার মৃত্যু হয়। এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদির জন্য 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভৈরব সহায়
(১৯শ শতাব্দী)

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাশীধামে প্রসিদ্ধ তবলীয়া "কায়েদে কে সম্রাট" ভৈরব সহায়ের জন্ম হয়। এঁর পিতা গৌরী সহায়ও উত্তম তবলীয়া ছিলেন। বাল্যকালে এঁর শিক্ষারম্ভ হয় জ্যেষ্ঠতাত এবং বেনারস ঘরানার

প্রবর্তক রামদাস সহায়ের কাছে। তবলা অভ্যাস এবং কাশীধামের 'আসভৈরব' মূর্তির দর্শনই ছিল এঁর নিত্যকর্ম। ছোটোবেলা থেকে ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ও উগ্রপ্রকৃতির ছিলেন বলেই নাকি এঁর নাম হয় ভৈরব। আবার কেহ কেহ বলেন, ইনি আসভৈরবের দর্শন পেয়েছিলেন বলেই এই নামকরণ হয়েছিল। তবে ইনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের কান্তিময় সুপুরুষ হলেও এঁর নয়নযুগল কিঞ্চিত টেড়া হওয়ায় এঁর ব্যক্তিত্ব ছিল কাপালিকদের মতো ভীষণ, যা সম্ভবত এই নামকরণের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

সাধনা ও প্রতিভার গুণে মাত্র ১৮-১৯ বছর বয়সেই ইনি অতি উচ্চস্তরের তবলীয়া হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময়ে নেপাল রাজদরবারে আয়োজিত এক বিরাট সংগীত সম্মেলনে ইনি আমন্ত্রিত হন। সেখানে ভারতবিখ্যাত সেতারী ওস্তাদ নিয়ামতুল্লা খাঁর সঙ্গে একদিন এঁর সঙ্গতের সুযোগ ঘটে। এই দুই ধুরন্ধর সংগীতজ্ঞের সংগীতকলাতে সেদিন ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন ছন্দ-লয়-গৎ-তোড়াতে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এক সময়ে নিয়ামতুল্লা বলতে বাধ্য হন যে, ভৈরব সহায় তবলীয়া রূপে এক ফরিস্তা (দেবদূত), কারণ আমার যে-কোনো অতি কূট ছন্দলয়ের গৎতোড়ার আভাস ইনি আগে থাকতেই পেয়ে যান। সেই অনুষ্ঠানে এঁর গুণপনায় মহারাজা অত্যন্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হন। এবং বহু অর্থ বস্ত্রাদি পুরস্কারের সঙ্গে একটি তলোয়ার ও রাইফেল উপহার দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেন।

এঁর বহু শিষ্যের মধ্যে পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ (ভাগিনেয়), দুর্গাসহায় (পৌত্র), প্রতাপ মিশ্র, বীরু মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কার্তিকচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। ১৮৮৪ সালে এম এ. পাশ করার পরে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য ইনি বিলাত

যান। ফিরে এসে কিছুদিন সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাজ করার পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তারপরে তিনি আবগারি বিভাগের প্রথম ইন্‌সপেক্‌টর হন।

এঁর রচিত প্রথম কবিতা 'শ্মশানসংগীত' ১৮৮৩ সালের নভেম্বর মাসে 'নব্যভারত' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে থাকাকালীন ইনি অনেক ইংরাজি কবিতা রচনা করে 'Lyrics of Ind' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই সময়ে ইনি পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্যাও আয়ত্ত করেন। ১৯০৬ সালে তাঁর কৃষিবিদ্যা বিষয়ক 'Crops of Bengal' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

ইনি প্রধানত কবি ও নাট্যকার হলেও, গীত-রচনায়ও (বিশেষ করে হাসির গান) অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এঁর রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নেই। এঁর রচিত 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'পুনর্জন্ম', 'কল্কি অবতার', 'বিরহ'. 'পাষাণী', প্রভৃতি কাব্য ও সংগীত এবং 'চন্দ্রগুপ্ত', 'শাহজহান', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন', 'নূরজহান', 'প্রতাপসিংহ', 'তারাবাই' প্রভৃতি নাটক অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিল। এঁর রচিত 'আমার দেশ' জাতীয়সংগীতটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সর্বত্র গীত হত। ইনি 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্যিকদের একটি মিলন ক্ষেত্র করেছিলেন, যেখানে তৎকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিকেরা উপস্থিত থাকতেন।

এঁর রচিত দেশাত্মবোধক গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা', 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে' প্রভৃতি সেই যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এঁর হাসির গানগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য অছে বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক শ্রীদিলীপকুমার রায় এঁর পুত্র। ১৭ই মে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

রজনীকান্ত সেন
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গুরুপ্রসাদ

সেন। ওকালতি পাশ করে ইনি রাজসাহীতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

দেশাত্মবোধক ও ভক্তিরসাত্মক কবিতা ও গানের রচনার জন্য ইনি বিখ্যাত। ইনি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। এঁর রচিত 'বাণী', 'কল্যাণী', 'আনন্দময়ী', 'অভয়া' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর হাস্যরসাত্মক ও নীতিমূলক গান ও কবিতাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে এঁর রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'আমরা নেহাৎ গরীব', 'পাতকী বলিয়া কিগো' প্রভৃতি গানগুলি সেই যুগে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কবি হিসাবে ইনি প্রসিদ্ধ হলেও, গীতরচয়িতা হিসাবেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ক্যান্সার রোগে কলকাতার এক হাসপাতালে এঁর মৃত্যু হয়।

রাজা নবাবআলী খাঁ

(১৯শ শতাব্দী)

রাজা নবাব আলী খাঁ সীতাপুর জেলার আকবরপুরের এক ধনী জমিদার ছিলেন। পরে তিনি লাহোরবাসী হন। তাঁর জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ 'মারিফুনগামাত' গ্রন্থখানি ১৯১১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই হিসাবে এবং তৎকালীন অন্যান্য তথ্যাদি অনুসারে এঁর জন্ম সম্ভবত ১৮৬৫-৭৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে হয়েছিল।

ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। এঁর প্রারম্ভিক সংগীতশিক্ষা হয় ওস্তাদ কালে খাঁর কাছে। পরে ইনি ওস্তাদ নাজীর খাঁ ও ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁর কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। ওস্তাদ মুন্নে খাঁ ও সাদিক আলী খাঁ, কালিকা ও বিন্দাদীন মহারাজ প্রমুখ এঁর মিত্র ছিলেন। ইনি খুব ভালো হারমনিয়ম বাদক ছিলেন। প্রায় আট বছর ইনি সেতার বাদন শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ বরকতুল্লা খাঁ ও ইনায়ত খাঁর সেতার শোনার পরে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ হন এবং সেতার ছেড়ে দেন। তবে ধ্রুপদ, ধামার আদি গানে ইনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন।

ভাতখণ্ডেজী ভারত ভ্রমণকালে এঁর সঙ্গে পরিচিত হন। পণ্ডিতজীর

পাণ্ডিত্যে নবাবআলী অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর সভাগায়ক নাজীর খাঁকে শাস্ত্রজ্ঞানার্জন তথা লক্ষণগীতগুলি শেখার জন্য পণ্ডিতজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে নাজীর খাঁ প্রমুখের সহায়তায়, উর্দু ভাষায় ইনি উক্ত উত্তর-ভারতীয় সংগীত-গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই কার্যে ইনি ওস্তাদ মহম্মদআলীর কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। গ্রন্থখানি সংগীতজ্ঞ মহলে অত্যন্ত সমাদৃত এবং উচ্চশ্রেণীর (B. A.) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ সালে এর হিন্দী অনুবাদ এলাহাবাদ, হাথরস 'সংগীত কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাচা মিশ্র
(১৯শ শতাব্দী)

অনুমানিক ১৮৭০ সালে কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ তবলীয়া পণ্ডিত হরিসুন্দরের (বাচা মিশ্র) জন্ম হয়। তবলা বাদন এঁদের বংশগত অধিকার। শোনা যায় এঁর প্রপিতামহ প্রতাপ মহারাজ কিছুকাল তবলা চর্চা করার পরে, অতৃপ্ত হৃদয়ে বিন্ধ্যাচল পর্বতে চলে যান এবং সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে বহুদিন সাধনা করেন। অবশেষে একদিন তবলা বাদনে বিশ্বজয়ী হওয়ার বরলাভ করে ফিরে আসেন। তারপরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীতকলা প্রদর্শন করে তিনি অসাধারণ খ্যাতিলাভ এবং নিজেকে তবলাবাদনে 'ভারত সম্রাট' বলে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নেপাল রাজদরবারে সংগীত কলা প্রদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেই প্রতাপ মহারাজের পুত্র জগন্নাথ মহারাজ, জগন্নাথের দুই পুত্র শিবসুন্দর ও বলমোহন। উভয়ই উচ্চশ্রেণীর তবলীয়া ছিলেন। এঁদের মধ্যে শিবসুন্দর ছিলেন শ্রেষ্ঠ যাঁর পুত্র হল হরিসুন্দর মহারাজ বা বাচা মিশ্র/বাচাগুরু।

হরিসুন্দর ছিলেন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির এবং অসাধরণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী। নিষ্ঠা ও সাধনার গুণে ইনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন। সমকালীন প্রসিদ্ধ তবলীয়া নথু খাঁ (দিল্লী), আজীম খাঁ (বেরেলী) প্রমুখ এঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। ১৯২৬ সালে এই সংগীতজ্ঞের মৃত্যু হয়। এঁর সুযোগ্য পুত্র সামতা প্রসাদ বর্তমান সংগীত জগতের প্রতিষ্ঠাবান তবলীয়া।

মৌলবীরাম মিশ্র
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭০ সালে বেনারসের কবীরচৌরাতে কথক ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ তবলীয়া মৌলবীরাম মিশ্রের জন্ম হয়। এঁর পিতা বিহারীলাল অতি উত্তম সারেঙ্গী ও তবলা বাদক এবং কাশীরাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার কাছেই এঁর তবলা শিক্ষারম্ভ হয়। অসাধারণ প্রতিভা এবং সাধনার গুণে মাত্র দশ বছর বয়সেই ইনি গোয়ালিয়রের মহারাজা মধোসিং সিন্ধিয়ার কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি 'ভবানীপুর সংগীত সম্মেলন', 'মারবাড়ী এসোসিয়েসন' ইত্যাদি নানা সংস্থা থেকে বহু স্বর্ণপদক ও খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা জগৎকিশের আচার্যের কাছে ইনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি মৈমনসিংয়ের মুক্তাগাছার মহারাজার দরবারে নিযুক্ত হন।

এঁর ছোটভাই মুন্সীরাম ছিলেন অতি উত্তম সারেঙ্গী বাদক, যিনি বেনারসেই থাকতেন। বৃদ্ধাবস্থায় ভাইয়ের কাছেই ইনি থাকতেন এবং মহারাজার কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন। ১৯৪০ সালে বেনারসেই এঁর মৃত্যু হয়।

রামকৃষ্ণ বুয়াবঝে
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭১ সালে সাবন্তবাড়ির ওঁক্রা গ্রামে পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বুয়াবঝের জন্ম হয়। মাত্র ১০ মাস বয়সেই ইনি পিতৃহীন হন। শৈশবে মাতার সঙ্গে ইনি কাগল গ্রামে আন্নাসাহেব দেশপাণ্ডের কাছে আশ্রয়লাভ করেন। অল্প বয়স থেকেই এঁর অসাধারণ সংগীত-প্রতিভা লক্ষিত হয়। তাই দরিদ্র হলেও বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় ইনি সংগীত শিক্ষার সুযোগ পান এবং কালক্রমে প্রসিদ্ধিলাভ করেন

প্রথমে ইনি দরবারীগায়ক বলবন্তরাজ পোহরে এবং বিঠোবা আন্না হড়পের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে নানাসাহেব পানসে এবং তৎকালীন বিখ্যাত গোয়ালিয়র ঘরানার নিসার হুসেন খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা করেন। এছাড়া গুরুভাই শংকররাও পণ্ডিতের কাছেও ইনি তালিম

পেয়েছিলেন। তখনকার দিনে এঁর সুপ্রসিদ্ধ বন্দেআলী খাঁর বীণা এবং চুন্নাবাঈয়ের গান শোনার সুযোগ ঘটে। এই সকল অতিগুণী শিল্পীদের সহবতে এঁর বিদ্যা আরো মার্জিত হয়।

কিন্তু ওস্তাদদের সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব এঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে, তাই তখন থেকে ইনি সংগীত প্রচার ও সংগীত-গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেন। অবশ্য এঁর রচিত কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে সংগীত শিক্ষা ও প্রচারে ইনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। এঁর বহু শিষ্যের মধ্যে কেশরবাঈ কেরকর, হরিভাই ঘাংড়েকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিত্বময় প্রভাব, মধুর স্বভাব এবং অতি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৫ই মে এঁর মৃত্যু হয়।

অতুলপ্রসাদ সেন
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর ঢাকার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারে প্রখ্যাত কবি ও সংগীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পিতা রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু হওয়ায় ইনি মাতুলালয় পালিত হন।

বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়ার সময়ে ইনি পাশ্চাত্য চিত্র ও নাট্যকলা-বিদ্যায় বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। সেই সময়ে ইনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, যা পাশ্চাত্য সংগীতজ্ঞদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং ইনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন।

১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে রংপুরে ইনি কিছুকাল ব্যারিস্টারী করেন। তারপরে ইনি লক্ষ্ণৌ চলে যান এবং সেখানেই এঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পাঠ্যজীবন থেকেই ইনি সাহিত্যচর্চা করতেন। লক্ষ্ণৌতে তার পূর্ণ বিকাশ হয় এবং কবিখ্যাতি অর্জন করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এঁর উদার মনোভাব ছিল এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ইনি একাধিকবার "নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন" এবং "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে" সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। বেনারস থেকে এখনো "উত্তরা" নামে যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় সেটি এঁরই সম্পাদনায় জন্মলাভ করেছিল।

জীবনের বেশির ভাগ সময় ইনি লক্ষ্ণৌতে থাকার জন্য ভারতীয় উচ্চাঙ্গ গীতরীতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, যার পরিচয় এঁর রচিত গানগুলিতে পাওয়া যায়। এঁর রচিত পাঁচশতাধিক গান 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এঁর গানগুলি ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক 'কাকলি' নামক গ্রন্থে স্বরলিপি সহ ক্রমানুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এঁর রচিত গানগুলিতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঠুংরী, গজল, টপ্পা প্রভৃতি ছাড়া বাউল কীর্তন আদির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।

এঁর লেখা "হও ধরমেতে ধীর", "বল বল বল সবে" প্রভৃতি গানগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মৃত্যুর আগে ইনি এঁর সমস্ত সম্পত্তি নানা হিতকর কাজে দান করেন। ১৯৩৪ সালের ২৮শে আগস্ট এই মহান সংগীতজ্ঞ কবির মৃত্যুর হয়।

বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭২ সালের ১৮ই আগস্ট (শ্রাবণী-পূর্ণিমার দিন) মহারাষ্ট্রের করুন্দবাড় / করুদণ্ড (বেলগাঁও) নামক স্থানে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের জন্ম হয়। পিতা দিগম্বর গোপাল একজন উত্তম কীর্তনীয়া ছিলেন। কীর্তন গায়করূপেই এঁরা বংশ পরম্পরায় বিখ্যাত ছিলেন। এঁর জীবনে তাই সাত্ত্বিক সংগীতের সাধনাই ছিল মূলমন্ত্র।

মাত্র ১২ বছর বয়সে, দুর্ভাগ্যক্রমে, দীপালি উৎসবে বাজি পোড়ানোর সময়ে এঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, ফলে অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে সংগীতশিক্ষার জন্য এঁকে মিরাজে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুবার কাছে পাঠানো হয়। সেখানে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ইনি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীতসাধনা তথা গুরুর সেবা করেন।

শোনা যায় ইনি খুঁটির সঙ্গে টিকি বেঁধে রেখে একহাতে তানপুরা ও অপর হাতে বাঁয়া নিয়ে সারারাত্রিব্যাপী রেওয়াজ করতেন। এঁর প্রিয় শিষ্য ওঁকারনাথ ঠাকুর প্রায়ই গুরুভাগ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। গুরুর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তাঁর আওয়াজের সীমা ছিল পাঁচ সপ্তক পর্যন্ত। মন্দ্র সপ্তকাদিতে যখন তান প্রয়োগ করতেন তখন, যেন পৃথিবী কাঁপছে এইরূপ

উপলব্ধি হত। মনে হত যেন কোনো ট্রেন চলে গেল। দরবারী, মল্লার আদি রাগ যখন গাইতেন, কখনো কখনো মেঘগর্জন যেন প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হত। এমন ছিল তাঁর সংগীত-শক্তি।

সংগীতকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচার কল্পে ইনি মহারাষ্ট্র তথা ভারতের বহুস্থানে পরিব্রাজকের মতো ভ্রমণ করেছেন। ১৯০১ সালে লাহোরে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' এবং ১৯০৮ সালে এর শাখা বম্বেতে স্থাপন করেন। নাসিকে 'রামনাম আধার আশ্রম' স্থাপন করে সাধুর মতো জীবন যাপন করার সময়ে ইনি বৈদিক যুগের আশ্রম প্রণালীতে প্রায় ১০০ জন বিদ্যার্থীকে সংগীত-শিক্ষা দান করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে এঁর অজস্র শিষ্যদের মধ্যে অনন্তমনোহর যোশী, এ. টি. হারলেকর, ওঁকারনাথ ঠাকুর, নারায়ণরাও ব্যাস, বি. আর. দেওধর, বিনায়ক রাও পটবর্ধন প্রমুখ এবং সুযোগ্য পুত্র ডি. বি. পলুস্কর উল্লেখযোগ্য।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে শ্রীমতী রামাবাঈয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এঁর ১২টি সন্তানের মধ্যে ১১টি এঁর জীবিতাবস্থায়ই মারা যায়। দ্বাদশ সন্তানটি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম দত্তাত্রেয় পলুস্কর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মারা যায়।

ইনি সংগীত বিষয়ক প্রায় ৫০খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন রাগপ্রবেশ (২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ), সংগীতবালবোধ, বালপ্রকাশ, স্বল্পালাপ গায়ন সংগীত-তত্ত্বদর্শক, ভজনামৃতলহরী, মহিলাসংগীত, রাষ্ট্রীয় সংগীত, প্রভৃতি ১৯৩১ সালের ২১শে আগস্ট এই সংগীত পূজারীর তিরোধান ঘটে।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭৪ সালে রাজশাহীর কোনো এক গণ্ডগ্রামে ব্রজেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয় ৪।৫ বছরের সময়ে গৌরীপুরের (ময়মনসিংহ) রাজা রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বিধবা রানী এঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভাবান এই বালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুক্তাগাছার রাজা সূর্যকান্ত আচার্য এঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এঁর মতো বহুগুণ সমন্বিত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। সংগীত, অভিনয়

বিবিধ খেলাধুলা, জাদুবিদ্যা, কবিরাজী, কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজ, উচ্চস্তরের দর্জির কাজ, ঘড়ি ও তালার সূক্ষ্ম কাজ, কৃষিবিদ্যা (গার্ডেনিং), এমন-কি, জুতোর পালিশ, কোল্ড ক্রীম, জর্দা প্রভৃতির নির্মাণ-প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে এঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ ও শাস্ত্রগত অংশে ইনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তী এবং তাঁর শিষ্য মুরারীমোহন গুপ্তর কাছে ইনি মৃদঙ্গ, আব্দুল্লা খাঁ, ইমদাদ খাঁ, আমীর খাঁ ও হনুমানদাসজীর কাছে এস্রাজ এবং প্রখ্যাত সংগীতাচার্য দক্ষিণাচরণ সেনের কাছে ঔপপত্তিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

পরিণত বয়সে ইনি সংগীত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এঁর কলকাতার বাড়িতে আজও সংগীত গ্রন্থের একটি বিরাট সংগ্রহ আছে। ইনিই সর্বপ্রথম অহোবল রচিত ‘সংগীতপারিজাত’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ইনি যে সংস্কৃত সাহিত্যেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বোঝা যায়। এছাড়া কয়েকজন পণ্ডিতের সহায়তায় ইনি শার্ঙ্গদেব রচিত ‘সংগীতরত্নাকর’ গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ করেন। অতঃপর ইনি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গ্রন্থাবলীরও বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু মূল গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর অনুমতি না পাওয়ায় মুদ্রণ সম্ভব হয় নি।

ইনি একজন উচ্চস্তরের নাট্যরসিক ছিলেন। নাট্যক্ষেত্রেও এঁর অবদান কম নয়। নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠায় ইনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। গৌরীপুরে ইনি এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন, যার উদ্বোধক ছিলেন শিশিরবাবু। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় ইনি নিজেও অভিনয়াদি করতেন।

এঁর পুত্র অধুনা প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে ইনি বহু সংগীত-শিক্ষালাভেচ্ছুর শিক্ষা-ব্যবস্থা করেছিলেন। যার জন্য ইনি বহু ভারত প্রসিদ্ধ ওস্তাদদের যথাযোগ্য বেতন ও সম্মান সহযোগে কলকাতার ও গৌরীপুরের বাড়িতে রেখেছিলেন।

ইনি অসাধারণ দানশীল ছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়ে প্রথম দাতা হিসাবে ইনি একলক্ষ টাকা এবং যাদবপুর কলেজ স্থাপনের সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এঁকে দুবার মহারাজ' উপাধি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

গৌরীপুরে দেড়শ বিঘা জমির উপরে এঁর হাতে গড়া "বোটানিক্যাল গার্ডেন" যেখানে সর্বভারতীয় তথা পৃথিবীর বহুস্থানের গাছ-গাছড়ার সমাবেশ ছিল তা পাকিস্তান সরকারের হাতে পড়ে প্রায় ময়দামে পরিণত হয়েছে। এঁর মতো অনন্যসাধারণ প্রতিভাবানের সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের বক্তব্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গত ১৯৫৭ সালের ২৯শে নভেম্বর এই মহান প্রতিভার মৃত্যু হয়।

নথু খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭৫ সালে দিল্লী ঘরানার প্রসিদ্ধ তবলীয়া খলিফা নথু খাঁ'র জন্ম হয়। ইনি বম্বে নিবাসী ওস্তাদ বৌলাবকসের পুত্র এবং বড়া কালে খাঁর পৌত্র ছিলেন। তবলা বাদন এঁদের বংশগত অধিকারে। শৈশবে পিতার কাছে এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার গুণে অল্প বয়সেই ইনি সংগীতজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এঁর বাদন পদ্ধতি অত্যন্ত সুমধুর ও স্পষ্ট তথা স্বকীয়তাপূর্ণ ছিল। ইনি অসংখ্য টুকড়ে, পরণ প্রভৃতি রচনা করেছেন, যা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় সকলে জানতে পারে না, তবে ঘরানার ধারা হিসাবে প্রবাহিত। রেকর্ডের মাধ্যমে এঁর অতুলনীয় তবলা বাদন আজও সংগীতপ্রেমীরা শুনতে পান।

এঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পানুবাবু)
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭৭ সালে (১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে অগ্রহায়ণ) হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে বারাণসীর প্রবীণতম ধ্রুপদাচার্য প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (পানুবাবু জন্ম হয়। ইনি অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। পিতা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির এবং বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যুতে কাতর হয়ে তিনি কাশীবাসী হন। পানুবাবু ছিলেন চতুর্দশ সন্তান। শৈশবে লেখাপড়া, শরীরচর্চা

প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদাচার্য উপেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে সংগীতচর্চাও আরম্ভ করেন। অল্প বয়সেই ইনি ধ্রুপদগানে যথেষ্ট কুশলী হয়ে ওঠেন। কারো মতে ইনি ছিলেন অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য। অবশ্য ভারত ভ্রমণকালে ইনি যে-সকল গুণীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের কাছেও কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আগ্রার মুজফর খাঁ, কাশীর বাকর আলী খাঁ ও মিঠাইলালজী, জয়পুরের নেহাল সেন (তানসেন বংশীয়), প্রতাপগড়ের আব্বনখাঁ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে পানুবাবু 'সংগীতালংকার', 'সংগীতনায়ক', 'সংগীতরত্নাকর', 'সংগীতরত্ব', 'সংগীতশিরোমণি' প্রভৃতি উপাধিলাভ করেছিলেন। ইনি সংগীত-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছাপানোর জন্য কলকাতায় আসার পথে পাণ্ডুলিপিটি চুরি হয়ে যায়। প্রায় দশ বছরের পরিশ্রম এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। কিন্তু হতাশ না হয়ে, আবার তিনি গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই গ্রন্থে সংগীতের নানাবিধ তর্কপূর্ণ জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা এবং বহু ঘরানাদার ধ্রুপদ ধামার খেয়াল আদির সংগীত লিপি দেওয়া আছে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই সময়ে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর প্রচেষ্টায় ভারত সরকার তাঁর 'সংগীতসুধা' গ্রন্থখানি ১৪০০ টাকায় ক্রয় করে এবং দিল্লী নৃত্যনাট্য একাডেমী থেকে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ৬ই নভেম্বর এই প্রতিভাবান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

ফিরোজ ফ্রামজী
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৭৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি পুনার প্রসিদ্ধ সংগীতশাস্ত্রী ফিরোজ ফ্রামজীর বম্বেতে জন্ম হয়। শৈশবে পিতার মৃত্যু হওয়ায় ইনি মামার কাছে পালিত হন। বাল্যকাল থেকেই ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। গুরুজনদের বিরোধিতা এবং অনেক গঞ্জনা সহ্য করেও সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানে ইনি যেমন করে হোক যেতেন। হাত-খরচার পয়সা বাঁচিয়ে ইনি মাত্র ১২ বছর বয়সে 'ফিডেল' বাদন শিক্ষারম্ভ করেছিলেন।

১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে ইনি মাসিক ২৫ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। এই সময়ে ইনি কিছুদিন আইনচর্চারম্ভ করেছিলেন কিন্তু বিষয়টি এঁর মেজাজের পরিপন্থী হওয়ায় তা ত্যাগ করেন। ১৮৯৫ সালে মামারা এঁর বিবাহ দিয়ে দেন। তখন অর্থোপার্জনের জন্য নানা ব্যবসা ও চাকরীর চেষ্টা করেন কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হয় না। সেই সময়ে পুনার কণ্ট্রাক্টর নবরোজী সাহেব এঁকে বাঠার থেকে মহাবলেশ্বর পর্যন্ত ডাক পাঠানোর কাজে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করেন। ইনি তখন মহাবলেশ্বরে বসবাস করতেন। সেখানে এক সংগীতাসরে সেতার বাদন শুনে ইনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং সেতার বাদন শিক্ষারম্ভ করেন। সেই সঙ্গে নানাবিধ সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়নে ইনি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন।

১৯২২ সাল থেকে ইনি সংগীতশাস্ত্র-গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি ৩৬ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে 'সিতার গত্ তোড়ে সংগ্রহ', 'খেয়াল গায়কী', 'তানপ্রবেশ', 'ভারতীয় শ্রুতি স্বর—রাগশাস্ত্র', 'রাগ শিক্ষক', 'সংগীত লহরী', 'ফিরোজ রাগ সিরিজ', 'এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই মহান শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়।

কণ্ঠে মহারাজ
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৮০ সালে বেনারসে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তবলীয়াদের অন্যতম পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের জন্ম হয়। মাত্র নয় বছর বয়সেই পিসতুতো ভাই পণ্ডিত বলদেব সহায়ের (বাদ্যরসরাজ) কাছে এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। বছর তিনেক শেখার পরে গুরুজী নেপাল রাজদরবারে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। বালক কণ্ঠে মহারাজ তখন গুরুর অভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কিছুকাল পরে ইনিও গুরুজীর কাছে চলে যান। সেখানে ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার গুণে কালক্রমে ইনি ভারত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৫৪ সালে 'অখিল ভারতীয় তানসেন সংগীত সম্মেলনে' ইনি দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিট একক তবলা বাজিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ইনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বলতেন যে, আমি

অর্থোপার্জনের জন্য কলাপ্রদর্শন পছন্দ করি না। আমার শিল্প হল মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এবং আমার বিশ্বাস এর সেবাতেই আমার মোক্ষপ্রাপ্তি হবে।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাগিনেয় কিশন মহারাজ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু), রামনাথ মিশ্র, সামতা প্রসাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

ওস্তাদ বুন্দু খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৮০ সালে প্রসিদ্ধ সারেঙ্গী বাদক ওস্তাদ বুন্দু খাঁর জন্ম হয়। ইনি শুধু সারেঙ্গী বাদকই ছিলেন না, অতি উচ্চস্তরের গায়কও ছিলেন। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতির শতাধিক বন্দিশ এঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালে মাতামহ সৌঙ্গী খাঁর কাছে এঁর প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে ইনি মামা মম্মন খাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। সৌঙ্গী খাঁ বল্লভগড়ের এবং মম্মন খাঁ পাতিয়ালা স্টেটের দরবারী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ফলে ইনি উচ্চস্তরের বহু সংগীতজ্ঞের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। নিষ্ঠা এবং একাগ্র সাধনার ফলে অল্প বয়সেই ইনি অতি উত্তম জ্ঞানার্জন তথা খ্যাতিলাভ করেন।

ইন্দোরের মহারাজা তুকোজীরাও এঁর সংগীতে প্রভাবিত হয়ে তাঁর দরবারে নিযুক্ত করেন। সেখানেও বহু গুণীজনের সংস্পর্শে এঁর জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়। সেখানে একবার ভাতখণ্ডেজী আসেন; তাঁর কাছেও ইনি শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেন। প্রতিদানে ইনি ভাতখণ্ডেজীকে বহু বন্দিশ শিখিয়ে দেন। ১৯৩৪ সালে ইনি 'সংগীত বিবেক দর্পণ' নামে হিন্দীতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মালকোশ ও ভৈরবী রাগের বর্ণনা, তান প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে।

বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইনি বহু স্বর্ণপদক প্রভৃতি লাভ করেন। দিল্লী আকাশবাণী কেন্দ্রে ইনি বহুদিন কাজ করেছেন। ইনি অত্যন্ত কঠোর সাধনা করতেন, যার ফলে পায়ে বাতের ব্যথা হয়। এই ব্যথা ভোলার জন্য ইনি আফিম সেবন শুরু করেন। এই সম্পর্কে ইনি সকল শিষ্যদের সাবধান করে দিতেন। ১৯৪৮ সালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়ে ইনি স্বয়ং দিল্লীতে থাকলেও পরিবারকে লাহোর পাঠিয়ে দেন। পরে যখন তাঁদের আনতে যান

তখন কিছুদিনের জন্য, শিষ্যদের অনুরোধে হায়দারাবাদে (সিন্ধু) যেতে হয়। কিছুদিন পরে যখন ফিরে আসার ব্যবস্থা করছেন তখন হঠাৎ আসা-যাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক আরোপিত হওয়ার ফলে ইনি পাকিস্তানেই থেকে যান। ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারি করাচীতে এঁর মৃত্যু হয়।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮০ সালে (১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ, বৃহস্পতিবার) বিষ্ণুপুরে সংগীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। সংগীত ও চিত্রকলাবিদ্যায় এঁর সমান অনুরাগ ছিল। পিতা বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ অনন্তলাল যখন বিষ্ণুপুরের মহারাজা রামকৃষ্ণ সিংহকে গান শোনাতে যেতেন তখন বালক গোপেশ্বরকেও সঙ্গে নিতেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি পিতা ও অগ্রজ রামপ্রসন্নের কাছে সংগীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ইনি সুবিখ্যাত সংগীতপণ্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছেও সংগীতশিক্ষা করেন।

ধ্রুপদ, খেয়াল, আলাপ গান প্রভৃতিতে এঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বহু স্থানে সংগীত পরিবেশন করে ইনি প্রচুর খ্যাতি এবং স্বর্ণপদক ও উপাধিলাভ করেন। সংগীত-গুণপনায় এঁকে 'সংগীতনায়ক' উপাধি দান করা হয়। বিশ্বভারতী এঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়া ইনি ছিলেন দিল্লী জাতীয় সংগীত একাডেমীর ফেলো। ইনি প্রায় ২৯ বছর বর্ধমান রাজসভায় নিযুক্ত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর পরিবার ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

ইনি সংগীতের শাস্ত্রগত অংশেও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন, যার পরিচয় এঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া যায়; যেমন, 'তানমালা', 'গীতমালা', 'সংগীত-চন্দ্রিকা', 'সংগীতলহরী', 'গীত প্রবেশিকা', 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' প্রভৃতি। এঁর পুত্র রমেশচন্দ্র এবং শিষ্য সত্যকিংকর বন্দোপাধ্যায় বাংলার সংগীত জগতের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের অন্যতম। ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুলাই এঁর মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দীন খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮১ সালে ত্রিপুরার শিবপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ উজীর খাঁর শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ছিল সাধু (সদু) খাঁ এবং পিতামহের নাম সদার খাঁ। শোনা যায় সাধু খাঁ নাকি কিছুদিন কাশিম আলীর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তবে তা শুধু নাম-মাত্র। সেতার বাদনে আলাউদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয় পিতার কাছে। কিন্তু সেই শিক্ষাতে সংগীত-পিপাসু বালক তৃপ্ত হতে পারল না, তাই অল্প বয়সেই পালিয়ে এলো কলকাতায়।

সংগীতজ্ঞদের জীবনের ক্ষেত্রে এঁর মতো দুঃখকষ্টময় জীবন কদাচিৎ দেখা যায়। পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ তাই সুপাত্রে শিক্ষাদানে কখনো কার্পণ্য করেন নি। ফলস্বরূপ কয়েকজন দিগ্‌বিজয়ী সংগীতজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় এসে খাঁ সাহেব অকূল সমুদ্রে পড়লেন, ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। সেই দুর্দিনে, ভাগ্যক্রমে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (নুলোগোপাল) সঙ্গে এঁর দেখা হয়। এঁর করুণ কাহিনী শুনে গোপালবাবু এঁকে আশ্রয় দেন এবং গান শেখাতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে নন্দবাবুর কাছে তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দেন। অসাধারণ প্রতিভাবান বালক অল্পকালের মধ্যেই বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং খ্যাতিলাভ করেন। গোপালবাবুর মৃত্যুর পরে স্বামীজীর ভাই অমৃতলাল দত্তের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়, যাঁর কাছে ইনি বাঁশি, ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা বাদন শিক্ষারম্ভ করেন। প্রতিভাবান আলাউদ্দীন অল্পকালের মধ্যেই সব বিদ্যা আত্মসাৎ করে ফেলেন। তখন একদিন ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সরোদ বাদক দমদম নিবাসী আহমদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং চাকরের মতো তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। অনেক দিন সেবা করার পরে আহমদ খাঁ প্রসন্ন হয়ে এঁকে সরোদ বাদন শিক্ষাদানে সম্মত হন। কিছুকাল পরে আহমদ খাঁ এঁকে উত্তর প্রদেশের রামপুরে নিয়ে যান এবং বলেন যে, আমার বিদ্যা সবই তোমাকে দিয়েছি, এখন তুমি উজীর খাঁর কাছে যাও। এই বলে কিশোর আলাউদ্দীনকে তাঁর ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে যান।

সহায় সম্বলহীন আলাউদ্দীনের থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, এক মসজিদের কোণে পড়ে থাকতেন। উজীর খাঁ রামপুর মহারাজার দরবারী সংগীতজ্ঞ, তাঁর সঙ্গে দেখা করা সহজ নয়। কয়েকদিন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দারোয়ানদের কড়া পাহারা ভেদ করে ভিতরে যাওয়া ছিল অসম্ভব। সেই সময়ে নিজের সম্পর্কে ইনি এমন হতাশ হয়েছিলেন যে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চান, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেখানকার এক মৌলবী এঁকে নানা উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে এঁর মনের উৎসাহ ফিরিয়ে আনেন।

সেই মৌলবীর নির্দেশ মতো একদিন ইনি রামপুর মহারাজের গাড়ির সামনে দাড়িয়ে পড়েন। রাজার কাছে এঁকে ধরে আনা হল। আলাউদ্দীন তখন তাঁর সব কথা রাজার কাছে নিবেদন করলেন। এঁর কথায় মহারাজ অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং এঁর বসবাসের ব্যবস্থা এবং উজীর খাঁর কাছে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

অপরিসীম আনন্দিত মনে ইনি রোজ গুরুর কাছে যান, কিন্তু কোনোদিন দেখা পান না। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায় এবং রোজই ইনি গুরুর কাছে যান এবং হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। অবশেষে একদিন গুরুর দর্শনলাভ হয়। উজীর খাঁ এঁকে বলেন যে, এতদিন আমি তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা করেছি। তুমি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, আমি তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলাম। অসাধারণ প্রতিভাবান কিশোর তাঁর কাছে সরোদ, রবাব ও সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। সেই সময়ে ইনি অন্যান্য কলাকারদের কাছেও নানাবিধ সাংগীতিক বিষয় শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। এঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যে-কোনো যন্ত্র ইনি নিপুণ ভাবে বাজাতে পারতেন।

অতঃপর গুরুর অনুমতিক্রমে দেশভ্রমণে যান এবং কালক্রমে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। সেই সময়ে ইনি মৈহর স্টেটে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। পরে ইনি উদয়শংকরের দলে যোগ দেন এবং ইতালী, ফ্রান্স, জর্মানি, বেলজিয়াম, আমেরিকা প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

ইনি, কন্যা অন্নপূর্ণাকে সেতার ও সুরবাহার, রবিশংকরকে সেতার এবং পুত্র আলী আকবরকে সরোদ বাদন শিক্ষা দেন। মুসলমান হলেও ইনি ছিলেন নিরামিষভোজী এবং হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি আস্থাবান। এঁর অসংখ্য শিষ্য এবং বেহালা, সুরবাহার ও সরোদের অনেক রেকর্ড আছে।

এঁর অগ্রজ আফতাবুদ্দীন সংগীতের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাবান এবং অতি উচ্চস্তরের বংশীবাদক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল সাধুর মতো, মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন পরম কালীভক্ত। এই আপনভোলা শিল্পী কারো কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু সংগীতের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অকল্পনীয় দক্ষতা। এমন-কি, তিনি ন্যাসতরঙ্গও বাজাতে পারতেন। এঁর জন্ম ১৮৬৯ এবং মৃত্যু ১৯৩৩ সালে।

গত ১৯৭২ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর মৈহর মদিনা ভবনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

আব্দুল করিম খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮১ সালে সাহারানপুর জেলার কিরাণা নামক স্থানে ভারত বিখ্যাত আব্দুল করিম খাঁর জন্ম হয়। পিতা কালে খাঁ ও খুল্লতাত আব্দুল্লা খাঁর কাছে ইনি শৈশবে সংগীতশিক্ষা করেন। ইনি শ্রুতিধর তথা জন্মশিল্পী ছিলেন। সংগীত ছিল এঁর সহজাত, কষ্ট করে এঁকে তা আয়ত্ত করতে হয় নি। শোনা যায় মাত্র ছয় বছর বয়সে ইনি সাধারণ সংগীতাসরে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পান এবং পনের বছর বয়সে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়কদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন। সেই বয়সেই এঁকে বরোদার মহারাজা তাঁর সভাগায়কের পদে নিযুক্ত করেন।

১৯০২ সালে ইনি বম্বে যান, তারপরে মিরাজ ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করেন। এঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অসাধারণ সংগীত নৈপুণ্যের জন্য ইনি অল্পকালের মধ্যেই ভারত বিখ্যাত শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি গোবরহারবাণীর গায়ক ছিলেন। এঁর আলাপ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং গানে করুণ ও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য ছিল বেশি। ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি ভাবগীতিতেও ইনি সমান দক্ষ ছিলেন। এঁর ঠুংরী 'পিয়াবিন নাহি আবত চৈন', 'মত যাইও রাধে যমুনাকে তীর' প্রভৃতি গানগুলি তৎকালীন গুণীসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আজও এঁর রেকর্ডগুলিতে এঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মহারাষ্ট্রে মীর ও কণযুক্ত গায়কীর ইনিই প্রবর্তন করেন এবং এঁর সময় থেকেই প্রসিদ্ধ কিরাণা ঘরানা প্রসিদ্ধিলাভ করে।

১৯১৬ সালে খাঁ সাহেব পুনাতে 'আর্য সংগীত বিদ্যালয়' স্থাপন করেন, যার

একটি শাখা ১৯১৭ সালে বম্বেতে স্থাপিত হয়। এঁর শিষ্যদের মধ্যে হীরাবাঈ বড়োদেকর, রোসনারা বেগম, সরস্বতী রাণে, সুরেশবাবু মানে, রামভাই কুন্দগোলকর (সওয়াই গন্ধর্ব), বেহরে বুয়া, তারাবাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বম্বে থাকাকালীন ইনি একটি কুকুরকে অদ্ভুত ধ্বনি উচ্চারণ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে মাদ্রাজের এক সংগীত সম্মেলনে যোগদান করতে যান। সেখানকার কার্যক্রমের পরে এক বিশেষ অনুরোধে এঁকে পণ্ডিচেরিতে যেতে হয়। যদিও এঁর শরীর তখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল কিন্তু সুমধুর স্বভাবের এই প্রিয়ভাষী মানুষটি কারো অনুরোধ এড়াতে পারতেন না।

ট্রেনে ইনি অত্যন্ত অসুস্থবোধ করেন এবং 'সিংগপোয় মকোলম' স্টেশনে নেমে পড়েন। প্লাটফরমেই বিছানা পেতে বসে দরবারী রাগে ঈশ্বরোপসনা শুরু করেন। তখন মধ্যরাত্রি, অল্পক্ষণের মধ্যেই ইনি বিছানার লুটিয়ে পড়েন। সুরলোকের সন্ধানী খাঁ সাহেবের জীবনদীপ এইরূপ সাধকোচিত উপায়ে নির্বাপিত হয়। দিনটি ছিল ১৯৩৭ সালের ২৭শে অকটোবর।

ফিদাহোসেন খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮৩ সালে রামপুরের সহসবান ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ হৈদর খাঁর পুত্র ফিদাহোসেন খাঁর জন্ম হয়। শোনা যায় গোড়ার দিকে এঁর কণ্ঠস্বর নাকি অত্যন্ত কর্কশ ছিল, কিন্তু ইনি সুদীর্ঘ দশবছর শুধু সরগম এবং অলংকারাদি কঠোর ভাবে সাধনা করে অতুলনীয় কণ্ঠস্বর তৈরি করেন। ইনি সারারাত্রি ধরে রেওয়াজ করতেন। এঁর মতে, রাত্রিকালে সাধারণত মানবচিত্ত অলস বাসনাদিতে আচ্ছন্ন থাকে, সেই সময়ে সাধনারত থাকলে ব্রহ্মচর্য পালন তথা বাসনাদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সহজ হয়। তা ছাড়া রাত্রে শান্ত ও নিরুপদ্রব পরিবেশ পাওয়া যায়। অবশ্য একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য চিত্তের দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক।

এঁর সংগীতশিক্ষা পিতা হৈদর খাঁ ও মামা ইনায়ত হোসেন খাঁর কাছে হয়। ছোটোবেলায় ইনি পিতার সঙ্গে নেপাল রাজদরবারে ছিলেন। সেখানে ভগ্নীপতি মুস্তাক হোসেন ও ইনি রোজ সারারাত্রি ধরে রেওয়াজ করতেন।

ইনি সত্যিকারের সংগীত-প্রেমী ছিলেন। দিনরাত সংগীত নিয়েই মগ্ন থাকতেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ইনি ছয় ঘণ্টা রেওয়াজ করেছেন।

এঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমধুর ও বলিষ্ঠ ছিল, তানপুরার মতো এঁর আওয়াজ থেকে ঝংকার উৎপন্ন হত। মন্দ্র ষড়্জ থেকে অতিতার ষড়্জ পর্যন্ত ইনি সহজেই এক নিঃশ্বাসে যাওয়া আসা করতে পারতেন।

রামপুরে ফিরে আসার পরে ইনি বরোদায় রাজাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। সেখানে ইনি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সমকক্ষ গায়করূপে সম্মান লাভ করেছিলেন। প্রায় বিশ বছর সেখানে থাকার পরে ১৯৪০ সালে রামপুরের নবাব রজা আলীর আমন্ত্রণে সেখানে যান এবং সভাগায়ক রূপে আশ্রয় লাভ করেন। ১৯৪১ সালে ইনি সর্বপ্রথম বেতারে সংগীত পরিবেশন করেন। কয়েক বছর পরে অবসর গ্রহণ করে বাঁদাউ গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন সেইখানে ১৯৪৮ সালে এই গুণী শিল্পীর মৃত্যু হয়। এঁর শিষ্যদের মধ্যে পুত্র নিসার খাঁ, পৌত্র সরফরাজ খাঁ তথা রশিদ আহামদ, হাফিজ আহমদ, গুলাম মুস্তাফা, গুলাম সাবির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সবাই গন্ধর্ব

(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮৫ সালে কিরাণা ঘরানার প্রখ্যাত গায়ক সবাই গন্ধর্বের জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীরামভাই কুন্দগোলকর। ইনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সংগীত-প্রেমী ছিলেন। শোনা যায় এঁর কণ্ঠস্বর সংগীতের অনুপযোগী ছিল কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রম করে ইনি সংগীত বিদ্যালাভ করেন, তাই পরবর্তী কালে ইনি সবাই গন্ধর্ব নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এঁর সংগীত-গুরু ছিলেন কিরাণা ঘরানার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, যিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এঁকে শিক্ষাদান করেন।

ইনি কিরাণা ঘরানার শিক্ষা গ্রহণ করলেও অন্যান্য গায়কদের বৈশিষ্ট্যও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে নিজের গায়কী সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনের ২৪ বছর ইনি এক নাটক মণ্ডলীতে সফল স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ক্রমে ইনি বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে বিপুল সম্বর্ধনা ও খ্যাতি অর্জন করেন।

সংগীত শিক্ষক হিসাবেও ইনি সফল ছিলেন, যার সাক্ষ্য দেয় তাঁর শিষ্য মণ্ডলী। এঁদের মধ্যে গঙ্গুবাই হাঙ্গল, ভীমসেন যোশী, বাসবরাজ রাজগুরু, সরস্বতীবাঈ রানে, ইন্দ্রাবাঈ খাডিলকর; কাগলকর বুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৪২ সালে ইনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, চিকিৎসায় এর কিছুটা উন্নতি হলেও গান গাওয়া বন্ধ করতে হয়। এই ব্যবস্থা একজন শিল্পীর পক্ষে যে অবর্ণনীয় বেদনাদায়ক সেকথা বলাই বাহুল্য। অবশেষে এই বেদনা নিয়েই ইনি গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে পরলোক গমন করেন।

ফৈয়াজ হোসেন খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮৬ সালে আগরা ঘরানার অতুলনীয় গায়ক শিল্পী ওস্তাদ ফৈয়াজ হোসেন খাঁর জন্ম হয়। জন্মের কয়েক মাস আগেই এঁর পিতা সফদর হোসেন খাঁ মারা যান। মাতামহ গোলাম আকাস এঁকে পালন করেন। সংগীত-শিক্ষাও হয় তাঁর কাছে। ইনি অসাধারণ সংগীত-প্রতিভা এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। কিঞ্চিত মোটা হলেও এঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুরেলা ছিল। এঁর গান এমন প্রভাবশালী ছিল যে, শ্রোতারা কেঁদে ফেলতো। কিশোর বয়সেই ইনি সংগীত-শিল্পী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

১৯০৬ সালে মহীশূরের মহারাজা এঁর গানে মুগ্ধ হয়ে এঁকে স্বর্ণপদক ও নানা বস্ত্রাদি এবং ১৯১১ সালে 'আফতাবে মৌসিকী' উপাধি দান করেন। হায়দরাবাদের নিজাম এঁর গানে মুগ্ধ হয়ে এঁকে একটি হীরের আংটি দান করেন। ১৯১৫ সালে বরোদার মহারাজা এঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সভাগায়কের পদে নিযুক্ত করেন। রাজাশ্রয়ে থাকলেও বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলন ও রেডিয়োতে ইনি নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৯১৮-২০ সালে ইন্দোরের মহারাজা তুকাজীরাও হোল্‌কর হোলী উৎসবে গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এঁর গান শুনে মহারাজা এমন মুগ্ধ হন যে, নিজের হাতে একটি হীরের মালা পড়িয়ে এঁকে সম্মানিত করেন। এছাড়া তিনি এঁকে একটি হীরের আংটি ও দশহাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ইনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি সবরকম গানেই কুশল ছিলেন। এঁর স্বরপ্রয়োগ-কৌশল ও গায়কী আগ্রা ঘরানার

প্রতিনিধিত্ব করে, যার কিছু কিছু আভাস এঁর শিষ্যদের গানে পাওয়া যায়। ইনি অতি উত্তম রচয়িতাও ছিলেন, যার পরিচয় এঁর রচিত ঠুংরী 'বাজুবন্ধ খুল খুল যায়', জয়জয়ন্তী রাগের 'মোর মন্দিরবা লো নাহি আয়ে', যোগ রাগের 'মোর ঘর আয়ে', ললিত রাগের 'তরপত হুঁ যৈসে জল বিন মীন' বেহাগ রাগের 'ঝনঝন ঝনঝন পায়েল বাজে' প্রভৃতি গানে পাওয়া যায়। নিজস্ব রচনায় ইনি 'প্রেমপ্রিয়া' ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন। জয়জয়ন্তী, ললিত, দরবারী-কানাড়া, তোড়ী, সুঘরাই, রামকলী, পুরিয়া, পূরবী প্রভৃতি এঁর প্রিয় রাগ ছিল। ইনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। সুন্দর সুগন্ধযুক্ত পোশাকে আসরে আসতেন এবং আতরযুক্ত পান সর্বদা কাছে রাখতেন। এঁর আকৃতি বিশাল ও সুগঠিত ছিল। ১৯৫০ সালের ৫ই নভেম্বর এ র মৃত্যু হয়। এঁর বিশাল শিষ্যবর্গের নাম এঁর বংশতালিকায় দেওয়া হল।

হাফিজ আলী খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৮৮ সালে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ নানহে খাঁর পুত্র ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর জন্ম হয়। শোনা যায় এ র প্রপিতামহ গোলাম বন্দেগী খাঁ বাঙ্গাস আফগানিস্থান থেকে ভারতে ঘোড়ার ব্যাবসা করতে এসেছিলেন। তিনিই নাকি সর্বপ্রথম সরোদ যন্ত্রটি ভারতবর্ষে প্রচলন করেন, যা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন প্রায় আড়াইশত বছর আগে। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে, তবে এই বংশে সরোদ বাদন যে বহুকাল থেকে প্রচলিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাল্যকাল থেকেই হাফিজ আলীকে বংশগত রীতিতে সরোদ শিক্ষা দেওয়া হয়। পিতার মৃত্যুর পরে ইনি বেনারসের গনেশীপ্রসাদ চতুর্বেদীর কাছে ধ্রুপদ, ধামার, জয়পুরের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে সেতার এবং রামপুরের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ উজীর খাঁর কাছে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। তবে সরোদ বাদনেই ইনি এতদূর খ্যাতিলাভ করেন যে এঁকে সরোদের জাদুকর বলা হত।

১৯২০ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজা এঁর সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারে এঁকে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সালে শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞরূপে ইনি রাষ্ট্রপতির দ্বারা

পুরস্কৃত হন। ওই বছরেই ইনি সংগীত নাটক একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে ইনি 'আফতাবে সরোদ' উপাধিও লাভ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালেই ইনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম' এবং খয়রাগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. খেতাব লাভ করেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে রাগরূপের সুন্দরতম প্রকাশ এঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া বিদ্যুৎগতি তান ও ঝালার অধিকারী খাঁ সাহেবকে দেখতেও রূপবান রাজার মতো। যাঁরা এঁর সংগীত শুনেছেন তারাই শুধু সেই বিস্ময় উপলব্ধি করতে পারবেন। রাগরূপের উপযুক্ত পরিবেশ ও রসসৃষ্টির প্রতিই এঁর মনোযোগ, সাধারণ ওস্তাদদের মতো তবলীয়ার সঙ্গে হালকা সঙ্গতের লড়াই একেবারে পছন্দ করেন না। এঁর অসাধারণ সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে বহু কাহিনী শোনা যায়।

শেষ যখন কলকাতায় সুরেশ-সংগীত-সংসদে সম্বর্ধনাতে এসেছিলেন, ওস্তাদজী তখন আস্তে আস্তে হাতদুটি তুলে ধরে বলেন যে এই হাত আর চলে না, শ্রোতারা তখন অনেকেই চোখ মুছেছিলেন।

সরোদীয়া রহমৎ ও আমজাদ এঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র। এঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। শিষ্যদের মধ্যে কুমার জগৎনাথ মিত্র ও বিষণচাঁদ বড়াল উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধ বয়সে ইনি দিল্লীর ভারতীয় কলা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে এই অসাধারণ ক্ষমতাবান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

আহমদজান থিরকুয়া
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯১ সালে উত্তর ভারতের মুরাদাবাদে ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলীয়া আহমদজান থিরকুয়ার জন্ম হয়। এঁর পিতামহ কলন্দর বক্‌স খাঁ এবং মামা ফৈয়াজ খাঁ উত্তম তবলীয়া ছিলেন। শৈশবে তাঁদের কাছেই এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। পরে ইনি মীরাটের ওস্তাদ মুনির খাঁর (ফরক্কাবাদ ঘরানা) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ৪০ বছর ইনি একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশেষকরে ইনি দিল্লী ও ফরক্কাবাদ ঘরানার বাদক হলেও

প্রয়োজনবোধে যে-কোন ঘরাণার বাদন-বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে প্রদর্শন করতে পারেন।

ছোটোবেলা থেকেই এঁর আঙুলগুলি এমন ক্ষিপ্র ও চপলতাপূর্ণ ছিল যে এঁর গুরু এবং পাতিয়ালার ওস্তাদ আজীজ খাঁ আদর করে এঁকে 'থিরকু' বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে এই স্নেহের সম্বোধনটিই সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ইনি একক বাদনে এবং সঙ্গতে সমান দক্ষ। সাধারণত সঙ্গতকালে তবলীয়ারা কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়ে পড়েন, কিন্তু ইনি তার ব্যতিক্রম। বরং সুন্দর ও সুললিত ছন্দে স্পষ্ট বোল বাজিয়ে গায়ক বা বাদককে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রদর্শনে উৎসাহিত করেন। ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে ইনি সফলতার সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। এঁর একক বাদন যখন আকাশবাণীর কোনো কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় তখন সমগ্র দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীরা তা অতি মনোযোগসহ শুনে থাকেন। তবলীয়াদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ১৯৫০ সালে, রাষ্ট্রপতির কাছে সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ইনি বহুদিন রামপুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

এঁর বহু রেকর্ড আছে। ভারতের সকল উচ্চশ্রেণীর সংগীত-সম্মেলনে ইনি শ্রেষ্ঠ তবলীয়ার মর্যাদায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁর বহু শিষ্যের মধ্যে ভ্রাতা মহম্মদজান ও রোজবল লায়ল ছাড়া কেউ তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি। এঁর দুই পুত্র নবীজান ও আলীজান তবলা-চর্চা করেন তবে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি।

ইনি ফরুখাবাদ ঘরানার প্রতিনিধি হলেও সব ঘরানার বাদনেই দক্ষ ছিলেন। ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭৬ এই মহান তথা সর্বশ্রেষ্ঠ তবলা বাদকের মৃত্যু হয়।

কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯২ সালের ৬ই জানুয়ারি ঢাকার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মুড়পাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কেশবচন্দ্র ব্যানার্জীর জন্ম হয়। পিতা পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার, পরম সংগীত রসিক এবং দক্ষ হারমনিয়ম

বাদক। পিতামহ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উত্তম তবলা বাদক। পিতৃবন্ধু ব্রাহ্ম সমাজের চন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে প্রায়ই সংগীতের আসর বসত।

শৈশব থেকেই অসাধারণ প্রতিভাবান কেশবচন্দ্র খোল বাজাতে পারতেন। ৮।৯ বছর বয়সে বিখ্যাত সেতারী ভগবানদাসের ভাগিনেয় যদুনাথ দাসের কাছে ইনি সেতার শিক্ষারম্ভ করেন। পরে স্বয়ং ভগবান দাস এঁর শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেতার থেকে তবলার প্রতিই এঁর অধিক আগ্রহ দেখা যায়। ১২ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ আতাহোসেনের শিষ্য প্রসন্নকুমার বণিক্যের কাছে ইনি তবলা শিক্ষারম্ভ করেন। পরবর্তীকালে ইনি কিছুকাল দিল্লী ঘরানার ওস্তাদ নথ্ খাঁ'র কাছেও তালিম নেন।

ইনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী ছিলেন এবং বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। কণ্ঠসংগীতেও এর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং মোটামুটি গাইতে পারতেন। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করায় এঁর যথোচিত বিদ্যানুরাগ সূচিত করে। এঁর পাণ্ডিত্য এবং নানা গুণপনার জন্য ইংরাজ সরকার এঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৩০-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইনি ঢাকায় Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সমিতি' এঁকে সংগীতজ্ঞ হিসাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯৭২ সালে 'সুরেশ সংগীত সংসদ' এঁকে 'Musician of Bengal in Tabla' বলে সম্বর্ধিত করে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

ইনি আজীবন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীতের সাধনা ও সেবা করেছেন।

কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৪ সালের ২৬শে জুলাই গোয়ালিয়রের এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রসিদ্ধ সংগীত সাধক কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিতের জন্ম হয়। এঁর পিতা শংকর রাও পণ্ডিত গোয়ালিয়রের নিসার হোসেন খাঁর শিষ্য এবং অতিগুণী সংগীত সাধক ছিলেন। পিতার কাছেই এঁর সংগীতশিক্ষা হয়। বাল্যকাল থেকেই ইনি পিতার সঙ্গে বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনাদিতে সর্বদা সহযোগিতা করতেন।

পিতার মৃত্যুর পরে সেই সকল স্থানে সংগীত পরিবেশন করে ইনি পিতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ইনি পাঁচ বছর গোয়ালিয়র স্টেটের সংগীতজ্ঞ এবং এক বছর মহারাজা সাঁতরায় সংগীত-গুরু ছিলেন। তবে এইরূপ বন্ধন এঁর অপছন্দ ছিল। স্বাধীনভাবে থাকাই শ্রেয় মনে করেন। ইনি অতিগুণী গায়ক শিল্পী ও শাস্ত্রকার, ইনি কতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, 'সংগীত সরগম সার', 'সংগীত প্রবেশ', 'সংগীত আলাপ সঞ্চারী' প্রভৃতি।

মূলতানের সংগীতোদ্ধারক সমিতি 'গায়ক শিরোমণি', আহমদাবাদ অল ইণ্ডিয়া সংগীত বিভাগ 'গায়ন বিশারদ', গোয়ালিয়রের মহারাজা জয়াজিরাও সিন্ধিয়া (১৯৪৫ সালে) 'সংগীত রত্নাকর' এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি 'সংগীত নাটক একাডেমী'র পক্ষ থেকে একহাজার টাকা ও একখানি কাশ্মীরী শাল উপহার দিয়ে একে সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।

এঁর সুযোগ্য পুত্রেরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় পুত্র লক্ষণকৃষ্ণ অতি গুণী সংগীতজ্ঞ (বি. এ., সংগীত প্রবীণ) এবং দিল্লী আকাশবাণীতে মিউজিক প্রডিউসর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি বহুবার ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ও রেডিও সংগীত-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইনি লেখককেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

ইনায়ত খাঁ

(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৪ সালের ১৬ই জুন এটোয়া শহরে, ইমদাদখানি বাজের প্রবর্তক এবং সেতারের অদ্বিতীয় সাধক ওস্তাদ ইমদাদ খাঁর পুত্র ওস্তাদ ইনায়ত খাঁর জন্ম হয়। শৈশবে পরম্পরাগত রীতিতে পিতার কাছে ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি শিক্ষা করেন এবং ক্রমে সেতার ও সুরবাহার বাদন শিক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনি শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনও করেন এবং অল্প বয়সেই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান ইনায়ত খাঁ একনিষ্ঠ সাধনায় সেতার ও সুরবাহার বাদনের এমন উন্নতি বিধান করেন যে অনেকেই শেখার জন্য উৎসাহী

হয়েছিলেন। ইনি ইমদাদখানি বাজের যথোচিত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্রমে মহীশূর, বড়োদা, কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি নানা স্থানে সংগীতকলা প্রদর্শন করে ভারত বিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের অন্যতম রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

কিছুদিন ছোটো ভাই বহিদ খাঁর সঙ্গে ইন্দোর স্টেটে থাকার পরে ইনি কলকাতা আসেন। গুরুভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকিশোরের ইচ্ছানুসারে ইনি গৌরীপুর স্টেটের সংগীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই স্থায়ীরূপে বসবাস আরম্ভ করেন। বিভিন্ন রাগ বাজানোর সময়ে বহুবিচিত্র স্বর বিন্যাস এবং বিবাদী স্বরের অপরূপ প্রয়োগ এঁর বাদনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সংগীত-সম্মেলনে ইনি আমন্ত্রিত হন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় বালক বিলায়তকে দিয়ে সেই প্রোগ্রাম করানো হয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে খাঁ সাহেব কলকাতায় চলে আসেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই (১১ই নভেম্বর ১৯৩৮ খৃঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

এঁর সুযোগ্য পুত্র বিলায়ত খাঁ ও ইমরত খাঁ বর্তমান সংগীত জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম রূপে স্বীকৃত।

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
(১৯শ শতাব্দী)

জয়নগরের বিখ্যাত কথক মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের দৌহিত্র বিখ্যাত গায়ক ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আনুমানিক ১৮৯০-৯৫ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁর পিতা রামসেবকও একজন সুগায়ক ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান ধীরেন্দ্রনাথ শৈশবেই মাতুল সংগীতরত্নাকর অঘোর চক্রবর্তীর গান শুনে সংগীতের প্রতি অনুরাগী হন।

১৯১০ খৃস্টাব্দে জয়নগর স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ইনি সংগীত শিক্ষার্থে কলকাতায় চলে আসেন। সংগীতাচার্য যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন একটি মেসে থাকতেন, ধীরেন্দ্রনাথ ঘটনাচক্রে সেই মেসেই আশ্রয় নেন। একদিন যোগীনবাবু এঁর কণ্ঠ শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেন। ওদিকে আবার সুসময়ের প্রমাণ স্বরূপ ব্যাঙ্কের বড়োবাবু এঁকে একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন।

১৯১২ সালে, এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠানে, কোনক্রমে অনুমতি পেয়ে সংগীত পরিবেশন করে ইনি সমবেত গুণী জ্ঞানী ওস্তাদদের মুগ্ধ করেন। ১৯১৩ সালে যোগীনবাবু, মহিমবাবুর কাছে এঁর গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তী জীবনে ইনি পশুপতি মিশ্র, রাধিকা গোস্বামী, লছমী প্রসাদ, গোয়ালিয়রের মহম্মদ সুজন খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছে সংগীতশিক্ষা করেন। আজীবন ছাত্রের মতো এঁর নম্রতা ও শিক্ষার অদম্য স্পৃহা ছিল, কোনো অহমিকা এঁর চরিত্রে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি। ৬৭ বছর বয়সেও ইনি বলেছেন যে, 'উপযুক্ত গুরু পেলে শিক্ষার আগ্রহ আছে'। এঁর রচিত 'রাগ পরিচয়' গ্রন্থে ইনি ১৭৮টি রাগের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন।

গত ১৯৬৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোক গমন করেন।

নন্দলাল

(১৯শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৮৯৫-৯৬ সালে বেনারসে সুপ্রসিদ্ধ সানাই বাদক নন্দলালের জন্ম হয়। এঁর পিতা শুদ্ধরামজী এবং পিতামহ বাবুলালজীও প্রসিদ্ধ শানাই বাদক ছিলেন। সংগীতময় পরিবেশে বর্ধিত হওয়ায় ছোটোবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি এঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং অসাধারণ প্রতিভা লক্ষিত হয়। তবে লেখাপড়ার প্রতি এঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। তাই মাত্র চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর বেশি আর স্কুলের শিক্ষা এগোয় নি।

বাল্যকালে পিতার কাছেই এঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষারম্ভ হয়। পরে দিল্লীর প্রসিদ্ধ সানাই বাদক ওস্তাদ ছোটে খাঁর কাছে ইনি শিক্ষারম্ভ করেন। ইনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সুষির বাদকের পক্ষে গায়কী-জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক; তাই ক্রমে ইনি বেনারসের বিখ্যাত রামদাসজী ও ওস্তাদ হুসেন খাঁর কাছে খেয়াল ও ঠুংরী এবং হরিনারায়ণ মুখার্জী ও পানুবাবুর কাছে ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতির গায়কী শিক্ষা করেন। এছাড়া ইনি বেনারসের দরবারী সংগীতজ্ঞ রামগোপালজী ও রামসেবকজীর কাছেও সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কণ্ঠ সংগীতেও ইনি সুদক্ষ ছিলেন। তবে ইনি সানাই বাদক রূপেই ছিলেন প্রসিদ্ধ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত। পিতা শুদ্ধরামজী বেনারস রাজ-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইনি সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এঁর সানাই প্রায় শোনা যায়। ইনি বহু ডিস্‌ক রেকর্ড করেছেন; যারমধ্যে সিন্ধুভৈরবী, মুলতানী, পুরিয়া, কেদার, চৈতী প্রভৃতি রাগের রেকর্ডগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৮ সালে "বেনারস সংগীত-সম্মেলনে" এঁর অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে প্রসিদ্ধ ধনী বলদেব প্রসাদ একজোড়া রুপার সানাই উপহার দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেন।

এঁর দুই পুত্র কহ্নাইয়ালাল ও শ্যামলাল আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন এবং ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন।

বীরু মিশ্র
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৬ সালে বেনারসের পিয়ারী নামক স্থানে পণ্ডিত ভগবানপ্রসাদের পুত্র পণ্ডিত বীরু মিশ্রের জন্ম হয়। এঁর পিতা উত্তম তবলীয়া ছিলেন, যাঁর কাছে এঁর প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়। কিছুকাল পরে এঁর পিতা তাঁর গুরু বিশ্বনাথজীর কাছে পুত্রকে সংগীতশিক্ষার জন্য পাঠান। তবে তবলার প্রতিই এঁর আকর্ষণ বেশি ছিল। পরবর্তীকালে ইনি লক্ষ্ণৌ ঘরানার ওস্তাদ আবেদহোসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেরেলীর ওস্তাদ ছন্নু খাঁর (?) কাছেও নাকি ইনি তবলা-শিক্ষা করেছেন।

ভারতের বহুস্থানে ইনি সংগীতকলা প্রদর্শন করে প্রচুর খ্যাতি, অর্থ ও পদকাদি অর্জন করেন। একদিন নেপাল থেকে এঁর আমন্ত্রণ আসে, সেখানে এঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে এঁকে রাজদরবারে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ৪০ বছর বয়সে, ১৯৩৬ সালে এই মহান প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট)
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৭-৯৮ সালে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের জন্ম হয়। শুভ জন্মাষ্টমীতে জন্ম হওয়ায় নামকরণ হয়েছিল কৃষ্ণ। বংশে বা বাড়িতে তেমন সংগীতচর্চা না থাকলেও বাল্যকাল থেকেই এঁর অসাধারণ সংগীত-প্রতিভা প্রকাশ পায়। কানে শুনেই নানা ধরনের গান ইনি সুন্দরভাবে

গাইতে পারতেন। ফলে নানাস্থানে পরিচিত হন, এইরূপে পরিচয় ঘটে বিখ্যাত ধনী ও শৌখিন হরেকৃষ্ণ শীলের সঙ্গে। যাঁর ছিল এক সখের থিয়েটার, সেখানে ইনি স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় এবং সখীদলের প্রধান হয়ে গান গাইতেন। সর্বপ্রথম ইনি অভিনয় করেন 'সীতা' নাটকে, এবং পরবর্তী কালে আরো বহু নাটক ও ছবিতে অভিনয় করেছেন।

১৩-১৪ বছর বয়সে একদিন স্কুলে হঠাৎ মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়, যার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরদিন জ্ঞান ফিরে আসে বটে, কিন্তু চোখে নেমে আসে চিরঅন্ধকার। এই অপূরণীয় ক্ষতিতে ইনি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। বহুদিন বাড়িতে কাটাবার পরে সকলের চেষ্টা ও সান্ত্বনায় নিষ্ঠুর ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সংগীতকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করে তার চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেন।

প্রথম গুরু ছিলেন শশীভূষণ দে, খেয়াল গায়ক ; পেশায় ছিলেন আইনজীবী তবে সার্থক সুর সাধক। এছাড়া ইনি বহু গুণীর কাছে শিক্ষা ও সহযোগিতালাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে টপ্পাগায়ক ও তবলীয়া সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজান বাঈ, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, দর্শন সিং, কেরামতুল্লা খাঁ, বাদল খাঁ, অমরনাথ ভট্টাচার্য, সতীশ দত্ত, রাধারমণ দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁর একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মল্লবীর গোবরবাবু (যতীন্দ্রচরণ গুহ) যাঁর আর একটি পরিচয় অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে, তা হল তাঁর সংগীত চর্চা। তিনি কৌকভ খাঁ ও পরে কেরামতুল্লা খাঁর কাছে দীর্ঘদিন সেতার বাদন শিক্ষা করেন। তাঁর পিতা অম্বিকাচরণ গুহ (অম্বু গুহ) শুধু একজন শৌখিন মল্লযোদ্ধা তথা বাংলাদেশে কুস্তিচর্চার অন্যতম প্রচলনকর্তাই ছিলেন না ; সংগীতজ্ঞদের মুক্তহস্তে পৃষ্ঠপোষকতা করাও ছিল তাঁর আর-এক পরিচয়। এই বংশের অনেকেই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিণত বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় সব রীতির গানেরই সুগায়করূপে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা থেকে বাংলা কাব্য-সংগীত, এমন-কি, পদাবলী কীর্তন পর্যন্ত। ১৯৩২ সালে 'চণ্ডীদাস' ছবিতে গান ও অভিনয় করে চিত্র জগতেও সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এঁর গাওয়া 'ফিরে চলো আপন ঘরে' ও 'সেই বাঁশি বাজিয়েছিলে' গানগুলি রেকর্ড জগতে সর্বাধিক বিক্রয়ের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ শচীনদেব বর্মন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ মান্না দে উল্লেখযোগ্য।

অচ্ছন মহারাজ
(১৯শ শতাব্দী)

১৯শ শতকের শেষের দিকে লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রসিদ্ধ নর্তক অচ্ছন মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ প্রসাদ। পিতা কালিকা-প্রসাদ এবং খুল্লতাত বিন্দাদীন মহারাজ সংগীতজগতে নৃত্যশিল্পী হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। কালিকাপ্রসাদের তিন পুত্র। অচ্ছন, লচ্ছন, ও শম্ভুমহারাজ। এঁরা প্রত্যেকেই সংগীতজগতে সুপরিচিত। অচ্ছন মহারাজ তো বিংশ শতাব্দীর 'নৃত্য-সম্রাট' হিসাবেই স্বীকৃত।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৃত্যই ইনি বিশেষরূপে প্রদর্শন করতেন। এঁর শরীর যদিও কিছুটা ভারী ছিল কিন্তু প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল ভাষাময় এবং সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিপূর্ণ। শৃঙ্গার, বীর, প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল রকম রসযুক্ত নৃত্যেই ইনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ছন্দ ও লয়ের কারিগরীতেও ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়; ঘুঙুরের ঝংকারে তবলার বিভিন্ন বোল নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করে দর্শকদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দিতেন। ঠুংরী গান গেয়ে বা কোনো উর্দু শের (কবিতা) আবৃত্তি করে, নৃত্যে তার ভাবপ্রকাশ করাও এঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সুকোমল কোনো স্ত্রী-ভূমিকায় যখন ইনি নৃত্য করতেন তখন মনে হত সত্যিই যেন কোনো স্ত্রীলোক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন।

শোনা যায় বিভিন্ন ঘরানার নৃত্য সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা চুরি হয়ে যায়। অতি উচ্চস্তরের কলাকার হলেও ইনি অত্যন্ত নিরহংকারী, শান্ত, সৌম্য ও সহৃদয় প্রকৃতির ছিলেন। এঁর পুত্র বিরজু মহারাজ বর্তমান নৃত্য জগতের প্রতিভাবান এবং যশস্বী কলাকার। ১৯৫০ সালের ২৯ শে মে এই মহান কলাকারের মৃত্যু হয়।

ওঁকারনাথ ঠাকুর
(১৯শ শতাব্দী)

প্রাক্তন বরোদা রাজ্যের কামবে জেলার ঝাজ (জহাজ) গ্রামে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২৪শে মে, গোয়ালিয়র ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। এঁর মতো কলা ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই গভীর জ্ঞানী সাধারণত ওস্তাদদের মধ্যে দেখা যায় না। বাল্যকাল থেকেই ইনি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন। সংগীতশিক্ষা বা শোনার জন্য ইনি যে কোনো কষ্ট সানন্দে স্বীকার করতেন। এই প্রসঙ্গে অনেক কাহিনী শোনা যায়।

এঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে, এঁর জন্ম যে যোদ্ধার বংশে হয়েছিল সেকথা বোঝা যায়। পিতামহ মহেশশংকর ঠাকুর নানাসাহেব পেশোয়ার বিশ্বস্ত অনুচর এবং সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান সহচর ছিলেন। পিতা গৌরীশংকর ঠাকুর ছিলেন বরোদা রাজ্যের সামরিক রাজকর্মচারী। মাত্র ছয় বছরের সময় পিতৃহীন হয়ে দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন। তখন ঠাকুর-চাকর এই সব নানা কাজ করে কোনোমতে পেট চালাতে থাকেন। সেই দিনে এক-বার রামলীলাতে অভিনয় করার যোগাযোগ ঘটে এবং প্রকাশ পায় তাঁর অনন্য-সাধারণ সংগীতপ্রতিভা। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে বম্বের এক ধনী বৃদ্ধ পার্শীর সহায়তালাভ করেন এবং ১৯১০ সালে সংগীতাচার্য বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিভার গুণে অল্পকালের মধ্যেই ইনি গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন। তখন দিবারাত্রে ইনি অন্তত বারো ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। ১৯১৬ সালে গুরুদেব এঁকে লাহোর 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে'র অধ্যক্ষ করে পাঠান। ক্রমে বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনে যোগদান করে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন সম্মেলনগুলি এখনকার মতো জলসামুখী ছিল না। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে নানা বাদবিতণ্ডার নিষ্পত্তি হত। ওঁকারনাথ রচিত সংগীত গ্রন্থ 'প্রণবভারতী', 'সংগীতাঞ্জলি'র কতকগুলি সংখ্যা (১-৬/৮ খণ্ড ?) তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

গুরুর প্রতি ছিল এঁর গভীর শ্রদ্ধা। পরিণত বয়সে ইনি প্রায়ই বলতেন যে, আমার গুরুভাগ্য খুব ভালো। খেয়াল গায়ক হলেও ইনি ধ্রুপদ, ঠুংরী আদি

গানেও খুব পারদর্শী ছিলেন। ঠুংরীগান অত্যধিক শৃঙ্গার রসাত্মক হওয়ায় ইনি ঠুংরীর ঢঙে ভজন গাইবার এক নবীন গায়ন-শৈলীর প্রবর্তন করেন। এঁর গাওয়া ভজন 'যোগী মৎ যা—', 'মৈয়া মোরী মৈ নহী মাখন খায়ো', 'রে দিন কৈসা কাটিয়ে', জাতীয়সংগীত 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছে। মালকোশ, আড়ানা প্রভৃতি রাগে ইনি সিদ্ধ ছিলেন। আলাপ, বহলাবে, তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতিতে পূর্ণ সমন্বয় সাধন করে, বলিষ্ঠ ও সুমধুর কণ্ঠস্বর সহযোগে ইনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তা যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন।

ইনি শুধু কণ্ঠশিল্পীই নন, ইনি ছিলেন সংগীতসাধক ও পরিপূর্ণ শিল্পী। তার সঙ্গে ইনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। এঁর কোনো নেশা ছিল না। নিরামিষ আহার করতেন। বিদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সাঁতার কাটার খুব সখ ছিল। কলার প্রতি কোনোরূপ অবহেলা তিনি সহ্য করতেন না। একবার গোণ্ডলের মহারাজা এঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে শ্রোতাদের আসন গায়কের মঞ্চ থেকে উঁচুতে ছিল। তা দেখে তিনি মন্তব্য করেন যে, গানের শেষে আমাকে মাটিতে বসতে দিলেও আমার আপত্তি নেই কিন্তু কলাপ্রদর্শনকালে নয়। মহারাজ লজ্জিত হন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ইনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে সুরটের ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৩৩ সালে লণ্ডনে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত আঘাত পান। ইতিপূর্বেই তাঁর দুই ছেলের মৃত্যু হয়েছিল। অতঃপর সংগীতোপাসনাতে ইনি আত্মনিয়োগ করেন। নাদব্রহ্মের উপাসনাই হয় তাঁর মূলমন্ত্র, যা তিনি তাঁর গুরুর কাছে পেয়েছিলেন।

নেপাল, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়ম, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর বহুস্থানে সংগীত-পরিবেশন করে ইনি প্রভূত যশ ও অর্থলাভ তথা ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এঁকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মণ্ডলীর প্রধান রূপে আফগানিস্তানে পাঠান। এছাড়া ১৯৫৩ সালে বুদাপেস্ত ও ১৯৫৪ সালে জার্মানীতে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে কলকাতা 'রাজকীয় সংস্কৃত

মহাবিদ্যালয়'-কর্তৃক 'সংগীতমার্তণ্ড' এবং ১৯৪৩ সালে কাশীর 'বিশুদ্ধ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়'-কর্তৃক 'সংগীত সম্রাট' উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার এঁকে পদ্মশ্রী উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন।

১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার (রাত্রি দেড়টায়) এই মহান সংগীত সাধকের তিরোধান ঘটে।

বিনায়করাও পটবর্ধন
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৮ সালে মিরাজে, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের সুযোগ্য শিষ্য বিনায়করাও পটবর্ধনের জন্ম হয়। এঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় খুল্লতাত কেশবরাও পটবর্ধনের কাছে। ১৯০৭ সালে ইনি পণ্ডিতজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইনি গুরুর সঙ্গে নানাস্থানে ভ্রমণও করতেন। শিক্ষান্তে ইনি গুরুর ইচ্ছানুসারে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে'র বম্বে, নাগপুর ও লাহোর শাখাতে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন ইনি, গান্ধর্বের নাটক মণ্ডলীতেও কাজ করেছেন। ১৯৩২ সালে স্থাপিত গান্ধর্ব বিদ্যালয়ের পুণার শাখাতে ইনি স্থায়ীরূপে শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন তথা আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি তরানা গানে অতি নিপুণ ছিলেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ইনি তরানা গেয়ে থাকেন। তবলীয়ার সঙ্গে সওয়াল-জবাব ইনি পছন্দ করেন। এঁর অনেকগুলি রেকর্ড আছে, যার মধ্যে জয় জয়ন্তী রাগের রেকর্ডখানি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সংগীতের উন্নতিসাধন তথা সংরক্ষণ সংকল্পে ইনি সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ 'রাগ বিজ্ঞান' গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন ও সমকালীন বহু রাগের খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, তরানা প্রভৃতির বন্দিশ সংগীত লিপিসহ প্রকাশ করেছেন। বিগত ২৩শে আগষ্ট ১৯৭৫ সালে এই মহান শিল্পীর তিরোধান ঘটে।

কাজি নজরুল ইসলাম
(১৯ শতাব্দী)

১৮৯৯ সালের ২৪শে মে, বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। কৈশোরে অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখেই ইনি য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। সেখানেই ক্রমে এঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ হয়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে ইনি স্বদেশী মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন।

প্রথম জীবনে রচিত বিদ্রোহী কবিতাটির জন্য ইনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমে এঁর রচিত বহুবিধ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এঁর রচিত 'সর্বহারা', 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশি', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু হিল্লোল', 'ছায়ানট', 'সন্ধ্যা', 'অগ্নিবীণা' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে এর অজস্রতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি 'ভাটিয়ালি', 'বাউল', 'ভক্তিমূলক', 'কীর্তনাঙ্গ', দেশাত্মবোধক, গীত, গজল মহালয়ার চণ্ডীবন্দনা-গান প্রভৃতি। আড়াই সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন বলে শোনা যায়। অবশ্য বহু গান সংরক্ষণের অভাবে বর্তমানে লুপ্ত।

১৯৬০ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে এঁকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় হল, বিগত বহু বছর যাবৎ ইনি কঠিন ব্যধিতে জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এঁকে ঢাকায় নিয়ে বিবিধ সম্বর্ধনায় সম্মানিত করেছেন। এঁর সুযোগ্য পুত্র কাজি অনুরুদ্ধ, কাজি সব্যসাচী প্রমুখ ললিতকলার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

হাবিবুদ্দীন খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৯ সালে আজরারা ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ শম্মু খাঁর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ তবলীয়া হাবিবুদ্দীন খাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতার কাছেই এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। পিতার মৃত্যুর পরে ইনি দিল্লী ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ নথু খাঁর শিষ্যত্ব

গ্রহণ করেন। পিতার কাছে আজরারা ঘরানার এবং নথু খাঁর কাছে দিল্লী ঘরানার তালিম পেলেও ইনি অন্যান্য ঘরানার বাদন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে তথা আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগীত পরিবেশন করে ইনি অসাধারণ খ্যাতিলাভ এবং নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। লক্ষ্ণৌর এক সংগীত সম্মেলনে এঁকে 'সংগীত সম্রাট' উপাধি দান করে সম্মানিত করা হয়। ইনি অত্যন্ত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুপুরুষ ছিলেন।

দুখের বিষয় বিগত প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এক উৎকট রোগে পাগল প্রায় থাকার পরে ১৯৭৫ সালে এই প্রতিভাবান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্র রমজান খাঁ (দিল্লী বেতার), মনমোহন দীক্ষিত (দিল্লী বেতার), সুধীর সাক্সেনা (বড়োদা), উকিল মোহনবাবু (এলাহাবাদ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর

(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বম্বের এক সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকারর জন্ম হয়। এঁর ডাকনাম ছিল 'আন্না'। পিতা শ্রীনারায়ণ গোবিন্দ অত্যন্ত সংগীত প্রেমী ছিলেন, তিনি পুলিশ বিভাগে চাকুরী করলেও নিয়মিত সেতার-সাধনা করতেন। তখনকার দিনের সামাজিক পরিবেশ সংগীত শিক্ষার প্রতিকুল ছিল কিন্তু এঁর পিতা ছিলেন সংস্কার মুক্ত, তিনি এঁর প্রতিভা লক্ষ্য করে কৃষ্ণানন্দ ভট্ট হোনাবরের কাছে এঁর সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিছুকালের মধ্যেই ইনি আশানুরূপ উন্নতিলাভ করলে এঁকে পণ্ডিত অনন্তবুয়ার কাছে নিযুক্ত করা হয়। গোবিন্দজীর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাতখণ্ডেজীর মিত্রতা ছিল, যিনি পণ্ডিতজীকে একদিন আন্নার গান শোনার জন্য নিয়ে আসেন। বালকের গান শুনে পণ্ডিতজী খুশি হন এবং প্রশ্ন করেন যে, ক্রমানুসারে সপ্তকের সব স্বরোচ্চারণ করতে পার? আন্না তৎক্ষণাৎ স্বরগুলি গেয়ে শোনালেন। বালকের প্রতিভায় পণ্ডিতজী যথেষ্ট আশা প্রকাশ করেন।

কিন্তু পিতার অবসর গ্রহণের পরে এঁকে স্বগ্রামে চলে যেতে হয় এবং অর্থাভাবের জন্য সংগীত-চর্চা ও লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১২ সালে ইনি বম্বে ফিরে আসেন এবং ভাতখণ্ডেজীর আনুকুল্যে আবার সংগীত চর্চা আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী এঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বাবুরাও বলে ডাকতেন। ১৯১৬ সালে বড়োদাতে প্রথম 'অখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে ইনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১৭ সালে ইনি বড়োদার মহারাজের কাছে ছাত্র বৃত্তি লাভ করে সংগীত শিক্ষার্থে গোয়ালিয়ার যান এবং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেইখানেই ইনি ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বরোদা কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে ইনি দিল্লী ও বারাণসীতে 'অখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সংগীত শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২২ সালে আই. এ. পাশ করে বম্বে চলে আসেন। ১৯২৩ সালে গুজরাট কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেই সময়ে অর্থাভাবের জন্য ইনি আহমদাবাদ গার্লস স্কুলে সংগীতের শিক্ষকতা করেন। জীবনের নানা অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ইনি লক্ষ্যে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯২৬ সালে বম্বের উইলসন কলেজ থেকে ইনি বি. এ. পাশ করেন। মারাঠি ও ইংরাজীর সঙ্গে ইনি হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষাতেও যথেষ্ট জ্ঞানী। ইতিপূর্বে ইনি ভাতখণ্ডেজী স্থাপিত 'শারদা সংগীত মণ্ডলী' ও 'লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে' শিক্ষকতা করছিলেন। ১৯২৬ সালে ইনি, লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হন।

ইনি বহু রেকর্ড করেছেন এবং অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষাদান করেছেন। লেখক স্বয়ং এঁর কাছে সংগীত বিশারদের অন্তিম পরীক্ষা দিয়েছেন। 'সংগীতশিক্ষা', 'তানসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কয়েকটি গীতিনাট্য ইনি রচনা করেছেন। ১৯৪২ সালে সংগীত বিদ্যাপীঠ থেকে 'সংগীতাচার্য' এবং ১৯৫৭ ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দান করে সম্মানীত করেছেন।

১৯২৯ সালে এঁর বিবাহ হয়েছিল। এঁর তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা। অবসর গ্রহণ করে সপরিবারে ইনি বম্বেতে ছিলেন। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ তাঁর মৃত্যু হয়।

বিলায়ত হুসেন খাঁ
(১৯শ শতাব্দী)

১৮৯৬ সালে শের খাঁর পৌত্র এবং নথন খাঁর পুত্র আগরা ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়ক বিলায়ত হুসেন খাঁর জন্ম হয়। ইনি রাজপুত মলকদাসের বংশধর। এঁর পিতাও প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, তিনি মহীশূর-রাজার সভাগায়ক ছিলেন। শৈশবেই পিতৃহীন হয়ে, দূর সম্পর্কের পিতামহ মহম্মদ বক্সের কাছে জয়পুরে চলে যান এবং সেখানে দত্তকপুত্ররূপে বাস করেন। সেখানে ইনি মহম্মদ বক্স এবং করামৎ খাঁর কাছে সংগীতশিক্ষা শুরু করেন। জয়পুরে থাকাকালীন ইনি তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ গুণীদের সাহচর্যলাভ করেন যা পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত লাভদায়ক হয়। এই ঘরানার আর একটি উজ্জ্বল রত্ন ফৈয়াজ খাঁ সম্পর্কে এঁর ভাই ছিলেন। তিনি এঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোথাও গাইবার সময়ে সর্বদা এঁকে আগে কিছুক্ষণ গাইতে দিতেন। এমন-কি, ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গেও ইনি কিছু কিছু স্বরবিন্যাস করতেন, খাঁ সাহেবের সঙ্গে এঁর তরুণ কণ্ঠস্বর মিলে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

ইনি ১৯৩৫-৪০ সালে মহীশূর দরবারে এবং পরে কাশ্মীর দরবারে সভাগায়ক রূপে ছিলেন। কাশ্মীরে থাকাকালীন ইনি রাজকুমারীকে সংগীতশিক্ষা দিতেন। এঁর স্বভাব অত্যন্ত মধুর ও মিশুক প্রকৃতির ছিল। ইনি স্বয়ং আত্মপ্রশংসা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন অর্থাৎ সাধারণ শিল্পীকেও ইনি খুব প্রশংসা করতেন। প্রাচীন পরিবেশে বর্ধিত হলেও শিক্ষাদানের ব্যাপারে ইনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। —বলতেন আমি যা জানি সব শিখিয়ে যেতে চাই। এঁর শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে পুত্র ইউনুস খাঁ, ভাই লতাফৎহুসেন খাঁ, অঞ্জনীবাঈ, ইন্দ্রাবাঈ, সরস্বতীবাঈ, শ্রীমতী নার্ভেকর, পণ্ডিত জগন্নাথ বুয়া প্রমুখ উল্লেযোগ্য।

ইনি বিলম্বিত লয়ে গান শুরু করে চৌগুণ, আটগুণ আদি নানাবিধ লয়ে বড়ৎ-ফিরত সহ তান, বোলতান প্রভৃতি প্রয়োগ করে গানকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও চমকপ্রদ করে শ্রোতাদের বিস্মিত করতে পারতেন।[১]

---

১. এঁর রচিত "সংগীতজ্ঞোঁকে স্মরণ" বহু সংগীতজ্ঞদের জীবনী তথা কিছু কিছু উপদেশ সম্বলিত একখানি সার্থক গ্রন্থ।

এমন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখময় ছিল। শৈশবেই পিতার মৃত্যু, কৈশোরে পিতামহ ও যৌবনে ১৯২০ সালে বড়োভাই মহম্মদ খাঁ'র মৃত্যু এঁকে অত্যন্ত বিব্রত ও অসহায় করে। ভাইয়ের মৃত্যুর পরে সারাজীবন শিক্ষকতা করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হয়। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার এঁকে আকাশবাণীর একজন উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত করেন। ১৯৫১ সাল থেকে এঁর অসুস্থতা আরম্ভ হয়। এঁর মৃত্যু যেমন আকস্মিক তেমনি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আকাশবাণীতে এঁর শেষ অনুষ্ঠান হয় ১৯৬২ সালের ১২ই মে ; ১৮ই মে তালিম দিতে যাবার সময়ে পথে হঠাৎ অসুস্থবোধ করেন এবং কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই এই মহান শিল্পীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ডঃ বি. আর. দেবধর
(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯০১ সালে দক্ষিণ ভারতের মিরাজ নামক স্থানে সংগীতাচার্য ডঃ বি. আর. দেবধরের জন্ম হয়। পিতার নাম রঘুনাথরাও দেবধর। এঁর প্রারম্ভিক সংগীতশিক্ষা হয় আন্নাজী পন্থ, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নীলকণ্ঠ বুয়া প্রমুখের কাছে। পরে ইনি পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সংগীতশিক্ষার সঙ্গে লেখাপড়ার প্রতিও এঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এঁকে বিবিধ কাজ করে নিজের খরচ চালাতে হত। ১৯৩০ সালে ইনি বি. এ. পাশ করেন।

ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষার প্রতিও এঁর খুব আগ্রহ ছিল। প্রফেসর জি. ক্রিঞ্জির কাছে ইনি পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষা করেন।

১৯৩২ সালে প্যালেস্টাইন নগরে আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে ইনি ভারতীয় সংগীতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সময়ে নেতাজীর সহায়তায়, সেখানকার বহু প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে মহত্বপূর্ণ ভাষণদানের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের সহায়তায়, সংগীতের উচ্চ অধ্যয়নের জন্য আবার বিদেশ ভ্রমণ করেন।

ইনি কয়েক বছর বম্বের 'স্কুল অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক'-এর প্রধান আচার্যরূপে কাজ করেছেন। প্রায় বিশ বছর ইনি প্রসিদ্ধ 'সংগীতকলা বিহার' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কয়েক বছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংগীতকলা ভারতী'র অধ্যক্ষরূপেও কাজ করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক কুমার গন্ধর্বকে ইনি কিছুদিন শিক্ষাদান করেন। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু রাগের কতগুলি বন্দিশ ইনি রচনা করেছেন। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'রাগবোধ' নামক সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ এঁরই অবদান।

বর্তমানে ইনি অবসর গ্রহণ করে, রাজস্থানের বাসাগাঁও নামক স্থানে জীবনের শেষ অধ্যায় অতিবাহিত করছেন।

পি. সাম্বমূর্তি
(২০শ শতাব্দী)

১৯০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত পি. সাম্বমূর্তির জন্ম হয়। পিতা পীচু আয়ার রেলে চাকরী করতেন। মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় এঁর মা অতি কষ্টে এঁকে পালন করেন। তিনি এঁকে পৌরাণিক কাহিনীমূলক গাথা গানগুলি প্রায়ই গেয়ে শোনাতেন। সেই গীতিকাব্যগুলি সাম্বমূর্তি বিবাহ উৎসবাদিতে গাইতেন ফলে অতি অল্প বয়স থেকেই গাইবার অভ্যাস এবং অর্থোপার্জন দুই-ই হত। মাদ্রাজের এক পাঠশালায় এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। ওই পাঠশালার এক সংগীত-প্রেমী তথা সুগায়ক শিক্ষকের কাছে ইনি সংগীতশিক্ষার প্রেরণালাভ করেন। ১২ বছর বয়সে এঁর সংগীতশিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথমে বৈদহু কুপ্পিয়ার কাছে এক বছর বেহালা, এবং পরে পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তির কাছে বাঁশি শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বংশীবাদক ব্যংকটরামা শাস্ত্রীর কাছেও ইনি সাহায্যলাভ করেছেন। রোজ সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বাঁশি বাজানো এঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। ১৯১৬ সালে ছাত্রবৃত্তির সহায়তায় এঁর স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯২২ সালে এঁর বিবাহ হয়।

১৯২৪ সালে ইনি পাদ্রী H. A. Popley'র সংস্পর্শে আসেন। তিনি এঁকে তাঁর গ্রীষ্মকালীন পাঠশালার সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৯২৭ সালে সাম্বমূর্তি ওই পাঠশালার অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ১৯২৮ সালে ইনি কুইন

মেরী এবং লেডী ওয়েলিংটন ট্রেনিং কলেজে মিউজিক লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। অসাধারণ শিক্ষানুরাগী সাম্বমূর্তির পড়াশুনাও ওই সময়ে চলতে থাকে। ক্রমে ইনি খ্যাতিমান হন এবং পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষার জন্য জার্মানীর একটি একাডেমী থেকে ছাত্রবৃত্তিলাভ করেন। ১৯৩১ সালে ইনি সমগ্র য়ুরোপ ভ্রমণ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের কাছে বেহালা, বাঁশি ও Harmony সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ওই সময়ে ইনি বার্লিন, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে সংগীতকলাও প্রদর্শন করেন এবং ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বৃন্দবাদন (Orchestra) সম্বন্ধেও ইনি গভীর জ্ঞানলাভ করে দেশীয় বৃন্দবাদনের উন্নতিবিধান করেন। ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি 'বৃন্দবাদন' শোনাবার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানে বিভিন্ন সংগীতসংস্থা থেকে এঁকে 'গান্ধর্ব বেদবিশারদ', 'সংগীতকলা সিথমণি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়, এবং দেশবিদেশের পণ্ডিতেরাও এঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার এঁকে 'সংগীতশাস্ত্র প্রবীণ' উপাধি-ভূষিত করে সম্মানিত করেন।

সংগীত সম্বন্ধে ইনি বহু গ্রন্থ ইংরাজী ও তামিল ভাষাতে রচনা করেছেন, যার মধ্যে Dictionary of South Indian Music and Musicians, History of Indian Music, The Teaching of Music, South Indian Music (5 Vols.), Great Composers (2 Vols.), Great Musicians, South Indian Musical Instruments, Indian Melodies, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ। এর অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ইনি একাধারে কবি, শাস্ত্রকার, সংস্কারক, গায়ক, তথা বেহালা, বাঁশি ও প্রদর্শন-বীণাবাদক। এঁর মতো বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমরা এঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নারায়ণরাও ব্যাস
(২০শ শতাব্দী)

১৯০২ সালে কোলাপুরে পণ্ডিত নারায়ণরাও ব্যাসের জন্ম হয়। পিতা গণেশরাও ব্যাসও সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তথা সেতার বাদনে যত্নশীল ছিলেন।

শৈশবেই নারায়ণের অসাধারণ সংগীত প্রতিভা লক্ষিত হয়, কিন্তু সেই দিনে কোলাপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞেরা ছিলেন মুসলমান এবং সংস্কারবশতঃ তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণে পিতামাতার আপত্তি ছিল। সংযোগবশতঃ ১৯১০ সালে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর তাঁর শিষ্যমণ্ডলীসহ কোলাপুরে আসেন এবং সংগীত পরিবেশন করে জনসাধারণকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেন। তখন গণেশরাও তাঁর দুই পুত্র শংকর ও নারায়ণকে পণ্ডিতজীর কাছে সংগীতশিক্ষার জন্য পাঠানোর সংকল্প করেন। ১৯১০ এবং ১৯১৩ সালে যথাক্রমে দুই ভাইকে পণ্ডিতজীর কাছে পাঠানো হয়। ১৯২১ সালে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' থেকে এঁরা 'সংগীতপ্রবীণ' উপাধিলাভ করেন। ১৯২৩ সালে আহমদাবাদে স্থাপিত সংগীতবিদ্যালয়ে নারায়ণ রাও শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমে বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে এবং আকাশবাণীর মাধ্যমে ইনি প্রভূত যশ ও অর্থলাভ করেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এঁকে অসংখ্য পদক ও উপাধি দান করে সম্মানিত করা হয়েছে। যেমন 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' থেকে 'সংগীত প্রবীণ' ও 'গায়নাচার্য', সিন্ধু প্রদেশ থেকে 'সংগীতরত্ন', পঞ্জাব প্রদেশ থেকে 'তানকে কাপ্তান', 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় মণ্ডল' থেকে 'সংগীতমহামহোপাধ্যায়' ও ডি. লিট্ ইন মিউজিক' এবং জলন্ধর থেকে বহু পদক এবং প্রথম শ্রেণীর সংগীতজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি।

এঁর গাওয়া রেকর্ডগুলির মধ্যে ভৈরব রাগের 'জাগো মোহন প্যারে' এবং তিলককামোদ রাগের 'নীর ভরণে কৈসে জাঁউ' গান দুখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শোনা যায় ইনি কয়েকখানি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯২৭ সালে এঁরা দুই ভাই 'ব্যাস সংগীত বিদ্যালয়' নামে একটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কিছুদিন আগে এঁর বড়ো ভাই শংকরের মৃত্যু হয়েছে।

বড়ে গোলাম আলী খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৩ সালে লাহোরে পাঞ্জাব ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর জন্ম হয়। সংগীত এঁদের বংশগত পেশা। শৈশবে পিতা

আলীবক্‌স কম্মুরবালে ও পিতৃব্য সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ কালে খাঁ এবং আশীক আলীর কাছে বংশগত তালিম পান, পরবর্তী জীবনে কঠোর সাধনা ও প্রতিভার গুণে যার চরমতম বিকাশ হয়। শোনা যায় প্রথম জীবনে অর্থোপার্জনের জন্য ইনি নাকি সারেঙ্গী বাজাতেন।

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পরে খাঁ সাহেব পাকিস্তানে (করাচী) গিয়ে বসবাস শুরু করেন, কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ভালো না লাগায় তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন। ভারত সরকার এঁকে যোগ্য সম্মান সহযোগে গ্রহণ তথা 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইনি অজস্র সম্বর্ধনা লাভ করেছেন, তেমনি ইনিও এঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের এমন প্রাধান্য দিতেন যে শেষ বয়সে পঙ্গু শরীর নিয়েও বার বার আসরে এসে গান শুনিয়েছেন। ১৯৬০ সালে ইনি দারুণ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন এবং অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েন। ১৯৬১ সালে মহারাষ্ট্র সরকার এঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

ইনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, সুমধুর স্বভাব ও মিশুক প্রকৃতির। পথে কোনো ভিখারী হাত পাতলে, পকেটে হাত দিয়ে, খুচরা বা টাকা যা হাতে উঠতো সব দিয়ে দিতেন। ইনি অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং প্রচুর খেতে পারতেন। সঞ্চয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, যা উপার্জন করতেন সব খরচ করে ফেলতেন। ঘরানা প্রসঙ্গে ইনি বলতেন যে, 'এর দোহাই দিয়ে লোক যা-তা করছে, ফলে রাগ সম্বন্ধে নানা মতভেদ হয়েছে'। মুদ্রাদোষ প্রসঙ্গে বলতেন যে, কোনোরূপ মুখভঙ্গি না করে, বেশী জোর না দিয়ে স্বাভাবিক আওয়াজে স্বর সমূহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

অকৃতদার কালে খাঁ এই বংশের শ্রেষ্ঠ গায়ক-শিল্পী হিসাবে স্বীকৃত। তিনি অসাধারণ সংগীত প্রতিভা ও অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। খেয়াল, ঠুংরী আদি গায়ক হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অতি উত্তম বীণকারও ছিলেন সে কথা অনেক পরে জানা যায়। তিনি কলকাতাতে মাত্র এক বছর বা কিছু বেশিদিন ছিলেন, কিন্তু তাতেই তিনি এমন খ্যাতিমান হয়েছিলেন যে, বড়ে গোলাম আলী ছাড়া তেমন আর কোনো সংগীতজ্ঞ হন নি।

বড়ে গোলাম আলীর শিষ্যদের মধ্যে পুত্র মুনব্বর আলী, প্রসূন ও মীরা

বন্দোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখ-যোগ্য। এঁর স্বরচিত ঠুংরী রেকর্ডগুলি বহুকাল রসিক সমাজের মনোরঞ্জন করবে। ১৯৬৮ সালের ২৩শে এপ্রিল এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

লচ্ছন মহারাজ
(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯০৩ সালে, লক্ষ্ণৌতে প্রসিদ্ধ নর্তক লচ্ছন মহারাজের জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম বৈজনাথ, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কালিকাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র। নৃত্য এঁদের বংশগত পেশা। এঁর শিক্ষারম্ভ হয় পিতৃব্য বিন্দাদীনের কাছে। ক্রমে কত্থক নৃত্যের সঙ্গে অন্যান্য নৃত্যেও ইনি উত্তম দক্ষতা অর্জন করেন।

বিন্দাদীনের মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন যুবক লচ্ছন মহারাজ। অল্প বয়সে অত্যধিক ধনসম্পদ হাতে আসায় ইনি অত্যন্ত বিলাসী ও খামখেয়ালী হয়ে ওঠেন। কালক্রমে ধনসম্পদ নিঃশেষিত হয়। তখন অর্থচিন্তায় প্রথমে রামপুর, পরে হৈদরাবাদ, বিকানীর প্রভৃতি নানাস্থানে কলাপ্রদর্শন করে অর্থোপার্জন আরম্ভ করেন। কিন্তু এঁর বিলাসিতার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না, তাই ইনি ছায়াচিত্রের প্রতি মনোযোগী হন। বর্তমানে ইনি বম্বেতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ইতিমধ্যে ইনি অনেকগুলি চিত্রের নৃত্য পরিচালনা করেছেন।

বাইচাঁদ বড়াল
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৪ সালের ১৯শে অক্টোবর (৩রা কার্তিক ১৩১১) কলকাতার এক ধনী পরিবারে সুপ্রসিদ্ধ সংগীতগুণী এবং সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের জন্ম হয় (স্থান ?)। পিতা লালচাঁদও উত্তম সংগীত সাধক ছিলেন এবং বাড়িতে নিয়মিত সংগীতচর্চা এবং সংগীতাসর রচনার ব্যবস্থা ছিল। এই উপলক্ষে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিশ্বনাথ রাও, রমজান খাঁ প্রমুখ অতিগুণী সংগীতজ্ঞদের যাতায়াত ছিল। অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অতি উচ্চস্তরের সংগীত পরিবেশে রাইচাঁদ বড়ো হয়েছেন এবং ভারতের বহু গুণীর সান্নিধ্যলাভ করেছেন। প্রথম

জীবনে ইনি উক্ত গুণীদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। ক্রমে গান ও সরোদ বাদন শিক্ষা করেন। ইনি মজিত খাঁর কাছে সঙ্গত, দাদার গুরু মুস্তাক হোসেন খাঁর কাছে গান এবং মেজদার গুরু হাফেজ আলী খাঁর কাছে সরোদ শিক্ষা করেন।

১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানির আমল থেকেই ইনি আকাশ-বাণীর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে এঁর অবদান চিরস্মরণীয় কারণ বেতার অনুষ্ঠান প্রচার-ব্যবস্থার ইনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক। এছাড়া ইনি নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। সেখানে ইনি ছিলেন সংগীত পরিচালক। প্রায় ৬০ খানা ছবিতে ইনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। এঁর প্রথম ছবি 'চাষার মেয়ে' ১৯৩০ সালে মুক্তিলাভ করে। এঁরই পরিচালিত 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে সর্বপ্রথম প্লেব্যাক ব্যবস্থার প্রচলন হয়। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক কে. এল. সায়গল এঁরই আবিষ্কার। নানা প্রতিকূল অবহাওয়ার মধ্য দিয়েও ইনি 'পুরাণ ভকত' ছবিতে সায়গলকে প্রথম গান গাইবার সুযোগ করে দেন। এই বিষয়ে তৎকালীন অনেকে এঁকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলেও সেই পক্ষপাতিত্ব যে এঁর কতখানি দূরদৃষ্টির পরিচয় তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংগীত তথা ছায়াছবির ক্ষেত্রে এঁর অবদান অপরিসীম।

ইনি 'সাগর সঙ্গম' ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেছেন। এতবড় গুণী হলে কি হয়, ব্যবহারে নেই কোনো অহংকার বরং কথাবার্তায় ও ব্যবহারে ইনি অত্যন্ত আমুদে, রসিক এবং সহানুভূতিশীল।

দবীর খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৫ সালের ১৪ই আগস্ট, রামপুরে, তানসেন কন্যা-বংশীয় ওস্তাদ উজীর খাঁর পৌত্র এবং নাজির খাঁর পুত্র ওস্তাদ দবীর খাঁর জন্ম হয়। ইনি ভারতীয় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রই দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। তাছাড়া সকল প্রকার গায়নরীতি সম্বন্ধেও এঁর অদ্ভুত জ্ঞান এঁর অসাধারণ প্রতিভা ও বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তবে ইনি ধ্রুপদ, ধামার গায়ক ও বীণকার হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত।

ছোটোবেলা থেকেই এঁর অনন্যসাধারণ সংগীত প্রতিভা সকলের মনোযোগ

আকর্ষণ করে। পিতামহ উজীর খাঁ তাই বলেছিলেন যে, এখন আর আমার বংশীয় সংগীত সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। উজীর খাঁর কাছেই এঁর শিক্ষারম্ভ হয় বংশগত রীতিতে। তাঁর কাছে ইনি ধ্রুপদ, ধামার গান এবং বীণাবাদন শিক্ষা করেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের অন্যতম ওস্তাদ দবীর খাঁ ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রচুর খ্যাতি ও ধন, অর্জন করেন এবং সেই সঙ্গে 'ডক্টর অব মিউজিক', 'সংগীত সম্রাট' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। আকাশবাণীর নানা কেন্দ্র তথা অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রায়ই এঁর সংগীত প্রচারিত হয়ে থাকে। এঁর পুত্র সব্বীর খাঁ বর্তমানে সংগীত সাধনায় রত।

এঁর স্থাপিত 'তানসেন' এবং 'সদারঙ্গ' মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপালের পদে ইনি নিযুক্ত আছেন। বর্তমান কালের অধিকাংশ সংগীতজ্ঞেরাই এঁর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই মহান প্রতিভার মৃত্যু হয়।

বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৫ সালে মৈমনসিংহের গৌরীপুরে এক বিখ্যাত জমিদার বংশে বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দান ধ্যানের ক্ষেত্রে ছিলেন ভারতবিখ্যাত। তিনি যে চিরকাল ভারত বিখ্যাত বহুগুণী সংগীতজ্ঞকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে বাড়িতে রাখতেন সে কথা আজ সর্বজনবিদিত। সংগীতময় পরিবেশের প্রভাবে শৈশবেই বালকের সংগীত প্রতিভার বিকাশ হয়। প্রথমে ইনি এস্রাজ শিক্ষারম্ভ করেন হাবুদত্তর (স্বামীজীর ভ্রাতা) শিষ্য শীতল মুখার্জীর কাছে। শীতলবাবু খেয়াল ও ঠুংরী গানেও পারদর্শী ছিলেন। সুকণ্ঠী বালক তাই তাঁর কাছে কণ্ঠসংগীতের চর্চাও আরম্ভ করেন। তবে পাঠ্যাবস্থায় সংগীত চর্চায় তাঁর প্রতি কিঞ্চিত বাধা নিষেধ ছিল। তবে যখন ইনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন এঁর বিবাহ হয় এবং তারপরে ওই বিধি নিষেধ শিথিল হয়ে যায়।

অতঃপর ইনি ইনায়ত খাঁ ও আমীর খাঁর কাছে সংগীতশিক্ষারম্ভ করেন। তখন এঁর প্রিয় যন্ত্র ছিল সুরবাহার। তারপরে ধ্রুপদ, আলাপ, রবাব, বীণ, সরোদ প্রভৃতি শিক্ষা করেন বিভিন্ন অতিগুণী সংগীতজ্ঞদের কাছে। এঁর অন্যান্য গুরুবর্গের মধ্যে আছেন আব্দুল্লা খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, ইনায়ত হোসেন খাঁ, এস. চৌধুরী, কেরামতুল্লা খাঁ (সরোদ), খয়েরুদ্দীন খাঁ, দবীর খাঁ, মহম্মদ-আলী (রবাব), মহম্মদীন খাঁ, মামুদ খাঁ, মেহদীহোসেন খাঁ, সগীর খাঁ, হরি-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হাফিজ আলী খাঁ (সরোদ) প্রমুখ সংগীতজ্ঞেরা।

১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঋষি অরবিন্দের প্রেরণায় এঁর শিল্পী-জীবন ধন্য হয়। বহুবার ইনি তাঁকে বাজনা শুনিয়েছেন। দেশবিভাগের পরে ইনি কলকাতা চলে আসেন। মেগাফোন কোম্পানি থেকে এঁর প্রথম বীণ বাদনের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে ইনি রবীন্দ্র-ভারতীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে ইনি রাষ্ট্রপতির কাছে 'ফেলো অব দি একাডেমী' সম্মান লাভ করেন।

সংগীত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে এঁর অদম্য উৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারাজীবন ইনি নানা সংগীত সংস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। সর্বত্রই এঁর নিয়মিত উপস্থিতি ও উৎসাহদান এঁর অসাধারণ সংগীতপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেয়। বিগত ৪ঠা জুলাই ১৯৭৫ এই মহান সংগীত সাধকের মৃত্যু হয়।

শম্ভু মহারাজ

(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯০৬ সালে লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রখ্যাত নর্তক শম্ভু মহারাজের জন্ম হয়। নৃত্যে এঁর বংশগত অধিকার কারণ কালিকা প্রসাদ, ঠাকুর প্রসাদ, প্রকাশজী প্রমুখ (বংশলতিকা দ্রষ্টব্য) অতি উচ্চস্তরের নৃত্য বিশারদেরা ছিলেন এঁর পূর্বপুরুষ।

ইনি শুধু অতিগুণী নৃত্যশিল্পীই নন, ঠুংরী গানেও খুব পারদর্শী। ওস্তাদ রহিমুদ্দীন খাঁর কাছে ইনি ঠুংরী শেখেন। এঁর মতে নৃত্য হওয়া উচিত ভাবপ্রধান। কারণ লয় প্রধান হলে তবলা বা পাখোয়াজের উপর নির্ভরশীল হতে

হয়। বস্তুত ভাব ব্যঞ্জনায় ইনি অদ্বিতীয়। যাবতীয় রসযুক্ত কল্পনা ইনি শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তির সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

বর্তমানে ইনি দিল্লীতে নৃত্য শিক্ষকের কার্যে ব্যাপৃত আছেন। এঁর গুণ-পনার জন্য ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এঁর পুত্র কৃষ্ণমোহন ও রামমোহন বর্তমানে নৃত্য সাধনায় রত আছেন।

খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খাঁ

(২০শ শতাব্দী)

১৯০৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরের শিউপুরী মহল্লায়, সুপ্রসিদ্ধ তবলীয়া লক্ষ্ণৌ ঘরানার অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খাঁর জন্ম হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান খাঁ সাহেবের সাত বছর বয়স থেকেই শিক্ষা শুরু হয় খুল্লতাত ভারতবিখ্যাত তবলীয়া খলিফা আবেদ হোসেনের কাছে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই তালিম পান একনাগাড়ে। এই সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন ইনি ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত অভ্যাস করেছেন। তারপরে একদিন অবির্ভূত হলেন আসরে, শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন এঁর সংগীতে। নৃত্য, যন্ত্র বা একক সর্ববিষয়েই অতুলনীয় পাণ্ডিত্য এবং দ্রুতবাদনে আয়াসশূন্য দক্ষতা আলোড়ন সৃষ্টি করলো সমগ্র ভারতবর্ষে।

এঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আগেই এঁর পূর্বপুরুষ খলিফা বখ্‌স্থ খাঁর নাম মনে আসে। যাঁর অমর কীর্তি শুধু নিজস্ব ঘরানার সংস্কার সাধনই নয়; বর্তমানকালের প্রবীণতম তবলীয়া বিশ্ববিখ্যাত আহমদজান থেরকুয়ার প্রথম গুরু ছিলেন বকস্থ খাঁর শিষ্য ও জামাতা তথা ফরাক্কাবাদ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হাজী বিলায়ত খাঁর পুত্র ওস্তাদ হোসেন আলী খাঁ। হাজী সাহেবের সুযোগ্য বংশধর মসীতুল্লা এবং তাঁর পুত্র কেরামতুল্লা খাঁ ছন্দ জগতের দুটি প্রসিদ্ধ নাম। আবার বেনারস ঘরানার পণ্ডিত রামসহায় এবং তাঁর বংশের সুর নন্নু মহারাজ ও শিষ্য পরম্পরায় মৌলবীরাম ও কণ্ঠে মহারাজ প্রমুখ কীর্তিমান তবলীয়ারা ছিলেন বখ্‌স্থ খাঁর ভ্রাতা মোদু খাঁর শিষ্য। অর্থাৎ এইরূপে আমরা জানতে পারি ঘরানাগুলি বিকাশের উৎস। সেই বখস্থ খাঁর পৌত্র মহম্মদ খাঁর পুত্র নাদির হোসেনের পুত্র হোল খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খাঁ।

যদিও আজ ইনি বার্ধক্যের অক্ষমতায় নীরব এবং সংগীতের আসর থেকেও

দূরে সরে গেছেন, তবে বর্তমানে এঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আফাক হোসেন ক্রমে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। তাছাড়া এঁর শিষ্যদের মধ্যে আছেন দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, সুদর্শন অধিকারী প্রমুখ উজ্জ্বল তবলীয়ারা।

হীরাবাঈ বড়োদেকর
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৭ সালের ২৯শে মে মিরাজে কিরাণা ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী হীরাবাঈ বড়োদেকরের জন্ম হয়। সংগীত এঁদের বংশগত জীবিকা। এঁর মা তারাবাঈ এবং ভাই সুরেশ বাবু মানে উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ। সাংগীতিক পরিবেশেই ইনি বড়ো হয়েছেন। স্বভাবতই সংগীতের প্রতি এঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই ভাইয়ের কাছে এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। তার সঙ্গে স্থানীয় 'সেণ্ট মেরী গার্লস কলেজে' এঁর বিদ্যাশিক্ষাও আরম্ভ হয়। অবশ্য স্কুলের শিক্ষা তাঁর বেশিদূর অগ্রসর হয় নি।

১৯২১ সালে ইনি ওস্তাদ বহিদ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্রমে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়। পুঁনের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের সংগীত-মহোৎসবে ইনি প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন। তারপর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইনি আমন্ত্রিত হতে থাকেন। ক্রমে আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তথা অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে এঁর সংগীত প্রচারিত হতে থাকে।

এঁর গায়কী অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আলাপ, তান, বিস্তার, অলংকারাদি প্রয়োগ অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও কলাজ্ঞান সম্পন্ন। বড়ো ও ছোটো খেয়ালের পরে ইনি ঠুংরী গান গেয়ে থাকেন। এঁর বহু রেকর্ডের মধ্যে পটদীপ রাগের 'পিয়া নাহি আয়ে' এবং ভৈরবী রাগের 'একেলী মৎ যাইয়ো রাধে যমুনাকে তীর' অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক মণ্ডলীর সঙ্গে ইনি ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৫৩ সালে চীন দেশে যান। সর্বত্রই ইনি তাঁর সুমধুর সংগীতে জনসাধারণের মনে রেখাপাত তথা ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন!

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৭ সালে হুগলী জেলায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জন্ম হয়। ১৯২৭ সালে বি. এ. অধ্যয়নকালে ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কার্যাবলীতে প্রভাবিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বেদান্ত মঠে জীবন যাপন আরম্ভ করেন। আজও ইনি সেখানেই আছেন।

সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয় অগ্রজ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। পরে ইনি শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্ত (সংগীতাচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য), সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞান-প্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছেন। বেনারসে থাকাকালীন ইনি স্বামী জগদানন্দের কাছে বেদান্ত শিক্ষা এবং সংস্কৃত সাহিত্য তথা প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রাদির ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করেন। পাশ্চাত্য দর্শন আদির শিক্ষা হয় আচার্য স্বামী অভেদানন্দের কাছে; যিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের (গুরুদেব) বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছেন।

স্বামীজী বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় সংগীত দর্শন তথা ধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' (২খণ্ড); 'রাগ ও রূপ' (২খণ্ড), 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান'; 'সংগীতসার সংগ্রহ'; 'অভেদা-নন্দ দর্শন'; 'মন ও মানুষ'; 'তীর্থ রেণু'; 'শ্রীদুর্গা'; 'The Historical Development of Indian Music'; 'A Short History of Indian Music'; 'A Historical Study of Indian Music'; 'A Cultural History of Indian Music'; Philosophy of the World & the Absolute' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ইনি ইতিমধ্যে 'শিশিরস্মৃতি পুরস্কার', 'রবীন্দ্র-পুরস্কার', 'একাডেমি এওয়ার্ড' প্রভৃতি লাভ করেছেন। বর্তমানে ইনি বিশ্ব-ভারতী (শান্তিনিকেতন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক তথা দিল্লী সংগীত নাটক একাডেমির ফেলো রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও ইনি কলকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক তথা মঠের প্রকাশন বিভাগের প্রধান সম্পাদক রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। এই বিপুল

কার্যভার তথা বিরাট দায়িত্ব বহন এঁর পক্ষেই সম্ভব। এইরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ইনি সাধারণের নানাবিধ উপদ্রব অসাধারণ ধৈর্যসহকারে শুনে আতিথ্যদান করে থাকেন। এঁর সদা শান্ত, সৌম্য ও সমাহিত ভাবটি সহজেই সাধারণকে বিস্মিত ও অভিভূত করে।

কে. এল. সায়গল
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৭ সালে পাঞ্জাবের জলন্ধরে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও অভিনেতা কুন্দনলাল সায়গলের জন্ম হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান সায়গল ছোটোবেলা থেকেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন নানাস্থানে। যার জন্য লেখাপড়াতে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

১৯৩০ সালে বেড়াতে এসেছিলেন কলকাতায়। সংযোগবশত এখানে নিউ থিয়েটার্সের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়। ফলস্বরূপ পরের বছর ইনি হিন্দী 'পুরান ভকত' ছবিতে গান ও অভিনয় করার সুযোগ পান। ১৯৩২ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির উদ্বোধন হয় এবং সেই বছরেই ইনি 'হে ব্রজরাজ দুলারে' গানখানি রেকর্ড করেন। ১৯৩৪ সালে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ হিন্দুস্থানে রেকর্ড করতে এলে এঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি সায়গলের প্রতিভা লক্ষ্য করে, শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। সেই বছরেই ইনি 'চণ্ডীদাস' ছবিতে গান ও অভিনয় এবং হিন্দুস্থান থেকে 'বসন্ত ঋতু আই', 'তড়পত বীতে দিনরাত' প্রভৃতি গান রেকর্ড করেন। প্রতিভা ও যোগাযোগের গুণে অল্পসময়ের মধ্যেই খ্যাতির চরমে পৌঁছলেন।

পরবর্তীকালে ইনি নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবিতে গান ও অভিনয় করেন যার মধ্যে বাংলা 'জীবন মরণ', 'দেবদাস', 'দিদি', 'দেশের মাটি' প্রভৃতি এবং হিন্দী 'ক্রোড়পতি', 'দুষমন', 'দেবদাস', 'ধূপছাঁও', 'প্রেসিডেন্ট' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সালে ইনি বম্বে যান এবং সেখানেও তাঁর যোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন 'ওমর খৈয়াম', 'তানসেন', 'তদবীর', 'পরোয়ানা', 'শাজাহান' প্রভৃতি ছবিতে। বাংলা ও হিন্দী অসংখ্য গজল গানও ইনি রেকর্ড করেছেন যা সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত।

অত বড়ো শিল্পী হলেও আলাপে ব্যবহারে এঁর কোনো অহংকার ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে এঁর মতো শান্ত ও মিষ্ট স্বভাবাপন্ন তথা সহানুভূতিশীল শিল্পী সেদিনও ছিল না আজও বিরল। ১৯৭৭ সালে বম্বেতে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

বিসমিল্লা খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯০৮ সালে বেনারসের ভোজপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ সানাই বাদক বিসমিল্লা খাঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা পয়গম্বর বক্স এবং মামারা (আলীবক্স, মিঞা বিলাতু ও সাদিক আলী) সকলেই উত্তম সানাই বাদক ছিলেন। আলী-বক্স ও বিলাতুর কাছেই এঁর সংগীত শিক্ষারম্ভ হয়; যাঁরা গায়ক হিসাবেও অতি গুণী ছিলেন। তাই ইনি সানাই বাদনের সঙ্গে গায়কীও শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে ইনি আগ্রা ঘরানার মহম্মদ হোসেনের কাছেও সংগীত শিক্ষা করেন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য এঁর পিতা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও সেদিকে এঁর বিশেষ আগ্রহ না থাকায় ৪র্থ কি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরে স্কুল ছেড়ে দেন। তবে সংগীত সাধনায় ছিল এঁর অসীম আগ্রহ। মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সেই ইনি অতি উত্তম বাজাতে আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে ইনি সর্বপ্রথম বহু গুণীজনের আসরে সংগীত পরিবেশন এবং অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। সানাই বাদনকে লোকপ্রিয় তথা সংগীতাসরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এঁরই প্রাপ্য। কারণ সানাই বাদন পূর্বে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই শুধু বাজানো হত। ইনি শাস্ত্রীয় তথা লোকসংগীতে সমান পারদর্শী। এঁর বহু রেকর্ড আছে।

এঁর প্রকৃত নাম ছিল নাকি অমরুদ্দীন, কিন্তু কবে ও কেমন করে এই পরিবর্তন হয় তা জানা যায় না। এঁর বড়ো ভাই শমসুদ্দীনও উত্তম সানাই বাদক ছিলেন এবং এঁরা দুজনে সর্বদা এক সঙ্গেই প্রোগ্রাম করতেন। হঠাৎ শমসুদ্দীনের অকাল মৃত্যুতে ইনি গভীর শোকাচ্ছন্ন হন এবং সানাই বাজানো বন্ধ করে দেন। কিছুকাল পরে আত্মীয় ও বন্ধুদের উপদেশ ও সান্ত্বনাদির ফলে আবার বাজাতে আরম্ভ করেন।

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক এবং ১৯৬৮ সালে সংগীত নাটক একাডেমী

থেকে এঁকে সম্মানিত ও অভিনন্দিত করা হয়। ভারতের প্রায় সকল উচ্চ-শ্রেণীর সংগীত সম্মেলনে ইনি অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এমন দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো আকাশবাণীর কেন্দ্র থেকে এঁর বাদন শোনা যায় না। বর্তমানে ইনি শিক্ষাদান এবং প্রচার কার্যে নিযুক্ত আছেন।

তারাপদ চক্রবর্তী
(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯০৮ সালে ফরিদপুর জেলার কোটালপাড়া নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। পিতা পণ্ডিত কুলচন্দ্র শুধু সংস্কৃতজ্ঞই নয় সংগীতজ্ঞ হিসাবেও সুখ্যাত ছিলেন। তাঁর কাছেই প্রতিভাবান তথা শ্রুতিধর বালকের সংগীতে হাতেখড়ি হয়।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইনি কলকাতা আসেন, থাকেন কাকার আশ্রয়ে। তখন সংগীতচর্চা শুরু হয় অন্ধগায়ক সাতকড়ি মালাকারের তত্ত্বাবধানে। এঁর অসাধারণ প্রতিভায় গুরুজী অবাক মানতেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে, কিছু দিনের মধ্যেই কাকার আশ্রয় এবং গুরুর তত্ত্বাবধান দুই হারাতে হল। তখন এঁর ঠিকানা হল ফুটপাথ। কোনো কিছুর স্থিরতা নেই। তবে ইনি আশাহত হন নি। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে, অপরিসীম দুঃখকষ্টের মধ্যে লড়াই করেছেন পাঁচ বছরেরও বেশি। সেই সময় নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং গান শুনেছেন রাধিকা গোস্বামী, গিরিজা চক্রবর্তী, মৈজুদ্দীন প্রমুখ অতিগুণী গায়ক শিল্পীদের। তখন ইনি ছিলেন তবলীয়া হিসাবে খ্যাত।

আনুমানিক ১৯৩১-৩২ সালে রাইচাঁদ বড়ালের সহায়তায় বেতারে তবলা বাদকের কাজ পেলেন। সেখানে ইনি সফলতার সঙ্গে সঙ্গত করেছেন এনায়েৎ খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ প্রমুখ অতিগুণী শিল্পীদের সঙ্গে। একদিন নির্ধারিত শিল্পীর (জ্ঞান গোঁসাই) অনুপস্থিতিতে গাইতে বসে গেলেন এই উদীয়মান তরুণ শিল্পী এবং মুগ্ধ ও বিস্মিত করলেন রসিকজনদের। সেই প্রথম ইনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপরে বাংলা এবং বাংলার বাইরে বহু বড়ো বড়ো সংগীতাসরে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে সংগীত পরিবেশন করেছেন। প্রধানতঃ ইনি খেয়াল ও ঠুংরী গানেই পারদর্শী ছিলেন। কয়েকটি নবীন রাগও ইনি সৃষ্টি করেছেন বলে শোনা যায়।

রাজ্য সরকার এঁকে একাডেমী পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। বিশ্বভারতী নির্বাচন বোর্ডের ইনি সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ সালে ইনি সংগীত-নাটক একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। কিন্তু কতকগুলি কারণে দেশবাসীর প্রতি ছিল এঁর বিপুল অভিমান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি বলেছেন যে, "আমি কি আর-একটু সম্মান দেশবাসীর কাছে আশা করতে পারি না ?" ইনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বহু আকাংক্ষিত "পদ্মশ্রী" উপাধি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই দৃঢ়চেতা মহান সংগীত সাধক পরলোক গমন করেন। এঁর সুযোগ্য পুত্র মানসকুমার বর্তমানে উদীয়মান শিল্পীদের অন্যতম। এছাড়া এঁর শিষ্যদের মধ্যে আছেন উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, ডঃ নীহারকণা মুখোপাধ্যায়, বাবলু ঘটক, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শেফালী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ থেকে সংগৃহীত)

নিসার হুসেন খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ হৈদর খাঁর পৌত্র এবং ফিদাহুসেন খাঁর পুত্র ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁর জন্ম হয় উত্তর প্রদেশের বাদাঁউ নামক স্থানে সম্ভবত ১৯০৯ সালে। সংগীত এঁদের বংশগত বিদ্যা এবং ব্যবসা সুতরাং বাল্যকাল থেকেই এঁকে যথারীতি তালিম দেওয়া হয়। ইনি কিশোর বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। এঁর আর-একটি বিশেষ গুণ হল ভাষা অনুকরণ করা ; হিন্দী, উর্দু, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষা ইনি এমন সুন্দরভাবে বলতে পারেন যে, কোনটি এঁর মাতৃভাষা নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২০-২১ সালে বরোদার মহারাজা সায়জীরাও বালক নিসার হুসেনের গানে (দিল্লীর এক আসরে) অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং এঁর পিতাকে আপন দরবারে নিযুক্ত করেন। এই সঙ্গে বালক নিসার হুসেনকে ভালোভাবে সংগীত শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

পরিণত বয়সেও কিছুদিন ইনি বরোদা স্টেটেই ছিলেন, পরে নিজের জন্মস্থানে ফিরে আসেন। এঁর স্বভাব অত্যন্ত মধুর কিন্তু প্রকৃতি অত্যন্ত গম্ভীর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলেন না। এইজন্য অনেকে এঁকে

অহংকারী বলে ভুল করেন। শিক্ষাদানকালে ইনি অত্যন্ত উদার কিন্তু কঠোর। এঁর শিষ্যদের মধ্যে, এঁর জামাতা হাফিজ আহমদ ও গুলাম মুস্তাফা উল্লেখযোগ্য।

ইনি খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, তরানা প্রভৃতি খুব ভাল গাইতে পারেন। বিশেষ করে তরানা গানে এঁকে অদ্বিতীয় বলা যায়। আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র তথা অখিল ভারতীয় কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে এঁর মধুর ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর প্রায়ই শোনা যায়। এঁর খেয়াল ও তরানা রাগের অনেক রেকর্ড আছে, যার মধ্যে কেদার রাগে 'কহ্লারে নন্দ নন্দন' উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

উদয়শংকর

(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯০৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যকার উদয়শংকরের জন্ম হয়। উদয়পুরে জন্ম হওয়ার জন্যই সম্ভবত এর পিতা, তৎকালীন অত্যন্ত বিদ্বান, ডঃ শ্যামশংকর চৌধুরী এই নামকরণ করেন। পিতার মতোই নৃত্য ও চিত্রকলার প্রতি এঁর বাল্যকাল থেকে অনুরাগ ছিল।

১৯১৭ সালে তাই বালক উদয়শংকরকে বম্বের 'জে. জে. স্কুল অফ আর্টস'এ ভর্তি করা হয়। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে এঁকে লণ্ডনে 'রয়েল স্কুল অফ আর্টস'এ ভর্তি করা হয়। সেখানে ইনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়াম রোদেনষ্টোইনের কাছে কলাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে দুটি পদকসহ ডিগ্রীলাভ করেন। এই সময়ে কয়েকটি নাটক, মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ ভারতবর্ষের সাহায্যার্থে রচনা করেন এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য ইনি সংগীত ও নৃত্যের প্রতি আগ্রহী হন। তখন থেকে ইনি যথাযোগ্য অনুশীলন শুরু করেন।

লণ্ডনে থাকাকালীন বন্ধুদের উৎসাহে স্থানীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতেন। তেমনি এক অনুষ্ঠানে জগৎপ্রসিদ্ধ নর্তকী আনাপাবলোবা এঁর কলাজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে ১৯২৩ সালে, তাঁর দলে ভারতীয় নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য এঁকে নিযুক্ত করেন। ক্রমে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও নৃত্যকলা প্রদর্শন করে ইনি প্রভুত ধন ও যশের অধিকারী হন। কিছুকাল পরে এই দলত্যাগ করে

লণ্ডন ও প্যারিসে ইনি স্বাধীনভাবে নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য দল গঠন করেন। এই সময়ে এঁর সঙ্গে জহুরী অক্ষয়কুমার নন্দীর কন্যা অমলা নন্দীর পরিচয় হয়। অমলা এঁর গুণপনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং এঁর দলে যোগ দিয়ে নৃত্যানুশীলন আরম্ভ করেন। কালক্রমে এদের বিবাহ হয় এবং অমলাও বিশ্ববিখ্যাত নর্তকীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে এসে ইনি আলমোড়াতে 'উদয়শংকর ইণ্ডিয়ান কালচার সেণ্টার' নামক নৃত্য-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এঁর গুরু শংকরণ নাম্বূদ্রীপাদম্ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁও এই কেন্দ্রে কাজ করতেন। কিছুকাল পরে কোনো কারণে এই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এঁর সংগঠনে তিমিরবরণ, সিমকি, রামগোপাল, সাধনা বোস, পদ্মিনী, রাগিনী, ত্রাবনকোর সিস্টারস্, ললিতা, গোপীনাথ, লালমণি মিশ্র, বি. শিরালী, রবিশংকর, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, শংকরণ নাম্বূদ্রীপাদম্ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞেরা সময়-সময় কাজ করেছেন।

'কল্পনা' নামক একটি নৃত্য প্রধান ছায়াচিত্র এবং ড্রামা-ছায়াচিত্র শংকর স্কোপ এঁরই অবদান। এঁর অপর তিন ভাই জ্ঞানেন্দ্রশংকর, রাজেন্দ্রশংকর ও রবিশংকর সকলেই নিজস্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ইনি কলকাতায় শিক্ষাদান এবং নবনব শিল্পকলা সৃষ্টিতে মগ্ন আছেন।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
(২০শ শতাব্দী)

গৌরীপুরের (মৈমনসিং) অভিজাত রায়চৌধুরী পরিবারের প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য ও ইমদাদখানী ঘরাণার অন্যতম প্রতিনিধি বিমলাকান্ত ১৯০৯ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা হেমন্তবালা উত্তম এসরাজ বাদক এবং মাতামহ ব্রজেন্দ্রকিশোর ছিলেন অসংখ্য গুণের অধিকারী তথা উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ ও সংগীতের পরম পৃষ্ঠপোষক। মামা বীরেন্দ্রকিশোরও ভারতজোড়া খ্যাতিবান সংগীতজ্ঞ।

১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কয়েকটি ভারতীয় ভাষা জানেন। জাদুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে এঁর খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত। পারিবারিক পরিবেশ এবং নিজস্ব প্রবণতায় ইনিও সংগীত সম্বন্ধে

খুব উৎসাহী। এনায়েত খাঁর কাছে ইনি সেতার ও সুরবাহার দীর্ঘ তেরো বছর শিক্ষাগ্রহণ করেন। উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে ইনি ভারতজোড়া খ্যাতিবান। শাস্ত্র সম্বন্ধে এঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর রচিত সার্থকনামা 'ভারতীয় সংগীতকোষ' গ্রন্থখানি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দীর্ঘকালের অভাব মোচন করেছে। ১৯৩৬ সালে ইনি 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। এছাড়া ভাতখণ্ডে রচিত 'ক্রমিক পুস্তকমালিকা'র হিন্দি অনুবাদেও ইনি বিশেষ সাহায্য করেছেন।

এঁর শিষ্যমণ্ডলী অত্যন্ত বিস্তৃত (ঘরাণা পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য)। শিক্ষা ও প্রচারের ব্যাপারে এঁর অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

(২০শ শতাব্দী)

১৯১০ সালে (২৫শে বৈশাখ, ১৩১৬) কলকাতার এক বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ পরিবারে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের জন্ম হয়। এঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ছিলেন প্রসিদ্ধ ডোয়ার্কিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। পিতা কিরণচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সংগীতরসিক এবং কাকা শরৎচন্দ্র ছিলেন উত্তম পিয়ানোবাদক। বাল্যকাল থেকেই ইনি সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় ইনি উত্তম ক্রিকেটার, চিত্রশিল্পী, পালিভাষার ছাত্র এবং সংগীত পিপাসু ছিলেন। দৃষ্টি শক্তির অসুস্থতার দরুণ এম. এ. পরীক্ষা দিতে পারলেন না। সফল হল না খেলোয়াড় বা চিত্রশিল্পী হবার স্বপ্ন। তাই সংগীত চর্চাই হল এঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

তবলার চর্চা শুরু হয়েছিল ৭ বছর বয়স থেকে। প্রথম গুরু ছিলেন টনিবাবু। ক্রমে বিপিনবাবুর কাছে পাখোয়াজ এবং নবদ্বীপের ব্রজবাসীর কাছে শ্রীখোল শিক্ষা করেন। এই ব্রজবাসী সিংহ পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধ নর্তক হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু পরবর্তী জীবনে সংগীতের নানা বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করেন আজিম খাঁ, মজীদ খাঁ, ফিরোজ খাঁ, শব্বণ খাঁ, সগীর খাঁ, গিরীজাশংকর চক্রবর্তী, দবীর খাঁ, মেহেদী হুসেন খাঁ প্রমুখ প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞদের কাছে।

আকাশবাণীর সঙ্গে এঁর যোগাযোগ সেই ইণ্ডিয়া ব্রডকাস্টিং কোম্পানির

আমল থেকে। তখন বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে ইনি গীটার বাজাতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রেকর্ড সংগীতে অনুগামী যন্ত্র হিসাবে ইনিই গীটারের প্রথম প্রবর্তন করেন। বহু ছবিতে ইনি সুরারোপ করেছেন। যেমন বম্বের বিচার, মুজরিম, এবং বাংলার অরক্ষণীয়া, যদুভট্ট, বসন্ত বাহার, আশা, আঁধারে আলো, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, মর্মবাণী প্রভৃতি।

১৯৫৪ সালে ইনি ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সফর করেন। সেই বছরেই ইনি আকাশবাণীতে লঘু সংগীতের প্রযোজকের পদে নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পরে ইনি পেনসিলভ্যানিয়া য়ুনিভার্সিটির আমন্ত্রণে ভারতীয় গীত ও বাদ্য শিক্ষাদানের জন্য আমেরিকা যান। তবে সেখানকার পরিবেশ তেমন ভালো না লাগায় ১৯৭২ সালে আবার ফিরে আসেন।

গায়ক, বাদক এবং শিক্ষক সর্ববিষয়েই এঁর অসাধারণত্ব অতুলনীয়। এঁর শিষ্যদের মধ্যে নিখিল ঘোষ, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু, শংকর ঘোষ, দিলীপ দাস, গোবিন্দ বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গজাননরাও যোশী
(২০শ শতাব্দী)

১৯১০ সালে বম্বের এক সংগীতজ্ঞ পরিবারে গজাননরাও যোশীর জন্ম হয়। এঁর পিতা পণ্ডিত অনন্ত মনোহর যোশী একজন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন, যিনি তাঁর গুণপনার জন্য ১৯৫৫ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন এবং সংগীত-নাটক একাডেমী থেকে একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষা পিতার কাছেই হয়। তবে পরে পিতার গুরু পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়া'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া পরবর্তীকালে ইনি ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ এবং তৎপুত্র মঞ্জী খাঁ'র কাছেও গায়কী শিক্ষা করেছিলেন। ক্রমে ইনি গায়ক শিল্পীহিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

ইতিমধ্যে ইনি বেহালা বাদনের প্রতি আগ্রহী হন এবং চর্চারম্ভ করেন। কিন্তু কোনো গুরুর কাছে নয়, নিজে নিজে। গায়কীর জ্ঞান থাকায় অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে তথা আকাশ-

বাণীতে বেহালা বাজিয়ে শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকদের অন্যতমরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন।

এঁর প্রকৃতি অত্যন্ত অমায়িক। সর্বদা খুব সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত থাকতে ভালোবাসেন। এঁর তিন পুত্র ও তিন কন্যা। শিষ্যদের মধ্যে কৌশল্যা মঞ্জেকর, শ্রীধর পর্শেকর, ডি. আর, নিম্বারগী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইনি আকাশবাণীর বম্বে কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

শান্তিদেব ঘোষ

(২০শ শতাব্দী)

১৯১০ সালে পূর্ব বাংলার চাঁদপুরে কালীমোহন ঘোষের পুত্র শান্তিদেবের জন্ম হয়। মাত্র ছয় মাস বয়সে মায়ের সঙ্গে আসেন শান্তিনিকেতনে। পিতা ছিলেন কবির পরিবারের সঙ্গে একান্ত আপন জনের মতো। অর্থাৎ শান্তি-নিকেতনেই ইনি গড়ে উঠেছেন।

কবির গান ও নাটকের মহড়াতে সর্বদাই ইনি কবির পাশে থাকতেন, এঁর সংগীতপ্রীতির জন্য কবিও এঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। ১৯৩০ সাল থেকে তো কবি আলাদা ভাবে এঁকে গান শিখিয়েছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ইনি কবির সঙ্গে আগরতলা, কেরালা, মণিপুর, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে স্থানীয় লোকগীতি ও নৃত্য আয়ত্ত করেন। ১৯৩৭ সালে বর্মা এবং ১৯৩৯ সালে জাভাতে গিয়েও স্থানীয় ললিতকলা প্রসঙ্গে জ্ঞানার্জন করেন।

এইচ. এম. ভি. থেকে এঁর গাওয়া অনেক রেকর্ড বেরিয়েছে, যার মধ্যে 'কৃষ্ণকলি', 'বন্ধু রহো রহো' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছবির কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে 'ডাক হরকরা' ছবিতে অভিনয় ও গান করেন। তবে সেই এঁর প্রথম ও শেষ ছবি।

সাহিত্যের প্রতি এঁর অনুরাগ উল্লেখযোগ্য। যৌবনের যাবতীয় রচনা কবি স্বয়ং সংশোধন করে এঁকে সাহিত্যে উৎসাহিত করতেন। এঁর রচিত 'রবীন্দ্রসংগীত', রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে একখানি অপরিহার্য মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

জি. এন. গোস্বামী
(২০শ শতাব্দী)

১৯১১ সালের ৭ই জানুয়ারি বেনারসে প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক শ্রীগোপীনাথ গোস্বামীর জন্ম হয়। পিতার নাম কেদারনাথ গোস্বামী। বাল্যকাল থেকেই ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্কুল কলেজে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করতেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করায় ছয়মাসের ছাত্রবৃত্তি একসঙ্গে পান। সেই টাকায় ইনি একটি বেহালা সংগ্রহ করেন এবং বাড়িতে অভ্যাস আরম্ভ করেন। ঈশ্বরদত্ত সংগীত প্রতিভার জন্য কিছুকালের মধ্যেই ইনি উত্তম বাজাতে শুরু করেন এবং নানা-স্থান থেকে পুরস্কৃত হন। এই সঙ্গে এঁর পড়াশুনাও চলতে থাকে এবং ক্রমে ইনি এম. এস্. সি., বি. টি. পাশ করেন।

একবার এঁর পরিচয় ওস্তাদ আশিক আলী খাঁ'র সঙ্গে হয় এবং তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খাঁ সাহেব বেহালাকে বিদেশী বাদ্য-যন্ত্র বলে উল্লেখ করে এঁকে ফিরিয়ে দেন। বছরখানেক পরে আবার খাঁ সাহেবের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন ইনি তাঁর কাছে সেতার বাদন শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং খাঁ সাহেব রাজী হন। ইনি খাঁ সাহেবের কাছে সেতার শিক্ষা করতেন কিন্তু বাড়িতে বেহালা অভ্যাস করতেন। অসাধারণ প্রতিভাবান গোস্বামীজী দ্রুত সেতার বাদনেও উন্নতিলাভ করেন। কিন্তু বাড়িতে ইনি সর্বদা বেহালা বাজাতেন। একদিন ইনি খাঁ সাহেবের শেখানো সংগীত বেহালাতে বাজাচ্ছেন এমন সময় খাঁ সাহেব গিয়ে হাজির। তিনি বাইরে থেকে এই সংগীত শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল বেহালাতে শাস্ত্রীয় সংগীত বাজানো সম্ভব নয়। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হওয়ায় ইনি খুব খুশি হন এবং এঁকে সর্বসমক্ষে বেহালা বাদনের অনুমতি দেন। এছাড়াও ইনি ফৈয়াজ খাঁ, বিন্দু খাঁ, মুস্তাক হসেন খাঁ, আলী আকবর খাঁ প্রমুখ সংগীতাচার্যদের কাছে সংগীতের জ্ঞানার্জন করেছেন।

ভারতের আকাশবাণীর সকল কেন্দ্র থেকেই এঁর প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়ে থাকে। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমেও ইনি কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন উচ্চস্তরের সংগীত সম্মেলনে ইনি সংগীতকলা প্রদর্শন করেছেন।

গায়কী অঙ্গ তথা অতুলনীয় তন্ত্রকারী যুক্ত এঁর বাদন যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে, কি অসাধারণ এঁর শিল্প-প্রতিভা।

বর্তমানে ইনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্র সংগীতের আচার্যরূপে (Head of the department) প্রতিষ্ঠিত আছেন। লেখককে ইনি নানা উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সুখেন্দু গোস্বামী
(২০শ শতাব্দী)

১৯১১ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশের ঢাকা শহরে সুখেন্দু গোস্বামীর জন্ম হয়। সংগীতে এঁর জন্মগত অধিকার ছিল। কারণ পিতা মদনমোহন ছিলেন অতি উত্তম ভাগবৎ পাঠক। শৈশবে মাতা মনোমোহিনী দেবীর কাছে এঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষারম্ভ হয়। পরে অগ্রজ রেবতীমোহনের কাছেও কিছুকাল সংগীত শিক্ষা করেন।

১৯২৮ সালে ইনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন।[১] তখন থেকেই ইনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতিতে এঁর গুরু ছিলেন বিপ্লবী জ্যোতিষ জোয়ারদার। ১৯৩১ সালে ইনি হিজলী ক্যাম্পে রাজবন্দী ছিলেন। ১৯৩৪ সালেও ইনি কলকাতায় কিছুকাল অন্তরীণ ছিলেন। অর্থাৎ বৈপ্লবিক থেকে ইনি হয়েছেন সংগীতশিল্পী। ওই বছরে, অর্থাৎ ১৯৩৪ সালেই ইনি সেনোলা কোম্পানীতে প্রথম রাগপ্রধান ও ভাটিয়ালি গান রেকর্ড করেন। পরবর্তীকালে ইনি হিন্দুস্থান ও কলোম্বিয়া কোম্পানিতেও বহু গান রেকর্ড করেছেন। ১৯৩৫ সালে ইনি সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের গান শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হন, এবং শাস্ত্রীয় সংগীত সাধনাতে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনি সর্বপ্রথম খেয়াল গান পরিবেশন করেন। কলিকাতার বেতারে ১৯৩৪ সাল থেকেই

১ পরবর্তীকালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন।

ইনি লঘু সংগীত পরিবেশন করতেন, তবে খেয়াল গান ১৯৩৯ সাল থেকে গাইতে আরম্ভ করেন।

১৯৪১ সালে কবিগুরু'র স্মৃতি রক্ষার্থে গিরিজাবাবুকে অধ্যক্ষ পদে বরণ করে গীতবিতানে 'সংগীতভারতী' পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইনি গীতবিতান শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাতাদেরও অন্যতম ছিলেন।

এঁর গানে আব্দুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাঈ প্রমুখ গুণীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইনি গুরুদেবের (গিরিজাবাবুর) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বিশেষ পরিচর্যাদির জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে গুরু'র সমস্ত সংগ্রহ লাভ করেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনায় বর্তমানে ইনি ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর সংগীতজ্ঞদের অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

সংগীত শিল্পীদের মধ্যে এঁর মতো মধুর স্বভাব, নিরহংকারী তথা সহানুভূতিশীল সজ্জন কদাচিৎ দেখা যায়। বর্তমানে ইনি গীতবিতানের সংগীতভারতী বিভাগের অধ্যক্ষ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। এঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুপ ঘোষাল, মলয় মুখোপাধ্যায়, লীনা ঘটক, গীতা বিশ্বাস, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা সেন, হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়ী সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বেগম আখতর
(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯১১ সালে ফৈজাবাদে প্রসিদ্ধ গায়িকা বেগম আখতরের জন্ম হয়। সংগীত শিক্ষার প্রেরণা ইনি মায়ের কাছে পেয়েছেন, এবং তাঁর কাছেই সাত বছর বয়স থেকে এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। পরে ইনি পাটনার সারেঙ্গীবাদক ইমদাদ খাঁর কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া পতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ আল্লা খাঁ ও কিরাণা ঘরানার ওস্তাদ বহীদ খাঁর কাছেও ইনি সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্ণৌর ইলিয়াস খাঁর কাছে ইনি কিছুদিন সেতার বাদনও শিক্ষা করেন। তবে অদ্বিতীয় গজল গায়িকা হিসাবেই এঁর প্রসিদ্ধি বেশি।

কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে একবার প্রসিদ্ধ জদ্দন বাঈয়ের সঙ্গে গজল গাইবার সুযোগ ঘটে। সেই অনুষ্ঠানে এঁর গুণপনা অনেকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে এবং অতিগুণী শিল্পীদের অন্যতমরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। ক্রমে আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে ভারত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। অনেকগুলি রেকর্ডে কণ্ঠদান করেছেন। ৬৪ বৎসর বয়সে ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৪ আমেদাবাদে এঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম গুরু পতিয়ালা ঘরাণার ওস্তাদ মাতা মহম্মদ খাঁ অপর গুরু কিরাণা ঘরানার ওয়াহিদ খাঁ।

আনন্দবাজার ১-১১-৭৪

হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (হীরুবাবু)
(২০শ শতাব্দী)

১৯১১ সালে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারে হীরুবাবুর জন্ম হয়। পিতা মন্মথনাথ ছিলেন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার। এই পরিবারের সাংগীতিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিতা ছিলেন অতিগুণী তবলা বাদক এবং আজীবন বিনা পারিশ্রমিকে বহু শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছেন। মাতামহ রজনীকান্ত সংগীত প্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই 'ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি আমৃত্যু তার সম্পাদক তথা কর্ণধার ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণকুমার (নাটুবাবু) ও শ্যাম গাঙ্গুলীকে তিনি সংগীতচর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেন। ফলস্বরূপ প্রথমজন তবলা এবং দ্বিতীয়জন স্বরোদ বাদনে খ্যাতি অর্জন করেন।

পিতার কাছেই হীরুবাবুর তবলায় হাতে খড়ি। পরে তাঁর গুরু নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে ইনি বহুকাল লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত ওস্তাদ খলিফা আবিদহোসেনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

বি. এ. বি. এল. এবং এটর্নিশিপ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এঁর কর্মজীবন ও শিল্পীজীবন সমানভাবে চলতে থাকে। তবলীয়া হিসাবে ইনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। গুণপনার স্বীকৃতি হিসাবে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত সংগীতচক্র 'ঝংকার', ১৯৫০ সালে এঁকে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে 'কলকাতা পৌরসংস্থা' নাগরিকদের পক্ষ থেকে এঁকে পৌর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

বর্তমানে এই মহান শিল্পী সংগীত সেবায় নিযুক্ত আছেন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু সংগীত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করছেন।

পান্নালাল ঘোষ
(২০শ শতাব্দী)

১৯১১ সালে বাংলা দেশের বরিশাল সহরে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের জন্ম হয়। সংগীতে এঁদের বংশগত অধিকার। কারণ পিতামহ হরকুমার ঘোষ ছিলেন বরিশালের এক প্রখ্যাত ধ্রুপদী; পিতা অক্ষয়কুমার ঘোষ ছিলেন উত্তম সেতারী তথা সংগীত রসিক; খুল্লতাত গোপাল ঘোষ ছিলেন উত্তম গায়ক। ফলে সকলেই সংগীত রসিক, এবং সংগীত চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। এঁরা চার ভাইবোন, সকলেই গান গাইতেন, তবে পরে রুচি বদল হয়। যেমন ইনি বাঁশি এবং সহোদর নিখিল বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত তবলীয়া। আর বিদুল ঘোষ ও স্মৃতিকণা অবশ্য গান চর্চাই করেছেন।

১৪ বছর বয়স থেকে ইনি বাঁশিবাদন শিক্ষারম্ভ করেন। অসাধারণ প্রতিভাবান হওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই সুন্দর বাজাতে আরম্ভ করেন। উত্তম শিক্ষক না পাওয়ায় ইনি যেখানে যা শুনতেন তাই অনুশীলন করতেন। সংযোগবশত কলকাতার এক ছায়াচিত্র কোম্পানিতে কাজ পান, সেখানে অমৃতসরের প্রসিদ্ধ হারমনিয়ম বাদক খুশীআহমদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। বছর খানেক শেখার পরে, ১৯৩৮ সালে হঠাৎ "সরই-কলা-নৃত্য" মণ্ডলীর সঙ্গে এঁকে বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। মাস ছয়েক পরে ফিরে আসেন, কিন্তু ইতিমধ্যে খুশীআহমদের মৃত্যু হয়েছিল। তখন ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংগীতচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কিছুকাল পরে ধনোপার্জনের তাগিদে ইনি বম্বে যান। সেখানে কয়েকটি ছবিতে সংগীত নির্দেশনার কাজ করেন। তবে এই কার্যে সংগীত সাধনায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটায় নির্দেশনার কার্য ত্যাগ করে সাধারণ সংগীতজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে থাকেন। যদিও ইতিমধ্যে ইনি রাষ্ট্রীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন,

কিন্তু তবু শিক্ষা গ্রহণের লিপ্সা ছিল এঁর অন্তরে অত্যন্ত তীব্র। ১৯৪৭ সালে তাই ইনি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কিছুকাল পরে আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে ইনি সংগীত নির্দেশনার কাজে নিযুক্ত হন। এই পদ গ্রহণের পরে ইনি বাদ্যবৃন্দের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করে অত্যন্ত সফলতা ও খ্যাতি অর্জন করেন। রাষ্ট্রীয় তথা অন্যান্য বিবিধ বাদ্যবৃন্দ এঁরই তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।

এঁর বহু রেকর্ড আছে। আকাশবাণীর প্রায় সকল কেন্দ্র থেকেই এঁর কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছে। ইনি খেয়াল অঙ্গের বাদনে সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন সপ্তকের জন্য ইনি তিনটি বাঁশি ব্যবহার করতেন এবং প্রয়োগকালে এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন যে শ্রোতারা এই পরিবর্তন বুঝতে পারতো না। খেয়ালের পরে সাধারণত ঠুংরী বাজাতেন।

এঁর শিষ্য দেবেন্দ্র মুর্দেশ্বর ও গৌর গোস্বামী উত্তম বংশীবাদক রূপে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। গত ১৯৬০ সালে ২০শে এপ্রিল মাত্র ৪৯ বছর বয়সে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

ওস্তাদ আমীর খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে মহারাষ্ট্রের আকোলা নামক স্থানে কিরানা ঘরানার প্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী আমীর খাঁর জন্ম হয়। পিতা শাহমীর খাঁ ছিলেন অতি উত্তম সারেঙ্গী বাদক। তিনি ইন্দোর রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইন্দোরে এঁদের বাড়িতে আল্লাবন্দে খাঁ, বহীদ খাঁ, জাকিরুদ্দীন খাঁ, রজ্জবআলী খাঁ, বুন্দু খাঁ, মুরাদ খাঁ প্রমুখ অতি গুণী শিল্পীদের যাতায়াত ছিল, এবং প্রতি শুক্রবার সেখানে সংগীতানুষ্ঠান হত। সেই পরিবেশে আমীর খাঁ বড়ো হয়েছেন।

শৈশবে পিতার কাছে এঁর সারেঙ্গী শিক্ষারম্ভ হয়। অল্পকালের মধ্যেই বালকের প্রতিভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এঁর গায়ক হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পিছনে একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। ওস্তাদ শাহমীর খাঁ'র শিষ্যদের মধ্যে কিঞ্চিত অহংকারী প্রকৃতির একজন ছিলেন। যাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য খাঁ সাহেব পুত্রকে গোপনে গান শেখাতে আরম্ভ করেন এবং

নানাবিধ কঠিন পাল্টে (স্বরবিন্যাস) শিক্ষা দেন। তারপরে একদিন এক সংগীতাসরে আমীর খাঁকে গান গাইতে এবং সেই শিষ্যকে সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করতে বলেন। আমীর খাঁর বহুবিচিত্র স্বরবিন্যাসের সঙ্গে সে কিছুতেই সহযোগিতা করতে পারেন না ফলে খুব অপ্রস্তুত হতে হয়। এইরূপে খাঁ সাহেব সেই শিষ্যকে শিক্ষা দেন এবং আমীর খাঁ গায়ক শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

মধুর স্বভাব সম্পন্ন আমীর খাঁর গায়কীও শান্ত ও সুমধুর অথচ গভীর সমুদ্রের মতো গম্ভীর। এঁর গান শুনে বৃদ্ধ বহীদ খাঁ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'এখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস হল যে আমার ঘরাণা এঁর দ্বারা রক্ষা পাবে। ইনি কোনো হালকা ধরনের গান বা ঠুংরী গান করেন না। বিলম্বিত লয়ের গানই অধিক প্রিয়, তাও অত্যন্ত সুসংযত রূপে। লয়কারী নিয়ে তবলার সঙ্গে পাল্লা দেবার পক্ষপাতীও নন। সহজ ঠেকাই এঁর পছন্দ। সাধারণত ইনি মুলতানী, শুধকল্যান, আভোগী, ভটিহার, মারবা, ললিত, তোড়ী. সুঘরাই, মিয়ামল্লার প্রভৃতি রাগ গেয়ে থাকেন। আর দরবারী কানাড়া রাগে ইনি সিদ্ধ। আমাদের মতে এঁর শ্রেষ্ঠ গুণ হল এই যে, এর সংগীতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রাগ বিশেষের রূপটি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট থাকে। কোনো মতেই তা তান, বিস্তার ও অলংকারাদির বাহুল্যে আচ্ছন্ন হয়ে যায় না। সেই বিষয়ে বহু গুণী শিল্পীদের উদাসীনতা লক্ষিত হয়।

এঁর বহু রেকর্ড আছে। কয়েকটি ছায়াচিত্রেও ইনি কণ্ঠদান করেছেন। এঁর শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে অমরনাথ (যিনি দিল্লী আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন ; 'গর্মকোট' নামক ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। যাঁর গান শুনলে সহজেই আমীর খাঁর কথা মনে পড়ে), এ. কানন, পূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ;ায়, সুনীল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, কলকাতার সাদারণ এভিনিউ ও শরৎ বসু রোডের সংযোগস্থলে এক মোটর দুর্ঘটনায় এঁর মৃত্যু ঘটে।

গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারতের ধারবার নামক স্থানে কিরানা ঘরাণার প্রসিদ্ধ গায়িকা গঙ্গুবাঈ হাঙ্গলের জন্ম হয়। এঁর পিতা চিক্কুরাও ও মাতার নাম অম্বাবাঈ ছিল। যদিও ইনি দক্ষিণ ভারতায় এবং কিছুকাল মা ও মামা শ্রীদত্তোপন্ত দেশাইয়ের কাছে কর্ণাটক সংগীত শিক্ষা করেছেন, কিন্তু উত্তরী সংগীতের প্রতিই এঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ রামভাই কুন্তগোলকরের (সবাই গন্ধর্ব) সঙ্গে সংযোগবশত এঁর পরিচয় হয়, এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৪ সালে কংগ্রেসের মহাঅধিবেশনে ইনি প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন এবং অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, কলকাতা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারিণী হন। আকাশবাণীর অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রায়ই এঁর সংগীত শোনা যায়। এঁর গাওয়া বহু রেকর্ডের মধ্যে মারবা রাগের গানখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এঁর কণ্ঠস্বর গুরুর মতো হওয়ায় মর্দানী গায়িকা হিসাবে পরিচিতা। ইনি খেয়াল ও তরানা গানে খুব পারদর্শী।

আনোখেলাল
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৪ সালে কাশীতে প্রসিদ্ধ তবলীয়া পণ্ডিত আনোখেলালের জন্ম হয়। পিতার নাম বুদ্ধুপ্রসাদ মিশ্র। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে ইনি পিতামহীর কাছে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে পালিত হন। বাল্যকালেই ইনি কাশীর প্রসিদ্ধ তবলীয়া পণ্ডিত ভৈরব প্রসাদ মিশ্রের (ভৈরোঁ মহারাজ) সেবা যত্ন করে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে ইনি প্রতিভা ও সাধনার গুণে সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তবলীয়াদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন।

সাধনাসিদ্ধ আনোখেলাল 'না ধি ধি না'র ঠেকাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন আকাশবাণীর কেন্দ্রে তথা সংগীত সম্মেলনে এঁর অতুলনীয়

তবলা-বাদন অনেকেই শুনেছেন। এঁর বাদনের প্রভাব তাঁরা অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে কয়েকবার ইনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ইনি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।

১৯৫৩ সালে কলকাতার "অখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলন" থেকে একে 'সংগীতরত্ন' উপাধি দান করা হয়। গভীর পরিতাপের বিষয় হল এই যে, মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সেই (১৯৫৮ সালের ১০ই মার্চ) এই মহান প্রতিভার অকাল মৃত্যু হয়। এঁর দুই সুযোগ্য পুত্র রামজী মিশ্র ও মহাপুরুষ মিশ্র ইতিমধ্যে সংগীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

নিখিল ঘোষ
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৪ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় বিশ্ববিখ্যাত তবলীয়া নিখিল ঘোষের জন্ম হয় এক বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ পরিবারে। পিতামহ হরকুমার ঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত ধ্রুপদী; পিতা অক্ষয়কুমার ঘোষ ছিলেন উত্তম সেতারী, খুল্লতাত গোপাল ঘোষ ছিলেন গায়ক এবং অগ্রজ পান্নালাল ঘোষ ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক।

ছোটোবেলায় ইনি গান গাইতেন, শিক্ষক ছিলেন বরিশালের বিপিন চ্যাটার্জী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বোন স্মৃতিকণাকে নিয়ে কংগ্রেসের সভায় সভায় দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

গল্প মনে হলেও সত্য যে, এঁর প্রাথমিক তবলা শিক্ষারম্ভ হয়েছিল একজন মুচির কাছে। অবশ্য জুতো তৈরি পেশা হলেও মহাদেব মুচি অত্যন্ত সংগীত রসিক এবং তবলা চর্চাতে আগ্রহী ছিলেন। যার কাছে রোজ নিখিলবাবু হাজির হতেন। এই আগ্রহ লক্ষ করে অগ্রজ পান্নালাল একজোড়া তবলা কিনে দেন।

১৯৩৭ সালে কলকাতা এসে ইনি জ্ঞানবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভার গুণে দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৯৪২ সালে বম্বেতে ডেকে পাঠালেন পান্নালাল। সেখানে ফিরোজ খাঁ নিজামীর কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু করলেন। ক্রমে আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে সংগীত

পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। রেকর্ড ও ফিল্মে সুর রচনার কাজও চলতে থাকে। ফলে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইনি অনেকের কাছেই তবলা শিক্ষা করেছেন। যাদের মধ্যে আমীর হোসেন খাঁ, আহমদজান থেরকুয়া, মুনির খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৮ সালে ইনি বিলায়ত খাঁর সঙ্গে সংগীত সফর করেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্যারিস, ব্রুসেলস প্রভৃতি স্থানে এবং মুগ্ধ করেন ইহুদী মেনুহিন, পলরবসন, বেঞ্জামিন ব্রিটেন প্রমুখ বিদেশী সংগীত গুণীদের। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে এঁকে 'ড্যাজলিং আর্টিষ্ট' আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়।

শাস্ত্রাদির প্রতিও এঁর গভীর অনুরাগ। যার প্রমাণ পাওয়া যায় এঁর রচিত "A New System of Notation" গ্রন্থে। এছাড়াও ইনি দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি "সংগীত বিশ্বকোষ" রচনায় নিযুক্ত আছেন। যার কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ইনি বম্বেতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

সুধীরলাল চক্রবর্তী
(২০শ শতাব্দী)

২০শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১৬ ?) বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় সুপ্রসিদ্ধ সুরকার তথা গায়ক শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর জন্ম হয়। পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্তী অতি সুপণ্ডিত এবং সংগীত রসিক ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসতো। ফলে ছোটোবেলা থেকেই সুধীরলাল গুণী শিল্পীদের সংগীত শোনার সুযোগ তথা সংগীত শিক্ষার প্রেরণালাভ করেছেন। ইনি যে অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী এবং শ্রুতিধর ছিলেন সে বিষয়েও তখন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তাই সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁকে সংগীত শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে ইনি আরো অনেকের কাছে তালিম পেয়েছেন।

ইনি আধুনিক, রাগপ্রধান, গজল, ঠুংরী প্রভৃতি বিবিধ গান গাইতেন। সুরকার হিসাবেও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন। এঁর গাওয়া এবং সুরারোপিত রেকর্ডগুলি ('খেলাঘর মোর ভেঙে গেছে হায়', 'মধুর আমার মায়ের হাসি', 'ও তোর জীবন বীণা আপনি বাজে', 'তোমারে স্মরিয়া

লাগে যে গো', 'খানে দো জরা তেরী মোহব্বৎ কি নিশানী' প্রভৃতি) তখন বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এবং বহুদিন সেগুলি রসিকজনের মনে অম্লান হয়ে থাকবে।

বর্তমানের শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পীদের ইনিই ছিলেন সংগীতগুরু। তবে দুঃখের বিষয় এমন একটি প্রতিভা শুধু অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য (১৯৪৯ সালে ?) অকাল মৃত্যু বরণ করেছে।

ডঃ সুমতী মুট্রকর
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট নামক স্থানে শ্রীজি. জে. অম্বরদেকরের কন্যা শ্রীমতী সুমতী মুট্রকরের জন্ম হয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করার পরে ইনি আইন অধ্যয়ন করেন। লক্ষ্মৌ মরিস কলেজ থেকে যথাক্রমে সংগীত বিশারদ, সংগীত প্রবীণ এবং ডঃ রতনঝনকরের তত্ত্বাবধানে "Cultural Aspect of Indian Music" বিষয়ে Ph. D. করেছেন। এছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নানা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করে ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরাজি, মারাঠি, হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে এঁর অসাধারণ জ্ঞান প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া গুজরাটি ও বাংলা ভাষাও ইনি মোটামুটি জানেন।

ইনি অনেকের কাছেই সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে পদ্মভূষণ রতনঝনকর, একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত রাজা ভাইয়া পুঙ্ছওয়ালে (গোয়ালিয়র ঘরানা), ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ (আগ্রা ঘরানা), একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত অনন্ত মনোহর যোশী ও মুস্তাক হোসেন খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ধ্রুপদ, ধামার আদি সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের জন্য ভারত বিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য গোবিন্দরাও বুরহনপুরকরের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। বিগত ৩০ বছর ধরে আকাশ বাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ইনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি সংগীত পরিবেশন করছেন। ১৯৭২ সালে কাঠমণ্ডুতে ভারত-নেপাল মৈত্রী সংঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইনি সংগীত পরিবেশন করেছেন।

এমন ও পণ্ডিত হলে কি হয়, ব্যবহারে নেই এতটুকু অহমিকা, বরং

অত্যন্ত অমায়িক ও সহানুভূতিশীলা। লেখক স্বয়ং এঁর স্নেহধন্য এবং নান ভাবে উপকৃত। বর্তমানে ইনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean Faculty o Music and Fine Arts। এছাড়াও সংগীত-নাটক একাডেমী, আকাশ বাণী তথা Education Ministry'র নানাবিধ দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। এঁর মতো মহীয়সী মহিলা সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

রাধিকামোহন মৈত্র
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাজসাহী জেলার তালন্দ গ্রামের জমিদার বংশে বিশ্ববিদিত সরোদ বাদক রাধিকামোহন মৈত্রের জন্ম হয়। ইনি প্রসিদ্ধ তবলা বাদক রায় বাহাদুর ললিতমোহন মৈত্রের পৌত্র এবং প্রসিদ্ধ সরোদ বাদক রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্রের পুত্র। এঁর সহোদর রবীন্দ্রমোহন মৈত্র খেয়ালীয়া হিসাবে সুবিদিত।

আগেকার ধনী বা বনেদী পরিবারের মতো এঁদের বাড়িতেও সংগীত-পৃষ্ঠপোষকতার প্রথা ছিল এবং বহু গুণী শিল্পীদের বসবাস তথা যাতায়াত ছিল। তানসেন বংশীয় ওস্তাদ রবাব ও সেতার বাদক আমীর খাঁ একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বছর এঁদের বাড়িতে ছিলেন। এই পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই এঁর সংগীতানুরাগ জন্মে এবং আমীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সংগীত সাধনার সঙ্গে লেখাপড়াও চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করার পরে রাজসাহী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালে আমীর খাঁর মৃত্যু হয়। তখন পারিবারিক বন্ধু শীতল মুখার্জীর সহায়তায় ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যাঁর কাছে ইনি প্রায় ১৪ বছর সুরশৃঙ্গার বাদন এবং ধ্রুপদ, ধামার ও সাদরা গান শিক্ষা করেছেন।

১৯৩৪ সালে ইনি এলাহাবাদ নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা এবং অল বেঙ্গল কনফারেন্স আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এলাহাবাদ ও কলকাতায় সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পান।

১৯৩৭ সাল থেকে ইনি কলকাতায় বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। এঁর বাদন বীণ অঙ্গপ্রধান এবং গায়কী অঙ্গের ছায়াযুক্ত।

ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে ইনি ১৯৫৫ সালে চীন, ১৯৬২ সালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড; ১৯৬৫ সালে আফগানিস্তান এবং ১৯৬৭ সালে নেপাল সফর করেছেন।

ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রগত অংশেও ইনি খুব উৎসাহী। সংগীত বিষয়ক অনেক সারগর্ভ রচনা ইনি লিখেছেন। ইনি অলকানন্দা, চন্দ্রমল্লার, দীপকল্যাণ প্রভৃতি নবীন রাগ সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া মোহনবীণা, দিলবাহার, নবদীপা প্রভৃতি নবীন বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করে ইনি অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তথা অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে এঁর অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনা যায়। এঁর প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর যা এঁর সংগীতেও পরিস্ফুট হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে সংগীত নাটক একাডেমী থেকে এঁকে পুরস্কৃত করে সম্মানিত করা হয়েছে।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতার আহিরীটোলায় যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পুত্র ধীরেন্দ্রর জন্ম হয়। মাত্র ১৪ দিন বয়সেই ইনি পিতৃহীন হন। তখন কাকা উপেন্দ্রর কাছে ইনি আশ্রয়লাভ করেন। কাকা ছিলেন গয়ার প্রখ্যাত আইনজীবি এবং সংগীত রসিক। বাড়ীতে নিয়মিত বসত গানের আসর এবং সমাগম হত অনেক স্বনামধন্য ওস্তাদদের। মাত্র দেড় বছর বয়সে কাকারও মৃত্যু হয়, তখন এঁর দাদারা, মনীন্দ্র ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র এঁর দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন।

শৈশবেই ধীরেন্দ্রর সংগীত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। গোয়ালিয়র ঘরানার প্রখ্যাতগুণী এবং বড়ে মহম্মদ খাঁর সতীর্থ বৃদ্ধ হনুমানদাসজীর কাছে এঁর সংগীতশিক্ষা শুরু হয়। গুরুপুত্র শনি মহারাজও এঁকে নানাবিধ গীতরীতির তালিম দেন। গানের সঙ্গে বাদন শিক্ষাও চলে। গুরুজী শেখালেন সংগীত ও এসরাজ আর শনি মহারাজ শেখালেন সংগীত ও হারমনিয়ম। সুদীর্ঘ ২০ বছর শিষ্যকে সস্নেহে এবং অকাতরে শিক্ষাদান করেন হনুমানদাসজী। শুধু খেয়াল, ঠুংরী ও লোকসংগীতই নয়, কীর্তন গানেও এঁর অসাধারণ দক্ষতা

যুবা বয়সেই সকলকে চমৎকৃত করে। নিতাইদাস, নবদ্বীপ ব্রজবাসী, রামঋষি, পরেশ মজুমদার প্রমুখ কীর্তনীয়াদের কাছে ইনি কীর্তন শিখেছেন। এঁর তবলা বাদনে দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাগুরু ছিলেন দর্শন সিংজী।

সংগীত চর্চার সঙ্গে বিদ্যার্জনও চলে অপ্রতিহত গতিতে, এবং যথাক্রমে পাশ করেন বি. এ., এল. এল. বি.। যুবা বয়সে ছাত্রদের বেতার অনুষ্ঠানে ইনিই ছিলেন চূড়ামণি, এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও শিল্পী প্রতিভাগুণে ইনি বহু বিশিষ্ট ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মুগ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী, রাজা গোপালাচারী, জেনারেল কারিয়াপ্পা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এক শুভযোগে। যাঁর উদ্যোগে ইনি প্রথম কীর্তন গান রেকর্ড করেন মেগাফোন কোম্পানীতে। পরে এঁর বহু গান রেকর্ড হয় মেগাফোন এবং H. M. V. কোম্পানীতে। হারমনিয়ম-সুর লহরীও রেকর্ড হয়েছে। তবে তা এঁর ভাইপো তরুণ চন্দ্রর নামে। কারণ হারমনিয়ম শিল্পী হিসাবে ইনি নিজেকে আড়ালে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

এঁর মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কদাচিৎ দেখা যায়। নিজেকে এমন ব্যাপক ও বিচিত্ররূপে প্রকাশ করার ক্ষমতাও বিরল। ইনি একাধারে গায়কশিল্পী, বাদক, শিক্ষক তথা অধ্যাপক। দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে ইনি সার্থক শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে ইনি বাংলাদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি স্থানে সংগীত সফর করেছেন, এবার ডাক এসেছে বুলগারিয়া থেকে। বর্তমানে ইনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতবিভাগের প্রধান এবং কলা-বিভাগের ডীনরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থকার স্বয়ং এঁর স্নেহধন্য। নানাভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে ইনি তাকে সাহায্য করেছেন। আমরা এই মহান শিল্পীর শান্তিময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অল্লারখা খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৮ সালে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার রতনগড় নামক স্থানে বিশ্ব-বিখ্যাত তবলীয়া ওস্তাদ অল্লারখা খাঁর জন্ম হয়। পিতা হাশিম আলী ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক এবং পুত্রও তাই হবে আশা করেছিলেন। কিন্তু

বাল্যকাল থেকেই বালকের অসাধারণ সংগীতানুরাগ লক্ষিত হয়। ১৫-১৬ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে, ইনি পাঠানকোটের এক নাটক কোম্পানিতে যোগ দেন। ভাগ্যক্রমে সেখানে ওস্তাদ কাদের বক্সের শিষ্য লালমহম্মদের (কোম্পানির সংগীতজ্ঞ) সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি বালকের অসাধারণ সংগীত প্রতিভা লক্ষ করে সযত্নে তবলা বাদন শিক্ষা দান আরম্ভ করেন। ওই সময়ে ইনি পাঠানকোটের মীরচাঁদ নামক এক সংগীত পণ্ডিতের কাছে ধ্রুপদ, ধামার আদি গান শিক্ষারও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিছুকাল পরে ইনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং একটি সংগীত শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। অবশ্য তা বেশিদিন টেঁকে নি।

কিছুদিন পরে কাকার সঙ্গে এঁকে লাহোরে যেতে হয়। সেখানে সংযোগবশতঃ ওস্তাদ কাদের বক্সের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল নিষ্ঠাসহ সাধনার পরে, ক্রমে ইনি আকাশবাণীর দিল্লী, লাহোর আদি কেন্দ্রে সংগীতকলা প্রদর্শনের সুযোগ পান। ১৯৩৭ সালে ইনি আকাশবাণীর বম্বে কেন্দ্রে নিযুক্ত হন।

১৯৪২ সালে ইনি চিত্রজগতে যোগদান করেন এবং ইকবাল কুরেশী ছদ্মনামে কতকগুলি ছবিতে সংগীতজ্ঞ তথা নির্দেশনার কাজ করেন। ইনি যে কত সুন্দর গান গাইতে পারেন সেকথা হয়তো অনেকেই জানেন না, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঙ্গের ঠুংরীতে তো এঁকে সিদ্ধহস্ত বলা যায়।

পণ্ডিত রবিশংকরের সহযোগী শিল্পী হয়ে আজ ইনি বিশ্বের দরবারে একজন অতি জনপ্রিয় তবলীয়া। যন্ত্রসংগীতে এঁর তবলা-সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পদ্মাকর নরহর বরভে
(২০শ শতাব্দী)

১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের অকোলা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ্বান বরভের জন্ম হয়। সংগীতে এঁর বংশগত অধিকার। এর পিতা নরহর চিন্তামণি বরভে ছিলেন গোয়ালিয়রের রহমত খাঁর শিষ্য এবং ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। এঁর মাতাও সুগায়িকা এবং সংগীত রচয়িতা হিসাবে সুপরিচিতা ছিলেন।

আট বছর বয়স থেকে ইনি পিতা এবং অন্যান্য সংগীত পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন কেশবরাও ইংড়ের কাছে ৪ বছর; মুরাদ খাঁ'র শিষ্য দিনকর ভউপটবর্ধন গায়ক, সেতারী ও তবলীয়ার কাছে ৯ বছর; শংকর রাও পণ্ডিতের কাছে ১৩ বছর এবং পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুরের কাছে ১৭ বছর সংগীত শিক্ষা লাভ করেছেন।

সংগীত শিক্ষার সঙ্গে ইনি যথাক্রমে বি. এ. বি. টি. পাশ করেছেন এবং গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় থেকে সংগীত অলংকার উপাধি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ইনি নানাবিধ যান্ত্রিক কাজকর্মে উৎসাহী এবং মৃৎশিল্পী হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এঁর কোনোপ্রকার নেশা নেই। অতি শুদ্ধাচারী নিরামিশ-ভোজী।

ইনি প্রায় সাড়ে তিন শত রাগ-ভিত্তিক সংগীত রচনা করেছেন, যার কতগুলি ইতিমধ্যে হাথরস সংগীত কার্যালয় থেকে 'সংগীত' নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। ইনি তিন বছর মহারাষ্ট্র এডুকেশন বোর্ডে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার; কিছুকাল বম্বে এইচ. এম. ভি.'র সংগীত পরিচালক এবং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতিনিধিরূপে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৪৯ সাল থেকে ইনি আকাশবাণীর প্রোগ্রাম একৃসিকিউটিভ ও প্রডিউসর রূপে নিযুক্ত এবং ১৯৭১ সাল থেকে দিল্লী কেন্দ্রে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডাইরেক্টর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

এঁর পত্নী শ্রীমতী মালতী বরভে' (পাণ্ডে) ও অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ও বিদুষী মহিলা হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইনি মহারাষ্ট্রের বর্ধা নামক স্থানে ১৯-৪-৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. অনার্স এবং গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় থেকে 'সংগীত অলংকার' উপাধি প্রাপ্তা। প্রায় পনেরো বছর মহারাষ্ট্রের ছায়াচিত্রে নেপথ্যে কণ্ঠদান এবং শতাধিক মারাঠি গান রেকর্ড করেছেন। হীরাবাঈ বড়োদেকর, কেশবরাও ভোলে, জগন্নাথ বুয়া পুরোহিত প্রমুখ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং স্বামীর কাছে সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন।

এঁরা স্বামী-স্ত্রী যথাক্রমে ১৯৪২ ও ১৯৫০ সাল থেকে আকাশবাণীর বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে এবং ন্যাশন্যাল প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এঁদের আচরণ অত্যন্ত অমায়িক ও সহানুভূতিপূর্ণ। গ্রন্থকার এঁদের স্নেহধন্য।

বাসবরাজ রাজগুরু

(২০শ শতাব্দী)

১৯২০ সালে দক্ষিণ ভারতের ধারবাড় নামক স্থানে এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত বাসবরাজ রাজগুরুর জন্ম হয়। এঁর পিতা মহন্তস্বামী রাজগুরু কর্ণাটক সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। যাঁর কাছে এঁর প্রারম্ভিক সংগীত শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু তিনি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না।

গোড়া থেকেই ইনি উত্তরী সংগীতের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। ভাগ্যক্রমে ইনি পণ্ডিত পচাক্ষরী বুয়ার শিষ্যত্বলাভ এবং একাদিক্রমে বারো বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে সংগীত শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে ইনি সবাই গন্ধর্ব এবং সুরেশবাবু মানের কাছেও সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন। ফলে ইনি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় সংগীতেই প্রবীণতা অর্জন করেছেন। তবে উত্তরী সংগীতেই ইনি অধিক প্রসিদ্ধ। এঁর গায়কীতে কিরাণা ও গোয়ালিয়র ঘরানার সমন্বয় দেখা যায়।

উত্তর ভারতের সকল সংগীত সম্মেলনে এবং আকাশবাণীর কেন্দ্রে ইনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমেও এঁর অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হয়ে থাকে। এঁর কণ্ঠস্বর সুমধুর এবং স্বভাব অত্যন্ত সহজ সরল ও বিনয়ী। বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে 'গান কোকিলা', 'সংগীত সুধাকর', 'সংগীত সর্বোদয়', 'সংগীতরত্ন' প্রভৃতি উপাধিলাভ করেছেন।

পণ্ডিত রবিশংকর

(২০শ শতাব্দী)

১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল বারাণসীধামে বিশ্ববিখ্যাত সেতারী পণ্ডিত রবিশংকরের জন্ম হয়। পিতা ডঃ শ্যামশংকর চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত সংগীত প্রেমী ছিলেন। যিনি ইংলণ্ড থেকে বার. এট. ল. এবং জেনেভা থেকে রাজনীতিতে ডকটরেট উপাধিলাভ করেন। তিনি কিছুদিন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছিলেন। স্বদেশে তাঁকে কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। তাঁর চার পুত্রের জ্যেষ্ঠ উদয়শংকর, বিশ্ববিখ্যাত নর্তক এবং কনিষ্ঠ হলেন রবিশংকর।

অল্প বয়সেই রবিশংকর বড়োদাদার নাচের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে এই অসাধারণ প্রতিভাবান বালক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এঁকে সংগীত শিক্ষায় উৎসাহ দেন। ইনিও তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইনি খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং সেতার শিক্ষারম্ভ করেন। খাঁ সাহেব এঁকে পুত্রবৎ যত্নে শিক্ষাদান করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চলে কঠোর সাধনা। ইতিমধ্যে, ১৯৪১ সালে খাঁ সাহেবের কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

১৯৪৫ সালে 'নৃত্যমণ্ডলী'তে সংগীত পরিচালনা করে ইনি রসিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৭ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' আয়োজিত ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'র সংগীত পরিচালনা এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত হন। ১৯৪৯ সালে আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে বাদ্যবৃন্দ নির্দেশনার জন্য এঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে ইনি সৃষ্টি করেন 'ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রা' এবং প্রবর্তন করেন অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের। ওদিকে ছায়াছবির জগতেও ইতিমধ্যে অবাধ বিচরণ শুরু হয়ে গেছে। এঁর সুরারোপিত নীলনগর, ধরতীকে চাল, অনুরাধা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কাবুলিওয়ালা, পথের পাঁচালী, অপরাজিত প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইনি সর্বদা রাগসংগীতের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে লোকসংগীতের সুরকেও অবহেলা করেন নি। ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বিদেশী ছবিতে সুরারোপের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁর সুরারোপিত 'চার্লি টেলস' ছবিটি ভেনিস ফেস্টিভেলে বিশেষে পুরস্কার লাভ করেছে।

১৯৫৬ সালে ইনি আকাশবাণীর উচ্চপদ পরিত্যাগ করে তবলীয়া চতুরলাল ও একজন তানপুরা বাদক মাত্র সঙ্গে নিয়ে বিদেশে ভারতীয় সংগীত প্রচারের উদ্দেশ্যে যান। সেখানে ইনি অত্যন্ত সমাদৃত হন এবং ক্রমে আমেরিকা, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালী, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা প্রভৃতি দেশে সার্থক সংগীত সফর করেন। ভারতীয় সংগীতের প্রচারার্থে বহুস্থানে ইনি বিনা পারিশ্রমিকে কলা প্রদর্শন করেছেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সর্বদা ইনি স্বয়ং একটি ভাষণ দিতেন। অবশ্য ইংরাজি ও ফরাসী ছাড়া অন্যান্য ভাষার জন্য দোভাষীর সাহায্য নিতেন। আধুনিকালে বিদেশে সংগীত প্রচারের ক্ষেত্রে ইনিই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। এইজন্য বিশ্ববিখ্যাত বেহালা

বাদক ইহুদী মেনুইনের সহায়তা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিটলদের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ জর্জ হ্যারিসন এঁর শিষ্য হওয়ায় আমেরিকাতে ইনি দেবতার মতো সম্মান পেয়ে থাকেন। লস এঞ্জেল্সএ কিন্নর স্কুল অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক এঁর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সংগীত বিষয়ক 'My music my life' নামক একখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করেছেন।

এঁর বাদনে একদিকে যেমন সাগরের গভীরতা অপরদিকে তেমনি উদ্দাম চঞ্চলতা। স্বর মাধুর্য ও প্রয়োগ কৌশলে এঁকে অদ্বিতীয় বলা যায়। তবে যুগ-বিবর্তন সম্বন্ধে ইনি খুব সচেতন। তাই কোনো একটি রাগ বহুক্ষণ বাজানোর পক্ষপাতী নন। এঁর নিজস্ব লং-প্লেয়িং ১৭খানি ছাড়া আলী আকবর ও মেনুইনের সঙ্গে দ্বৈত কতগুলি রেকর্ড আছে। এছাড়া লণ্ডন সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে ভারতীয় রাগ সংগীতের কিছু রেকর্ডও করেছেন। ইনি কয়েকটি নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে রসিকা রাগের রেকর্ডখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় রাগ উত্তর-ভারতে প্রচারে ক্ষেত্রেও এঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

এঁর স্বভাব মধুর ও মিশুক প্রকৃতির। ১৯৬২ সালে সংগীত পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' এবং ১৯৬৭ সালে দিল্লী গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় থেকে পদ্মভূষণ উপাধিলাভ করেছেন।

আলী আকবর খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯২০ সালের ১৪ই এপ্রিল ত্রিপুরার শিবপুর গ্রামে বিশ্ববিদিত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর একমাত্র পুত্র বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর জন্ম হয়। সংগীতময় পরিবেশে জন্ম হওয়ায় বাল্যকাল থেকেই সংগীতের প্রতি এঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। পিতার তত্ত্বাবধানেই ইনি প্রথমে ধ্রুপদ, ধামার এবং পরে সরোদ শিক্ষারম্ভ করেন।

মাইহরে থাকাকালীন এঁকে একটি ঘরে বন্ধ করে রেওয়াজ করান হত। অভ্যাস যাতে অবিরাম চলে তার জন্য ছিল কঠোর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে কিশোর আলী আকবর বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তখন সঙ্গে ছিল তাঁর প্রিয় সরোদ, একটি হাতঘড়ি এবং দুটি মাত্র টাকা। উদ্দেশ্যহীনভাবে

ট্রেনে চেপে বসলেন। টিকিট না থাকায় খণ্ডবার কাছে এক স্টেশনে এঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। পথে একস্থানে জুয়া খেলা হচ্ছিল, সেখানে টাকা এবং ঘড়িটি হেরে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় খণ্ডবা স্টেশনে উপস্থিত হন। অর্থচিন্তা ও অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে যখন স্টেশনে পায়চারী করছেন তখন ভাগ্যক্রমে একজন সংগীতপ্রেমীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি এঁর বাজনা শুনে প্রথমে পেট ভরে খাইয়ে দেন এবং আরো দু'এক জায়গায় বাজনা শুনিয়ে বম্বে যাবার পাথেয় সংগ্রহ করে দেন।

বম্বে পৌঁছে কাজের চেষ্টায় ইনি আকাশবাণীতে যান এবং সৌভাগ্যবশত সেখানে নিযুক্ত হন। বেতারে এঁর কার্যক্রম মাইহরের মহারাজা একদিন শুনতে পান ফলে আলাউদ্দীনের কানেও সে খবর আসে। তখন রেওয়াজের কঠোরতা শিথিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার এঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। ক্রমে এঁর আশানুরূপ উন্নতিলাভ হয় এবং দরবারেও বাজাতে থাকেন।

১৯৩৬ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলন থেকে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের আমন্ত্রণ এল, সংগী হলেন কিশোর আলী আকবর। শ্রোতা সমক্ষে সেই এঁর প্রথম অনুষ্ঠান। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই সংগীতের আসর সেখানেই ওস্তাদ আলী আকবর, একটি অতি পরিচিত নাম।

কিছুদিন পরে ইনি উদয়শংকরের নৃত্য মণ্ডলীতে যোগদান এবং বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ সালে ইহুদী মেনুহিনের আমন্ত্রণে আমেরিকা যান এবং ক্রমে এমন সমর্থ হন যে, লণ্ডন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী, আফগানিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সংগীতানুষ্ঠান করে প্রচুর খ্যাতি ও ধন উপার্জন তথা ভারতীয় সংগীতের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি কবেন।

বিদেশে ও স্বদেশে এঁর বহু রেকর্ড হয়েছে। ভগ্নীপতি রবিশংকরের সঙ্গে এঁর দ্বৈতবাদন তো বিশ্ববিদিত। আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তথা অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নিয়মিত এঁর অনুষ্ঠান শোনা যায়। লক্ষ্ণৌ আকাশবাণী কেন্দ্রে ইনি কিছুদিন বাদ্যবৃন্দ পরিচালনা করেছেন। ইনি শিল্পী, স্রষ্টা ও শিক্ষক সর্ববিষয়েই অসাধারণ। এঁর স্থাপিত 'আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক', যার শাখা বিদেশেও আছে, একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। 'আঁধিয়া', 'অন্তরীক্ষ', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দেবী', 'ঝিন্দের বন্দী', 'রাজদ্রোহী', 'সন এং

লুমিয়ার' প্রভৃতি ছবিতে সুর রচনায় ইনি এঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এর বাদন অত্যন্ত প্রভাবশালী যা উপজ, লয়কারী ও স্বরবিন্যাস বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। ইনি 'চন্দ্রনন্দন', 'গৌরীমঞ্জরী' প্রভৃতি কিছু নবীন রাগও সৃষ্টি করেছেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে নিখিল ব্যানার্জী, শরণরানী, শিশিরকণা ধর চৌধুরী, ব্রিজভূষণ কাবরা, রবীন ঘোষ তথা পুত্রেরা উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার এর গুণপনার স্বীকৃতি হিসাবে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করে একে সম্মানিত করেছেন।

গোপাল মিশ্র
(২০ শতাব্দী)

১৯২০ সালে কাশীধামে প্রসিদ্ধ সারেঙ্গী বাদক গোপাল মিশ্রের জন্ম হয়। সংগীতে এর বংশগত অধিকার। পিতা পণ্ডিত সুর সহায় মিশ্র অতি উত্তম সারেঙ্গী বাদক ছিলেন। এঁদের গুরু পরম্পরা পণ্ডিত গণেশজী মিশ্র থেকে আরম্ভ হয়েছিল।

বাল্যকালে পিতার কাছেই এর সারেঙ্গী শিক্ষারম্ভ হয়। পরবর্তীকালে ইনি সংগীত সম্রাট বড়ে রামদাসজীর কাছে কিছু গায়কী শিক্ষা করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সেই অতি উত্তম সারেঙ্গীবাদক হিসাবে ইনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে প্রথম শ্রেণীর বাদকরূপে শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সফলতার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন। সংগতকালে ইনি গায়কের রাগ বিকাশের কল্পনাকে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে থাকেন যে, শিল্পী উৎফুল্ল হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কলা প্রদর্শনের প্রেরণালাভ করেন। এঁর একক বাদনও অতি উচ্চস্তরেব। ভৈরবী, পীলু, কাফী, যোগ প্রভৃতি এর প্রিয় রাগ। তান, অলংকার প্রয়োগ তথা লয়কারীর উপরে এর অসাধারণ অধিকার প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। সমে আসার পূর্বে বহুবিচিত্র তেহাই প্রয়োগ এঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইনি কয়েকটি ছায়াচিত্রেও কাজ করেছেন।

বর্তমানে ইনি বেনারসের কবীর চৌরা নামক স্থানে সংগীত প্রচার, শিক্ষাদান ও সাধনাতে মগ্ন আছেন।

মহম্মদ সাগীরুদ্দীন খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯২১ সালের ১লা এপ্রিল মুঙ্গেরে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ সাগীরুদ্দীন খাঁর জন্ম হয়। পিতা হাজী টুন্নী খাঁ ছিলেন অতি উত্তম সারেঙ্গী বাদক এবং মুঙ্গেরের রাজ-দরবারের শিল্পী। তিনি গানও গাইতেন উত্তম খেয়ালীয়ার মতো। অগ্রজ বসীর আহমদ ছিলেন উত্তম গায়ক শিল্পী, যাঁর কাছে প্রথমে ইমনের সুরে শুরু হয় এঁর প্রথম পাঠ। তাঁর কাছেই ইনি খেয়ালের সঙ্গে গজল, ঠুংরীও শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে দশ কি বারো বছর বয়স থেকেই শুরু হয়েছিল সারেঙ্গীর তালিম।

১৯৩৮ কি ৩৯ সালে গয়াতে এক সংগীত সম্মেলনে ইনি ওস্তাদ বুন্দু খাঁর সারেঙ্গী শোনার সুযোগ পান। তাঁর সেই দেড় হাত বাঁশের অদ্ভুত সারেঙ্গীর তারগুলো ছিল স্টীলের। সাধারণ সারেঙ্গীর সঙ্গে তাব কোন মিল নেই। তিনি বাজাচ্ছিলেন মালকোষ। ওইরূপ অদ্ভুত যন্ত্র থেকে অমন সুন্দর সুর সৃষ্টি এঁকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়। হাজির হলেন তাঁর কাছে এবং নিবেদন করলেন তালিম নেবার বাসনা। কিছুদিন তালিম চলল, পরে ওস্তাদজী দিল্লীতে ফিরে গেলেন। সংগীত পিপাসু খাঁ সাহেবও বাড়ি পালিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং 'নাড়া' বেঁধে তাঁরই আশ্রয়ে তালিম চলল। এঁর মতে 'সওরঙ্গ' থেকে সারেঙ্গী শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ সারেঙ্গীতে একশো রকমের সুর বা রস সৃষ্টি সম্ভব। ওস্তাদজীর সম্পর্কে ইনি বলেন যে, তিনি এই যন্ত্রকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই আদায় করে নিতেন। গুরু হিসাবে তিনি ছিলেন খুব কঠোর কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি গান গেয়ে তাকে বাজিয়ে শোনাতেন। তাঁর নির্দেশে সারারাত সাধনা চলত। দিনের বেলায় একটু ঘুমিয়ে নিতেন।

১৯৪৪ সালে গুরুর সঙ্গেই কলকাতা আসেন খাঁ সাহেব। তার পরে ১৯৪৭ সালে প্রথম বাজান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সে এবং রাতারাতি প্রসিদ্ধিলাভ করেন সমগ্র কলকাতায়। সেই সঙ্গে আকাশবাণীতেও নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইনি প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

একক বাদনেও ইনি গুরুর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যুগের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে এলাহাবাদ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রভাকর পাশও করেছেন। খাঁ সাহেব যে এমন সুন্দর গান গাইতে পারেন সেকথা অনেকেই হয়তো জানেন না। লেখক স্বয়ং এঁর স্নেহধন্য এবং শিষ্যগোষ্ঠীর একজন।

দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পলুস্কর
(২০শ শতাব্দী)

১৯২১ সালের ২৮শে মে মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের কাছে কুরুন্দ্বার নামক স্থানে প্রসিদ্ধ গায়ক ডি. বি. পলুস্করের জন্ম হয়। ইনি সুবিখ্যাত সংগীতাচার্য পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের দ্বাদশ সন্তান। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে খুল্লতাত ভ্রাতা চিন্তামণি রাওয়ের কাছে সংগীত শিক্ষারম্ভ করেন। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ পিতার কাছেই হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইনি পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস এবং বিনায়ক রাও পটবর্ধনের কাছেও সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে জলন্ধরের 'হরবল্লভ মেলা'র সংগীত সম্মেলনে প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন এবং বিশিষ্ট গায়ক শিল্পী হিসাবে সম্মানিত হন। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এঁর সংগীত বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে, আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে, ছায়াছবিতে ও রেকর্ডের মাধ্যমে সমগ্র ভারতের সংগীত পিপাসুদের আনন্দদান করে। বৈজুবাওরা, শাপমোচন প্রভৃতি চিত্রে এঁর কণ্ঠস্বর অমর হয়ে আছে।

১৯৪৪ সালে ডাঃ কানহের কন্যা শ্রীমতী উষাদেবীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। অল্প বয়সে এমন বিপুল যশের অধিকারী হয়েও এঁর ব্যবহারে কোনো অহমিকা ছিল না। বরং অতি বিনয়ী ও মধুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই, গত ১৯৫৫ সালের ২৬শে অক্টোবর পুণার এক নার্সিংহোমে এঁর মৃত্যু হয়। এই অকাল মৃত্যুতে শুধু পলুস্কর বংশই নয়, ভারতীয় সংগীত সমাজও এক অসাধারণ প্রতিভাকে হারালো। এঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র বসন্তকুমার অল্প কিছুদিন পিতার কাছে সংগীত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।

সামতাপ্রসাদ (গুদাই মহারাজ)
(২০শ শতাব্দী)

১৯২১ সালের জুলাই মাসে কাশীধামের কবীর চৌরা নামক স্থানে বিশ্ববিখ্যাত তবলা বাদক সামতা প্রসাদের জন্ম হয়। এর পিতা বাচালাল মিশ্রও উত্তম তবলীয়া এবং সারগুজার রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন নেপাল রাজদরবারের তবলা বাদক। এঁরা ছিলেন তবলা সম্রাট প্রতাপ মহারাজের বংশধর।

পিতার কাছেই এঁর শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু অল্প বয়সেই পিতৃহীন হওয়ায় এঁর বাল্যকাল অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও কঠোর সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছে। এঁর মা ছিলেন অসাধারণ গুণবতী। সংগীত সম্বন্ধে ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তাঁর সামনেই ইনি রেওয়াজ করতেন। তারপরে প্রসিদ্ধ বিক্কু মহারাজের শিষ্যত্ব লাভ করেন। সেখানে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর যাবতীয় কাজ, এমন-কি, বৃদ্ধাবস্থায় গুরু'র মলমূত্র সাফ পর্যন্তও করতে হত। শুধু এই নয় গুরুগৃহ নির্মাণের সময়ে মিস্ত্রির খরচ বাঁচানোর জন্য ইঁট ভাঙ্গার কাজও করতে হয়েছে। বেনারসে, সেই বাড়িটি আজও এর জীবন সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

১৯৪৪ সালে ইনি প্রথম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু নতুন বাদককে নিয়ে কেহই বসতে চান না। ওইরূপ অবজ্ঞার সম্মুখীন যুবককে আশাতীত সম্মান দিলেন বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। জীবনের প্রথম অনুষ্ঠানেই এইরকম গুণীর সঙ্গে সংগতের সৌভাগ্যে ধন্য সামতাপ্রসাদের শিল্পী-জীবন স্মরণীয় হল বিশেষ বৈশিষ্টে। তারপর থেকেই ছন্দ জগতের এক বিস্ময়কর নাম হল সামতাপ্রসাদ।

কলকাতার প্রতি এঁর বিশেষ দুর্বলতা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। ইনি বলেন, ভারতবর্ষের সর্বত্রই বাজিয়েছি, বহু শ্রোতার সামনে, কিন্তু কলকাতার শ্রোতারা যে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে আমায় ধন্য করেছেন এমনটি আর কোথাও পাই নি।

১৯৫৩ সালে সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে ইনি সফর করেছেন চেকোশ্লোভাকিয়া, ইজিপ্ট, ওয়ারশ, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, রুমানিয়া, বুলগারিয়া

প্রভৃতি স্থানে। মস্কোর লেনিনগ্রাদ থিয়েটারে পঁচিশ হাজার শ্রোতার মধ্যে ছিলেন মার্শাল বুলগানিন ও নিকতা ক্রুশ্চেভ। অনুষ্ঠানের শেষে এঁর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অঙ্গুলি চালনে অভিভূত হয়ে তাঁরা এঁর আঙুলগুলি পরীক্ষা করেন এবং কোন শক্তিতে এমন বাজাও জিজ্ঞাসা করেন। ইনি এক কথায় তার উত্তরে বলেন যে, 'সাধনার শক্তিতে'।

১৯৫৮ এবং ১৯৬১ সালে বিলায়ত খাঁ'র সঙ্গে সংগীত সফরে গিয়েও ইনি অতুলনীয় যশের অধিকারী হয়েছেন। ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুদর্শন পুরুষ, এর প্রকৃতি অত্যন্ত অমায়িক ও প্রাণোচ্ছল। অনেকেই হয়তো জানেন না যে ইনি খুব সুন্দর কজরী গাইতে পারেন। বহু রেকর্ড ও ছবিতে ইনি কাজ করেছেন। স্বধর্মের প্রতি এঁর গভীর অনুরাগ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। কলকাতা এলে কালীঘাটে মায়ের দর্শন এঁর একটি অনিবার্য কাজ। এঁর সাফল্যের উৎস সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করলে ইনি তৎক্ষণাৎ বলেন "সব কালী মাই কি কৃপা"।

১৯৭১ সালে ভারত সরকার একে পদ্মশ্রী উপধি দান করে সম্মানিত করেছেন। এঁর সুযোগ্য দুই পুত্র কুমার ও কৈলাস গভীর সাধনায় মগ্ন। এঁর শিষ্যদের মধ্য জেরলমর্সী, নবকুমার পাণ্ডা, চন্দ্রকান্ত কামঠ, মানিক পোপটকর, বসন্ত পাবর, মানিলাল দাস, সত্যনারায়ণ বশিষ্ট প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আর্কট কানন
(২০শ শতাব্দী)

১৯২১ সালে মাদ্রাজে প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী আর্কট কাননের জন্ম হয়। পিতা মেলবার কানন ছিলেন নিজাম সরকারের একজন ইঞ্জিনিয়র। তাই এঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে হায়দ্রাবাদে। সেখানকার মেহবুবা কলেজ থেকে যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পরে ইনি বাবার মতোই বদলীর চাকরি পান নিজাম রেল কোম্পানিতে, সিগনাল ইনস্‌পেকৃটরের। ছাত্র জীবন থেকেই সংগীতের প্রতি এর গভীর অনুরাগ ছিল। হায়দ্রাবাদের লহমু বাপু রাওয়ের কাছে সংগীতে এর প্রথম হাতেখড়ি হয়। তবে উত্তরী সংগীতের প্রতি এঁর আকর্ষণ বেশি ছিল। সেই আকর্ষণের কারণ হল আব্দুল করিম খাঁ, কাণাকেষ্ট, সায়গল প্রমুখ শিল্পীদের সংগীত।

১৯৪১ সালে ইনি বম্বে আকাশবাণী থেকে শিল্পী স্বীকৃতি পান। ওই বছরেই চাকরির সুবাদে কলকাতা আসতে হয়, এবং সংযোগ বশত সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ইনি কলকাতার সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে শিল্পীখ্যাতি অর্জন করেন। গিরিজাবাবুর মৃত্যুর পরে ১৯৪৭ সালে ইনি ওস্তাদ আমীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি কলকাতা ত্যাগ করার অনিচ্ছায় এই বদলীর চাকরি ছেড়ে একটি ব্যবসা আরম্ভ করেন। দোকানের কাজ এবং সংগীত সাধনা চলতে থাকে। ক্রমে সংগীত শিল্পী হিসাবে ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

প্রখ্যাত সংগীতবিদ রবীন্দ্রলাল রায়ের কন্যা শ্রীমতী মালবিকাকে ইনি বিবাহ করেন। মালবিকাও গায়িকা হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ, এদের দ্বৈত সংগীত পরিবেশন ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ইনি অত্যন্ত সরল, উদার ও নিরহংকারী ব্যক্তি। কোনো শিল্পীই এর কাছে হেয় নয়। যে কেউ বিপদে পড়লে ইনি সর্বদা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এঁর উদারতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যায়। 'ঢুলী', 'যদুভট্ট', 'সুরের পিয়াসী,' 'বসন্ত বাহার', 'হারজিৎ', 'মেঘমল্লার,' 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রভৃতি অনেক ছায়াচিত্রে ইনি কণ্ঠদান করেছেন।

ভীমসেন যোশী
(২০শ শতাব্দী)

১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হুবলিতে ভীমসেন যোশী এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের ভজন শুনে ৩ বছর বয়সেই ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। বালক বয়সেই আব্দুল করিম খাঁর Record ("ফাগ বা ব্রিজ" আর 'পিয়া বিণ') শুনেই গানকে চিরসঙ্গী করবেন বলে স্থির করেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গান শেখেন। ভীষ্মদেব, কেশব মুকুন্দ লুখে, ভক্ত মঙ্গতরাম, ওস্তাদ মোস্তাক হোসেন খাঁর কাছে কিছু কিছু সময়ের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু 'কিরাণা' ঘরাণার প্রতি দুর্বার আকর্ষণের জন্যেই খাঁ সাহেবের শিষ্য সোয়াই গন্ধর্বকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। এর পরে তিনি তিন বছর প্রত্যহ ২০ ঘণ্টা করে রেওয়াজ করে নিজেকে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী, সরগম, তান, গমক প্রভৃতিতে নিপুণতম দক্ষতার মাধ্যমে রাগ

উন্মোচনের পেলব শিল্পী হয়ে ওঠেন। বর্তমান ভারতে তাঁর সমকক্ষ খেয়াল গায়ক আর দ্বিতীয় নেই। ১৯৪৬ সালে তাঁর গুরুর হীরক জয়ন্তী উৎসবে সংগীত পরিবেশন করে সারাভারতে নাম ছড়িয়ে পড়ে।

(শ্রীঅশোক বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

সলিল চৌধুরী
(২০শ শতাব্দী)

১৯২২ সালে, ২৪ পরগনার গাজিপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম হয়। পিতা ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীও একজন সুরসিক সংগীতজ্ঞ তথা সুগায়ক ছিলেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল বারাসত অঞ্চলে।

শৈশবে ছোড়দা নিখিল চৌধুরীর কাছে ইনি সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন। পরে ইনি তিমিরবরনের দলভুক্ত হয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সলিলবাবু অর্গান, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো, গীটার প্রভৃতি যন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রমে ইনি সংগীত জগতে পরিচিতি লাভ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে এম. এ. অধ্যয়নকালে গণনাট্য সংঘের ডাকে ইনি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। বিশ্ববিখ্যাত "কোন্ এক গাঁয়ের বঁধুর" গানখানি ওই সময়ের সৃষ্টি।

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিক সংগীতে ইনি বহু বিচিত্র নবীনতা সৃষ্ট করেছেন। বর্তমান চিত্রজগতে ইনি অদ্বিতীয় সুরকার ও সংগীত পরিচালক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইনি বহু গান রচনা করেছেন, যার অনেকগুলি 'ঘুম ভাঙার গান' (কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইনি বম্বের চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

বিষ্ণুগোবিন্দ যোগ
(২০শ শতাব্দী)

১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার ওয়াই (Wai) নামক স্থানে প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ভি. জি. যোগের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীগোবিন্দ গোপাল যোগ। সংগীতজ্ঞ বংশেই এঁর জন্ম। এঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষারম্ভ হয় খুল্লতাত শংকর রাও অঠাওলের কাছে। পরে ইনি পণ্ডিত ভি. শাস্ত্রী ও গণপৎ রাও পুরোহিতের কাছে বেহালা বাদন শিক্ষা করেন। ইনি কিছুকাল পণ্ডিত রতনজনকারের কাছেও সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন।

লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে 'বেলা শিক্ষক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৪২ সালে আলমোড়া সংগীত সম্মেলনে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে যুগলবন্দী অনুষ্ঠান করে যথেষ্ট যশস্বী হন। খাঁ সাহেব এই অনুষ্ঠানে এঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একটি সুন্দর বেহালা উপহার দেন। এছাড়া ইনি ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, ফৈয়াজ খাঁ, ওঁকারনাথ ঠাকুর, কেশরবাঈ প্রমুখ প্রসিদ্ধ গুণীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ থেকে এঁকে ডকটর অব মিউজিক উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ইনি হীরাবাঈ বড়দেকরের সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকাতে যান এবং বিভিন্ন স্থানে কৃতিত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করে প্রভূত অর্থ ও যশলাভ তথা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ১৯৬৮ সালে ইনি ওস্তাদ আলী আকবরের সঙ্গে আমেরিকা যান এবং বহু স্থানে সার্থক অনুষ্ঠান করেন। সেখানে ইনি ৯০ জন ছাত্র ছাত্রীকে শিষ্য করেন এবং বেহালা বাদন শিক্ষাদান করেন।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী, মৃন্ময় ধর, বসন্ত পাওয়ার, শিবকুমার আয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইনি আকাশবাণীর Music Producer হিসাবে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি অনেকস্থানে ছিলেন। বর্তমানে ইনি কলকাতা কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

নসীর মোইনুদ্দীন ডাগুর
(২০শ শতাব্দী)

১৯২২ সালের ২৪শে জুন অলবর রিয়াসতে ওস্তাদ নসীরুদ্দীনের পুত্র মোইনুদ্দীনের জন্ম হয়। এঁরা ডাগুরের হরিদাসের বংশধর বলে কথিত। এঁদের পূর্বপুরুষ পণ্ডিত গোপালনাথ নাকি শাহজাহানের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশে বহু উচ্চ শ্রেণীর গুণী জন্মেছেন।

মোইনুদ্দীনের শিক্ষারম্ভ হয় পিতামহ প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁর কাছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ইনি পিতার কাছে তালিম নেন। ১৯৩৪ সালে কাশীর এক সংগীত সম্মেলনে প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন। তোড়ী রাগ গাইবেন ঘোষিত হয় কিন্তু ভয়ে বিচলিত হওয়ার জন্য পঞ্চম স্বরটি প্রয়োগে অসমর্থ হন এবং গুর্জরী তোড়ী গেয়ে আসেন। এই অকৃতকার্যতার জন্য ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মনে মনে ভালো গায়ক শিল্পী হবার শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে পিতার মৃত্যুর পরে ইনি জয়পুরের ওস্তাদ রিয়জুদ্দীনের (মামা) কাছে তালিম নিতে যান। ১৯৪৬ সালে ওস্তাদজীর মৃত্যু হওয়ায় ইনি আর-এক মামা জিয়াউদ্দীনের কাছে শিক্ষারম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় ওস্তাদেরও মৃত্যু হয়। অবশ্য তখন ইনি অতি উত্তম কলাকার রূপে স্বীকৃত।

ইনি অত্যন্ত গম্ভীর অথচ মধুর স্বভাবের শিল্পী। এঁর গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ইনি কী অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। ধ্রুপদ গায়ক হিসাবে ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। এঁরা দুই ভাই মোইনুদ্দীন ও আমীনুদ্দীন একসঙ্গেই সংগীত পরিবেশন করতেন। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে গত ১৯৬৬ সালের ২৪শে মে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে এই অসাধারণ প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে।

দীপালি নাগ
(২০শ শতাব্দী)

১৯২২ সালে দার্জিলিং-এ, কলকাতার বরিশা অঞ্চল নিবাসী প্রফেসর জীবনচন্দ্র তালুকদারের কন্যা শ্রীমতী দীপালি নাগের জন্ম হয়। শৈশব থেকেই এঁর অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা লক্ষিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তাই সংগীত-চর্চাও বিশেষভাবে চলে। আগ্রা ঘরাণার অতিগুণী বসির খাঁ, তসদ্দুক হোসেন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রমুখ ওস্তাদদের কাছে ইনি সংগীত শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন।

১৯৩৯ সালে ইনি বেতার শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তখন থেকে ইনি ভারতের বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে সংগীত প্রচার এবং H. M. V. ও Hindusthan কোম্পানিতে বহু রাগপ্রধান ও উচ্চাঙ্গ সংগীত রেকর্ড করেছেন। ইনি লণ্ডন ও প্যারিস বেতার কেন্দ্র থেকেও সংগীত প্রচারের সুযোগলাভ করেন।

১৯৭১ সালে ইনি 'India week'-এ যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল নিয়ে ইনি রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে সংগীত সফর করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে ইনি ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দিতে বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। এঁর রচিত সংগীত গ্রন্থ "রাগপ্রধান সংগীত" এবং "Notation of Western Music" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজে ইনি ডক্টর কুয়েলরুটর এবং জন কুপারের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়ে কাজ করেছেন। কলকাতার স্টেটস্‌ম্যান ও দিল্লীর লিংক পত্রিকার সংগীত সমালোচক হিসাবে ইনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ইনি দিল্লীতে দিল্লী মিউজিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সংগীত শিক্ষিকা হিসাবেও ইনি সুপরিচিতা। ১৯৫০-৬৭ সাল পর্যন্ত ইনি কলকাতার 'সংগীত ভারতী'র সহ অধ্যক্ষা ছিলেন। কলকাতার বেতারকেন্দ্রে ইনি সহযোগী প্রডিউসররূপেও কিছুকাল কাজ করেছেন। 'নগমা' এবং 'সপ্তস্বর' নামক সংগীতসংস্থা দুটি এঁরই সৃষ্টি।

এঁর স্বামী ডক্টর বি. ডি. নাগচৌধুরী একজন স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এঁর যাবতীয় গুণাবলী বিকাশে বিশেষ যত্নশীল এবং উৎসাহী। এই মহান প্রতিভার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন যে, কী অসাধারণ এঁর কর্মক্ষমতা এবং নিয়মানুবর্তিতা। এত ব্যস্ততার মধ্যেও এঁর আন্তরিকতা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ সকলকে মুগ্ধ করে।

কিশন মহারাজ

(২০শ শতাব্দী)

১৯২৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্ম হওয়ায় এর নামকরণ হয় কিশন মহারাজ। এঁর পিতা হরিপ্রসাদ শৈশবেই মারা যান। তবে এঁর মামা প্রসিদ্ধ কণ্ঠে মহারাজ পিতার মতো আদর যত্নে এঁকে লালন পালন করেন। তাঁর কাছেই কিশনের তবলা শিক্ষারম্ভ হয়।

অসাধারণ প্রতিভাবান কিশনের গোড়া থেকেই কঠিন ও দুরূহ তালের প্রতি আগ্রহ লক্ষিত হয়। বহুদিন ইনি ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ প্রভৃতি মাত্রাযুক্ত দুরূহ তাল অভ্যাস করেছেন। ফলে যে-কোনো ঠেকাতে নানাবিধ টুকড়ে তেহাই আদি প্রয়োগ এর পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। অল্প বয়সেই, বিভিন্ন উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গত করে ইনি অত্যন্ত খ্যাতি-লাভ করেন। এই খ্যাতি এমন দিগন্ত বিস্তৃত হয় যে, অল্প বয়সেই ইনি 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির' সদস্য রূপে নির্বাচিত হয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন।

ইনি অত্যন্ত নিরহংকারী ও মিষ্টভাষী তথা সাধকোচিত মনোভাবাপন্ন শিল্পী। ইনি বলেন যে, 'আমি যখন নানাবিধ অলংকার, তেহাই আদি কল্পনা করে প্রয়োগ করি তখন আমি সমাধিস্থ যোগীর মতো আনন্দ লাভ করি।'

নসীর আমীনুদ্দীন ডাগুর

(২০শ শতাব্দী)

১৯২৪ সালের ২৪শে মার্চ ইন্দোরে ওস্তাদ নাসিরুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র আমীনুদ্দীনের জন্ম হয়। বাল্যকালে এঁর খেলাধূলার প্রতিই বেশি ঝোঁক

ছিল কিন্তু বড়ো ভাই মোইনুদ্দীনের প্রভাবে ইনি সংগীত চর্চায় আগ্রহী হন। পিতার কাছেই এঁর প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়েছিল, তবে এঁর যথার্থ সংগীত শিক্ষা হয় দাদার কাছে। এঁরা দুই ভাই ভারতের বিভিন্ন স্থানের সংগীত সম্মেলনে দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে যশস্বী হয়েছেন।

এঁর আরো দুই ভাই জহীরুদ্দীন ও ফৈয়াজুদ্দীনও বর্তমানে অতিগুণী গায়ক হিসাবে দিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুমার গন্ধর্ব
(২০শ শতাব্দী)

১৯২৪ সালের সালের ৮ই এপ্রিল বেলগাঁও জেলার সুলেভাবে নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী কুমার গন্ধর্বের জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম 'শিবপুত্র সিদ্ধরমৈয়া কোমকালি'। এঁর পিতা সিদ্ধরাম স্বামী ছিলেন একজন অতি উচ্চস্তরের সংগীত সাধক এবং এঁর আদি গুরু। ১৯৩৬ সালে ইনি বি. আর. দেবধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অসাধারণ প্রতিভাবান শ্রীকুমার শ্রুতিধর হওয়ায় বাল্যকাল থেকেই যে-কোনো গান হুবহু নকল করে গাইতে পারতেন। ফলে অল্প বয়সেই সুবিখ্যাত হয়ে পড়েন। ১৯৩৫ সালে, মাত্র ১১ বৎসর বয়সেই ইনি এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন, এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত হন।

ইনি ভজন, গজল, লোকগীতি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সংগীতের মতোই গাইতে পারেন। যে-কোনো প্রকার গান গাইবার সময় মনে হয় যে, ইনি এই গানেই যেন সিদ্ধহস্ত, অন্য গান করেন না। এঁর গায়ন বৈশিষ্ট্য এমনই স্বকীয়তায় মহিমান্বিত। রাজস্থানের লোকগীতির উপরে এঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, যার ভিত্তিতে ইনি মালতী, লগনগান্ধার, সঞ্জারী, নিদিয়ারী, রাতকা মাধবী, সহেলী তোড়ী প্রভৃতি নবীন রাগ রচনা করেছেন। আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এঁর বহু রেকর্ড প্রায়ই শোনা যায়।

১৯৪৭ সালে শ্রীমতী ভানুমতীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। বিবাহের এক বছরের মধ্যেই ইনি দারুণ ক্ষয়রোগাক্রান্ত হন। স্ত্রীর অসাধারণ সেবায় ইনি আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু সেই রোগেই স্ত্রী'র মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে

অনেকদিন গান বন্ধ থাকলেও আবার ইনি গান গাইছেন। আমরা এই প্রতিভাবান শিল্পীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ডক্টর লালমণি মিশ্র
(২০শ শতাব্দী)

১৯২৪ সালে কানপুরে এক সম্ভ্রান্ত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবারে ডক্টর লালমণি মিশ্রের জন্ম হয়। এঁর পিতা পণ্ডিত রঘুবংশীলাল মিশ্র ব্যবসায়ী হলেও সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানী এবং সংপ্রেমী ছিলেন। ১৯৩০ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় এঁদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। সামান্য কিছু ধন নিয়ে এঁরা কোনোমতে কলকাতায় চলে আসেন এবং আবার ব্যাবসা শুরু করেন। মাতা রানীদেবী ছিলেন অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী। তাঁর সংগীত শিক্ষার জন্য তাই পণ্ডিত গোবর্ধনলাল শর্মাকে নিযুক্ত করা হয়। সংগীত চর্চাকালে লালমণি মায়ের কাছে বসে থাকতেন। একদিন ইনি পণ্ডিতজীর শেখানো যাবতীয় সরগম হারমনিয়মে বাজিয়ে শুনিয়ে শর্মাজীকে অবাক করে দেন। তখন শর্মাজী এঁকে গান শেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর সংগীত ভাণ্ডার নিঃশেষ করে ইনি সকলকে বিস্মিত করেন। এঁর পিতা কয়েকজন উত্তম জ্যোতিষীকে দিয়ে এর ভাগ্য গণনা করালে তারাও এঁর সংগীতজ্ঞ হিসাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন।

ইনি শ্রুতিধর এবং অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় অতি অল্পকালের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ কালিকাপ্রসাদ মিশ্র, স্বামী প্রমোদানন্দ প্রমুখের কাছে ধ্রুপদ, ধামার গান ও তবলা বাদন শিক্ষা করেন। এঁর সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রামপুরের সেনী ঘরাণার ওস্তাদ মেহদীহুসেন খাঁ এঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং খেয়ালগান শিক্ষা দেন। ক্রমে ইনি এমন প্রসিদ্ধিলাভ করেন যে থিয়েটার পার্টি, রেকর্ড কোম্পানি, ছায়াচিত্র প্রভৃতি থেকে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। এই সময়ে ইনি বাদ্যসংগীতের প্রতি আগ্রহী হন এবং শুকদেব রায়ের কাছে সেতার বাদন শিক্ষারম্ভ করেন।

পিতার মৃত্যুর পরে ইনি কানপুরে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৪৪ সালে সেখানের কান্যকুব্জ কলেজে সংগীত-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমে এই কলেজ উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়। ইনি কণ্ঠসংগীত,

তবলা ও সেতার বাদন শিক্ষা দিতেন আর আকাশবাণীতে জলতরঙ্গ বাজাতেন। একদিন ওস্তাদ আজীজ খাঁর বীণা (বিচিত্র বীণা) বাদন শুনে ইনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। ইনি উপলব্ধি করেন যে, বীণা হিন্দুদের ধর্মীয় বাদ্যযন্ত্র, এর পরম্পরা-রক্ষার ভার হিন্দুদেরই নেওয়া উচিত, কিন্তু এবিষয়ে হিন্দু শিল্পীদের উৎসাহ অত্যন্ত কম। এইসব বিবেচনা করে ইনি খাঁসাহেবের কাছে বীণাবাদন শিক্ষারম্ভ করেন। শ্রীরতনজনকরের আমন্ত্রণে, লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে, ভাতখণ্ডে জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম ইনি বিচিত্র বীণা বাজিয়ে শোনান এবং অত্যন্ত সমাদৃত হন। সেই থেকে ইনি বিচিত্র বীণাকেই এঁর প্রিয়তম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ইনি এঁর অনুগামীদের সহযোগিতায় কানপুরে 'ভারতীয় সংগীত পরিষদ' স্থাপন করেন এবং ১৯৪৮ সালের ১৬ই আগস্ট সেখানে 'গান্ধী সংগীত মহাবিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যাচার্য এঁকে তাঁর দলের সংগীত নির্দেশকরূপে নিয়োগ করেন এবং ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ইনি এই দলের সঙ্গে শ্রীলংকা, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীতকলা প্রদর্শন করেন। এই ভ্রমণকালে ইনি উপলব্ধি করেন যে, সংগীতজ্ঞদের উচ্চ শিক্ষিতও হওয়া কর্তব্য। তাই ইনি অধ্যয়নকার্যে মনোনিবেশ ও আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অনুসন্ধান কার্যের জন্য পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন।

এই অনুসন্ধান কার্যে ইনি ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন, মধ্যকালীন তথা আধুনিককালের বাদ্যযন্ত্রাদির স্বরূপাত্মক এবং প্রয়োগাত্মক বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রমাণ করেন যে, সেতার তবলা প্রভৃতি আমীর খসরু সৃষ্ট নয়; এগুলি প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী বীণা, পুষ্কর প্রভৃতির বিবর্তিত রূপ। এছাড়া আধুনিক সরোদ ও রবাব প্রাচীন স্বরশৃঙ্গার ও চিত্রাবীণার বিবর্তিত রূপ।

১৯৫৬ সালে ইনি অখিল ভারতীয় গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু সংগীত সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে 'গান্ধীসংগীত মহাবিদ্যালয়ের' প্রিন্সিপাল রূপে নিযুক্ত হন, কিন্তু পণ্ডিত ওঁকারনাথের ইচ্ছাক্রমে এঁকে বেনারসে যেতে হয়! এঁর মনে সংগীত জ্ঞানলিপ্সা ছিল অত্যন্ত তীব্র তাই ১৯৫৮ সালে আবার কাশী হিন্দু বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু মহত্ত্বপূর্ণ কাজ করেন। এই সময়ে ইনি একটি বীণা নির্মাণ করেন যাতে ভরত বর্ণিত সারনা চতুষ্টয়ের সমস্ত প্রক্রিয়া প্রমাণ করা সম্ভব। ভারত তথা পৃথিবীর বহু সংগীতজ্ঞেরা এই বীণা দেখেছেন এবং এর থেকে ২২টি শ্রুতি শুনেছেন। বর্তমানে ইনি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনায় লিপ্ত আছেন এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত মহাবিদ্যালয়ে প্রফেসর অফ মিউজিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইতি-পূর্বে এই পদে পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর, ডক্টর বি, আর দেবধর প্রমুখ সংগীত পণ্ডিতেরা ছিলেন।

সংগীতকলা তথা সংগীতশাস্ত্রে এইরূপ বহুমুখী প্রতিভা কদাচিৎ দেখা যায়। এঁর সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ওস্তাদ বিলায়ত খাঁ

(২০শ শতাব্দী)

১৯২৭ সালে (জন্মাষ্টমীর দিন) বাংলাদেশের গৌরীপুর ষ্টেটে ওস্তাদ ইনায়ত খাঁর পুত্র বিলায়ত খাঁর জন্ম হয়। অত্যধিক আদর যত্নের জন্য এঁর স্কুলের শিক্ষা বেশিদূর এগোয় নি। পরবর্তীকালে যার জন্য ইনি অনুতপ্ত ছিলেন। তাই বাড়িতে নিজের চেষ্টায় ইনি বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী, উর্দু, ফারসী, আরবী প্রভৃতি সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেন। এঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষা, বংশীয় রীতিতে, পিতার কাছেই আরম্ভ হয়। কিন্তু ইনি পাঁচ-ছয় বছর মাত্র সেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অতঃপর মায়ের সঙ্গে ইনি দিল্লী যান। এঁর মা বসিরন বিবি ছিলেন সাহারানপুরের বিখ্যাত খেয়ালীয়া ওস্তাদ বন্দে হোসেন খাঁর কন্যা এবং একজন কুশল গায়িকা। তাঁর উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে তখন বিলায়তকে দিনে দশ-বারো ঘণ্টা রেওয়াজ করতে হত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ইনি মাতামহ বন্দে হোসেন ও কাকা বহিদ হোসেনের কাছে গায়কী ও সুরবাহার শিক্ষা করেন। তখন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ ও ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর গায়কীর প্রভাবও এঁর জীবনে অত্যন্ত লাভদায়ক হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে বম্বেতে আয়োজিত এক বিরাট সংগীত সম্মেলনে ইনি আমন্ত্রিত হন। সেই অনুষ্ঠানে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁর

সংগীতে শ্রোতৃমণ্ডলী এমন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন যে, পাঁচবার একে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তারপরে বিভিন্ন স্থান থেকে এঁর ডাক আসতে থাকে এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতমরূপে স্বীকৃত হন। শুধু স্বদেশেই নয়, বৃটেন, চীন, রাশিয়া, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিদেশের বহু স্থানে সংগীত পরিবেশন করেও ইনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অভিনন্দন আদায় করেছেন। বৃটেনের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ স্যার বেঞ্জামিন মুক্তকণ্ঠে এঁর অসাধারণত্ব স্বীকার করেছেন।

ছায়াছবিতে সুরকার হিসাবেও ইনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের সুখ্যাতি প্রাপ্ত ছবি 'জলসাঘর' ও মার্চেণ্ট আইভরি প্রোডাকসন্সের 'গুরু' ছবি দুটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এঁর বহু রেকর্ড আছে। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মেগাফোন কোম্পানি থেকে এঁর প্রথম রেকর্ড হয়। যার একদিকে ইনায়ত খাঁ রাগ জোগিয়া এবং অপরদিকে ইনি রাগ মিয়াঁ কি তোড়ী বাজিয়েছেন। তারপরে H. M. V. থেকে ১১খানি লং-প্লেয়িং এবং বিসমিল্লা খাঁর শানাই ও ইম্‌রতের সুরবাহারের সঙ্গে যুগলবন্দীতে কয়েকখানি রেকর্ড করেছেন।

এঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সহোদর ইমরত হোসেন, ভাগ্নে রইস খাঁ, অরবিন্দ পারেখ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, বেঞ্জামিন গোমেশ, বিন্দু ঝাবেরী, হসমত আলী খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এত ব্যস্ততার মধ্যে কিন্তু ইনি শিল্পীমনের আসল খোরাক পান না; তাই কোলাহল এড়াবার জন্য সিমলার এক ছোটো বাংলোয় গিয়ে মাঝে মাঝে দিন কাটান।

রাধাকান্ত নন্দী
(২০শ শতাব্দী)

১৯২৭ সালে বরিশাল জেলার বানরীপাড়া নামক স্থানে রোহিণীকান্ত নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ তবলীয়া রাধাকান্ত নন্দীর জন্ম হয়। এঁর পিতামহ কালীচরণ নগর-সংকীর্তন করতেন, যাঁর সঙ্গে ছোটবেলায় ইনি মন্দিরা নিয়ে ঘুরতেন। পিতা ও কাকা তবলীয়া হিসাবে খ্যাতিবান ছিলেন। তবে তাঁরা এঁকে লেখাপড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে উৎসাহ দিতেন। ইনি

কিন্তু মন্দিরা, করতাল, খোল প্রভৃতির সঙ্গে তবলা চর্চাও শুরু করেছেন। কিন্তু পিতা চাইতেন আগে লেখাপড়া। এই মনান্তরের জন্য একদিন ইনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন। সৈন্যদলের এক নৃত্যমণ্ডলীতে কাজ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক বছর।

কিছুদিন পরে যখন কলকাতায় উপস্থিত হলেন তখন শুনলেন যে, ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হয়েছে। তখন সংসারের দায়িত্ব এলো এঁর উপরে। তখন ভাগ্যক্রমে পিতৃবন্ধু সারেঙ্গীবাদক ব্রজবন্ধুবাবু এঁকে বাঈজীদের আসরে বাজানোর ব্যবস্থা করে দেন। কয়েক বছর এই অবস্থায় কাটার পরে সৌভাগ্যবশত সংগীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যিনি এঁর প্রতিভা ও গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে এনে ফিল্মে বাজানোর সুযোগ করে দেন।

তারপর থেকে এঁর জীবনে সুদিন আসে। পরিচিত হন বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গে এবং ক্রমে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে। ইতিমধ্যে কৈশোরের স্বপ্ন সফল হয়েছে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন পণ্ডিত আনোখেলাল মিশ্রর। লঘু ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে ইনি বহু ভারতবিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমে শিখলেন খোল, কাড়া, নাকাড়া, পাখোয়াজ, মাদল সব কিছু। এমন-কি, বম্বেতে প্রচলিত 'নাল' যন্ত্রটিও, যাকে ইনি কয়েকখানি রেকর্ডে (বাংলা গানের) ব্যবহারও করেছেন।

১৯৬৬ সালে যান লণ্ডনে, নেহেরু তহবিলের জন্য, যে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে আবার লণ্ডনে যান। বর্তমানে ইনি কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁর শিষ্যদের মধ্যে কমল সেনগুপ্ত, শৈলেন ব্যানার্জী, মণীন্দ্র নন্দী, প্রদীপ চক্রবর্তী ও ছোটভাই নীলকান্ত নন্দী উল্লেখযোগ্য।

আব্দুল হালীম জাফর খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯২৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের কাছে জাবরা গ্রামে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার বাদক আব্দুল হালীম জাফর খাঁর জন্ম হয়। এঁর

পিতা জাফর খাঁ উত্তম সেতার বাদক তথা অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। জন্মের কিছুকাল পরে এঁর পিতা সপরিবারে বম্বে চলে যান। বাল্যকাল থেকেই এঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভা লক্ষিত হয়। কণ্ঠস্বর-মাধুর্যের জন্য মাত্র নয় বছর বয়সেই ইনি আকাশবাণী থেকে গজল গাইবার সুযোগ পান। তখন থেকে পিতার কাছে এঁর সেতার বাদন শিক্ষাও আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে সংযোগবশতঃ প্রসিদ্ধ বীণকার মুরাদ খাঁর শিষ্য ওস্তাদ বাবু খাঁর সেতার বাদন শুনে ইনি অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র দুই বছর তালিম গ্রহণের পরেই বাবু খাঁর মৃত্যু হয়। এর পরে ইনি মেহবুব খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেতার শিক্ষা ও পড়াশুনা চলতে থাকে। ম্যাট্রিক পাশ করার পরে ইনি নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর সাধনা আরম্ভ করেন।

হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবগ্রস্ত হন এবং অনন্যোপায় হয়ে ইনি 'এশিয়াটিক পিকচার্স'-এর বৃন্দবাদন বিভাগে যোগ দেন। ক্রমে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। আনারকলি, নবাব, মহাত্মা বিদুর প্রভৃতি অনেক ছায়াচিত্রে ইনি সেতার ও জলতরঙ্গ বাজিয়েছেন। কিন্তু এই জীবন এঁর ভালো লাগে না। আর্থিক সংকট থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়ার পরে ইনি চিত্রজগত থেকেও বিদায় নেন এবং কঠোর সাধনায় নিজেকে মগ্ন করেন। ক্রমে বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন তথা আকাশবাণীতে এঁর কার্যক্রম প্রসারিত হয় এবং ভারত-বিখ্যাত শিল্পীরূপে ইনি স্বীকৃতি লাভ করেন।

মসীতখানী ও রজাখানী বাদন-শৈলীর সঙ্গে ইনি একটি নবীন বাদন-শৈলীর উদ্ভাবনা করেন যা জাফরখানী বাজ নামে পরিচিত। এর বৈশিষ্ট্য হল মিজরাবের থেকে বাঁহাতের অপরূপ কারুকার্যের অধিক প্রয়োগ। এছাড়া এঁর বাদনে অতুলনীয় বিশেষত্ব হল বীণ-অঙ্গ, ঘট-ভরণ, মঝামিরী, গতঅঙ্গ, চপকাঙ্গ, লড়-গুথান, উছট-লড়ী, ছেড়ছাড়, ফরক, লহক, জোড়, ঝালা প্রভৃতির অদ্ভুত প্রয়োগ।

ইনি কতগুলি রাগকে সংস্কার সাধন করে সার্থকতম প্রচার করেছেন। যেমন বসন্তমুখারী, চম্পাকলি, রাজেশ্বরী, শ্যামকেদার, রূপমঞ্জরী, মলুর, ফরগনা প্রভৃতি। এছাড়া ইনি কিরবানী, লতাঙ্গী, চলনাট, সম্মুখপ্রিয়, হেমাবতী প্রভৃতি কর্ণাটক রাগকে উত্তর ভারতে জনপ্রিয় করেছেন। চক্রধূন, ফুলবন,

কল্পনা, মধ্যমী, খুসরুবাণী প্রভৃতি কতকগুলি নবীন রাগও ইনি সৃষ্টি করেছেন। এঁর বহু রেকর্ড আছে, যার মধ্যে পাহাড়ী, মারবা, কিরবাণী, কেদার, বাগেশ্রী প্রভৃতি অতুলনীয় সংগীত সৃষ্টির প্রতীক। ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মণ্ডলীর সদস্যরূপে ইনি অনেকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ভারত সরকার এঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত করে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন।

নিখিল ব্যানার্জী
(২০শ শতাব্দী)

১৯৩০ সালে কলকাতায় বিশ্ববিখ্যাত সেতারী নিখিল ব্যানার্জীর জন্ম হয়। পিতা জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উত্তম সেতারী। যাঁর কাছে শুরু হয় এঁর প্রথম পাঠ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নিখিল বাবু মাত্র নয় বছর বয়সে নিখিল-বাংলা সেতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আকাশবাণীর কনিষ্ঠতম শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত হন। বছর পাঁচেক নিয়মিত অনুষ্ঠান করার পরে গৌরীপুরের প্রবীণ সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কাছে শুরু হয় সেতারের দ্বিতীয় পর্ব। ১৯৪৭ সালে বীরেন্দ্রকিশোর এঁকে আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং খাঁ সাহেবও প্রতিভাবান বালককে শেখাতে রাজি হন।

তখন থেকে শুরু হয় কঠোর সাধনা। আসরের আমন্ত্রণ, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান, সবকিছুর মোহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান সুদূর মাইহারে। শিক্ষার্থী জীবনের সাত বছর কাটল গুরুর আশ্রয়ে। ক্লান্তিহীন সাধনায়। গুরুর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হল আলী আকবরের অকৃপণ সহযোগিতা।

১৯৫৪ সালে, কলকাতায় তানসেন সংগীত সম্মেলনে আবির্ভূত হলেন প্রথম, এবং মুগ্ধ করলেন রসিক সমাজকে। ১৯৫৫ সাল থেকেই শুরু হল সংগীত সফর। পাড়ি দিলেন বিদেশে। ভ্রমণ করলেন অষ্ট্রেলিয়া, চীন, নেপাল, আফগানিস্তান, রাশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপ। ভারতের সংগীত সম্মেলনেও স্থান পেলেন বিশিষ্ট শিল্পীদের তালিকায়। ১৯৬৭ সালে পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। আলোড়ন সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন শহরে। ইংলণ্ডও বাদ পড়লো না, সর্বত্রই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অভিনন্দন আদায় করলেন বাংলা তথা ভারতের গৌরব নিখিল ব্যানার্জী। তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও এঁকে পাড়ি দিতে হয়

ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরে, 'আমেরিকান সোসাইটি ফর ইস্টার্ন আর্টস সামার স্কুলে', বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য।

১৯৬৮ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছেন।

ডি. কে. দাতার
(২০শ শতাব্দী)

১৯৩৩ সালে প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক দামোদর কেশব দাতারের জন্ম হয়। এঁর পিতা কেশব ভাস্কর দাতার অত্যন্ত সংগীত প্রেমী এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের শিষ্য ছিলেন। বাল্যকালে পিতার কাছেই এঁর সংগীত শিক্ষারম্ভ হয়। কিছুকাল পরে ইনি বেহালা বাদন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হন এবং পণ্ডিত বিগ্নেশ্বর শাস্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাড়িতে সংগীতময় পরিবেশ হওয়ায় সংগীত শিক্ষায় অত্যন্ত দ্রুত উন্নতিলাভ করেন।

মধুর স্বর প্রয়োগ তথা গায়কী অঙ্গযুক্ত বাদন বৈশিষ্ট্যের জন্য ইনি অল্প বয়সেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আকাশবাণী তথা বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যে ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আকাশবাণীর অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে এঁর সংগীত নিয়মিত প্রচারিত হয়ে থাকে।

গোপীকৃষ্ণ
(২০শ শতাব্দী)

১৯৩৩ সালের ২২শে আগস্ট কলকাতায় সুপ্রসিদ্ধ নর্তক নটরাজ গোপীকৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতা রাধাকৃষ্ণ সম্থলিয়া ছিলেন ব্যবসায়ী। অল্পবয়সেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহ পণ্ডিত সুখদেব মহারাজ এঁকে পালন করেন, সংগীত শিক্ষারম্ভও হয় তাঁর কাছে।

১১-১২ বছর বয়সে ইনি নৃত্যাচার্য শম্ভু মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বহুকাল কথকনৃত্য শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজ পিল্লাই এবং

প্রখ্যাত নৃত্যপটিয়সী সিতারা দেবীর কাছে ইনি ভরতনাট্যম ও মণিপুরী নৃত্য শিক্ষা করেন।

এঁরা চার ভাই পাণ্ডে, চৌবে ও তিবারী মহারাজ এবং তিন বোন সিতারা, তারা ও অলকনন্দা। এঁরা সকলেই সংগীত জগতে পরিচিত।

ইনি 'সাকী', 'আঁধিয়া', 'মধুবালা', 'পরিণীতা', 'সঙ্গদিল', 'বাগী', 'চিনগারী', প্রভৃতি বহু ছবিতে নৃত্য পরিচালনা করেছেন। ভি. শান্তারাম পরিচালিত 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' ছবিতে স্বয়ং নৃত্য প্রদর্শন করে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন।

এঁর শিষ্যদের মধ্যে মধুবালা, সন্ধ্যা, শশিকলা, নাজ, ইন্দ্রানী রহমান, কুক্কু, মীনাকুমারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইনি বম্বে চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

সলামত আলী নও জাকত আলী

(২০শ শতাব্দী)

প্রসিদ্ধ খেয়াল, ঠুংরী ও গজল গায়ক ওস্তাদ সলামত ও নজাকত আলীর জন্ম যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৪ সালে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার শ্যাম-চৌরাশী গ্রামে হয়। দেশ বিভাগের পরে এঁরা পাকিস্তানে চলে যান। তবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বড়ো বড়ো সংগীত সম্মেলনে এঁরা আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং বয়সে নবীন হলেও এঁরা শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের শ্রেণীভূক্ত।

এঁদের পিতা বিলায়ত আলী এবং জ্যেষ্ঠতাত আহমদ আলী অতি গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁরাও দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করতেন। এই বংশে দ্বৈত গায়ন রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। এঁরাও তাই দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। এঁদের কণ্ঠস্বর এবং গায়ন শৈলী অপরূপ ও আকর্ষণীয়।

বংশীয় রীতিতে ধ্রুপদ দিয়ে পিতা ও জ্যেঠার কাছে এঁদের সংগীত শিক্ষা হয়। তবে মনে হয় এঁরা সংগীতের উৎকর্ষতায় বংশীয় ধারাকে অতিক্রম করেছেন।

বিরজু মহারাজ
(২০শ শতাব্দী)

১৯৩৪ সালে লক্ষ্নৌ ঘরাণার বিখ্যাত নর্তক অচ্ছন মহারাজের একমাত্র পুত্র বিরজু মহারাজের জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম হল ব্রজমোহন লাল। এঁর প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কাছেই আরম্ভ হয়। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পরে ইনি কাকা লচ্ছন মহারাজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। নৃত্যে এঁর বংশগত অধিকার ছিল, মাত্র সাত বছরের সময়ে ইনি দেরাদুনে প্রথম নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন, তাতেই এঁর অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পায় এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমে ইনি ভারত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর সম্মান অর্জন করেন।

দিল্লীর 'সংগীত ভারতী' নামক সংস্থাতে ইনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, এবং কয়েকটি নৃত্যনাট্যও রচনা করেন কিন্তু তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেন না। ফলে ইনি লক্ষ্নৌ প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পরে আবার ইনি দিল্লীর 'ভারতীয় কলাকেন্দ্র' নামক সংস্থাতে শিক্ষকতার কাজ পান। এই সংস্থাতে ইনি লচ্ছন মহারাজের সহায়তায় 'কুমার সম্ভব', 'ফাগলীলা', 'গোবর্ধন-লীলা', 'মালতী মাধব', 'শানে অবধ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রচনা করে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন।

শিশিরকণা ধর চৌধুরী
(২০শ শতাব্দী)

আনুমানিক ১৯৩৯ সালে আসামের শিলং সহরে ডাক্তার বি. দে'র কন্যা শ্রীমতী শিশিরকণার জন্ম হয়। ডাক্তারবাবু ছিলেন অত্যন্ত সংগীত প্রেমী তাই কন্যাদের বিবিধ যন্ত্রসংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে বাড়িতে নিয়মিত সংগীত চর্চা হত। শিলংয়ের প্রায় সব অনুষ্ঠানেই দে ভগিনীবৃন্দের যন্ত্রসংগীত (বৃন্দবাদন) শোনা যেত। সেই দলটির পরিচালনা এবং সংগীত পরিকল্পনা করতেন শ্রীমতী শিশিরকণা।

এঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভা লক্ষ্য করে ডাক্তারবাবু প্রসিদ্ধ মোতী-

মিশ্রাকে শিক্ষার জন্ত নিযুক্ত করেন। বেহালার প্রতি শ্রীমতীর অসীম আগ্রহ ছিল, ফলে, পরে পণ্ডিত ভি. জি. যোগের কাছে শিক্ষারম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার গুণে সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী-কালে ইনি ওস্তাদ আলীআকবর খাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে বর্তমানে ইনি খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন।

১৯৫৪ সালে কলকাতায় আয়োজিত তানসেন সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এক হাজার টাকা পুরস্কার পান। এঁর বাদন-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল স্পষ্ট ও মধুর স্বর প্রয়োগ, গতের বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা, সাপট ও ফিরত তোড়া তেহাই প্রয়োগের অসাধারণ নিপুণতা। এমনকি তবলীয়া যদি কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক আচরণ করেন তাহলে ইনিও পেছপা হন না। সর্বোপরি রাগরূপ প্রকাশকালে এঁর গভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আলাপ বিস্তার, যাকে অতুলনীয় বলা যায়। ১৯৭০ সালে নেপালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি বেহালার মতো কষ্টসাধ্য ও মহত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্রে রাষ্ট্রীয় তথা আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর স্বামী শ্রীবাদল চৌধুরী ব্যবসায়ী হলেও অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী এবং শ্রীমতীর সংগীত সাধনায় পরম উৎসাহী। বর্তমানে ইনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন।

আমজাদ আলী খাঁ
(২০শ শতাব্দী)

১৯৪৫ সালের ৯ই অক্টোবর গোয়ালিয়রে সুপ্রসিদ্ধ হাফেজ আলী খাঁর সার্থক উত্তর সাধক অতিগুণী সরোদীয়া ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর জন্ম হয়। মাত্র ২৫।২৬ বছর বয়সেই ওস্তাদ শব্দটি নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সহজ নয়। সরোদে রাগ-রূপায়ণ, জোড়, ঝালা, লয় প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছেন এই বয়সে। শুধু ঘরাণার দৌলতেই এতখানি এগিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া যোগ্য পিতা অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু ক'জন তার সার্থক ধারক হতে পেরেছেন? এঁর অসাধারণ প্রতিভা তথা সাধনালব্ধ বিদ্যা রসিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র এঁর নামটি থাকলেই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র স্বদেশেই নয়, ইতিমধ্যে ইনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে মরিসাস, আফগানিস্তান, আমেরিকা প্রভৃতি বিশ্বের নানাস্থানে সংগীত পরিবেশন করে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছেন। ১৯৭১ সালে ইনি 'ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ফোরামে' মালকোষ রাগ পরিবেশন করে 'ইউনেসকো এ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। আমরা এই প্রতিভাবান শিল্পীর শান্তিময় সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করি।

প্রাচীন সংগীত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন সংগীত প্রসঙ্গ

আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমাদের দেশে সংগীত সম্পর্কিত যে সকল নিদর্শনাদি (বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র তথা গ্রন্থ প্রভৃতি) পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে আর্চিক গাথিকাদি নিয়মানুসারে সংগীতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত সেই গান্ধর্ব, মার্গ, অভিজাত দেশী প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত যে বহু বিচিত্র গীতরীতির পরিচয় পাওয়া যায়—গ্রাম, জাতি, মূর্ছনা প্রভৃতি জটিলতা অতিক্রম করে, তার সঠিক পরিচয় দেওয়া বা রূপ নিরূপণ করা আজ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবু পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি তথা পাঠ্যক্রমের পূর্ণতা রক্ষা করার জন্য এই পরিচ্ছেদে ওই বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হোল।

গান্ধর্ব গান

কথিত আছে যে, আদি সংগীতাচার্য সদাশিব বা ব্রহ্মা ভরত গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের সৃষ্টি করেছেন। গান্ধর্ব গানের পরিচয়ে মহর্ষি ভরত বলেছেন :

যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্য সমাশ্রয়ম্।
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালে পদাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ বহুবিচিত্র বাদ্যযন্ত্রাদি সমন্বিত তথা স্বর, তাল ও পদ যুক্ত গানকে গান্ধর্ব বলে।

তিনি স্বর, তাল ও পদের পরিচয়ে বলেছেন যে, শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্ছনা জাতি স্থান বর্ণ অলংকার প্রভৃতি স্বরের, আরোপ নিষ্ক্রাম বিক্ষেপ প্রবেশক শম্যা সন্নিপাত পরিবর্ত বস্তু মাত্রা তাল বিদারী অঙ্গুলি যতি প্রকরণ গীত অবয়ব মার্গ পাদ ভাগ পাণি প্রভৃতি তালের এবং ব্যঞ্জন স্বর বর্ণ সন্ধি বিভক্তি আখ্যাত উপসর্গ নিপাত তদ্ধিত ছন্দ বৃত্ত জাতি প্রভৃতি পদের অন্তর্গত।

কথিত আছে যে, গন্ধর্বেরা এই গান করতেন বলেই নাকি এর নাম হয় গান্ধর্ব। তাঁরা গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার?) দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁদের গান নাকি দেবতারা খুব ভালবাসতেন।

মার্গ সংগীত

প্রকৃতপক্ষে গান্ধর্ব এবং মার্গসংগীতের মূলগত অর্থ একই, যা শ্রুতি জাতি গ্রাম মূর্ছনা ধাতু স্বর প্রভৃতির সংমিশ্রণে ছিল বৈচিত্র্যময় এবং কঠোর সাংস্কৃতিক নিয়মাধীন। প্রাচীন বৈদিক গানের উপাদানেই গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতের উৎপত্তি। মনে হয় গান্ধর্বকেই তৎপরবর্তীকালে মার্গসংগীত বলা হোত। যার প্রমাণ পণ্ডিত দামোদরের বর্ণনাতে পাওয়া যায়। যেমন,

দ্রুহিণেতযদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।
মহাদেবপুরস্তস্মান্মার্গাখ্যং বিমুক্তদম্॥

অর্থাৎ দ্রুহিণ (ব্রহ্মা) যে সংগীত সৃষ্ট করেছিলেন এবং যে সংগীতের সাহায্যে ভরত মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন তাকে মার্গ সংগীত বলে।

গান্ধর্বগানের পরিচয়েও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। এছাড়াও মনে রাখতে হবে যে এদের অন্তর্নিহিত অর্থও প্রায় অভিন্ন, কারণ মার্গ অর্থ পথ, অন্বেষিত বা দৃষ্ট। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্যই মার্গ সংগীত প্রযুক্ত ছিল, গান্ধর্বগানও তাই।

মতঙ্গ মার্গ ও দেশী গানের পরিচয় প্রসঙ্গেও অনুরূপ কথাই বলেছেন। যেমন,

আলাপাদি নিবদ্ধ যঃ চ মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ।
আলাপাদি বিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্তিতঃ।

অর্থাৎ যে গানে আলাপাদির (স্বর তাল মূর্ছনা অলংকার প্রভৃতি) সমাবেশ থাকে তাকে মার্গসংগীত এবং আলাপাদির বৈশিষ্ট্য বিহীন গানকে দেশী (আঞ্চলিক) সংগীত বলে।

অতএব গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতকে অভিন্ন বলা মনে হয় অসঙ্গত নয়। কারণ এ'দুটি বৈদিক গানের উপাদানেই সৃষ্ট। বৈদিক যুগের শেষের দিকে সম্ভবত গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এর সঠিক পরিচয়-দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক রাগসংগীতের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই।

দেশী সংগীত

বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক ভাষায় সমাজ লোকরুচি প্রভৃতি অনুসারে যে সকল সংগীত প্রচলিত তাকে দেশী সংগীত বলে। শার্ঙ্গদেব এর পরিচয়ে বলেছেন :

দেশে দেশে জনানাং যদরুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
গীতং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ দেশী গানের কোন নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের বালাই নেই। কারণ যার যেমন রুচি তেমনি গান করাকেই দেশী সংগীত বলে। পাশ্চাত্যে যাকে বলা হয় Folk music।

দেশী সংগীতকে কেহ কেহ অভিজাত দেশী সংগীত বলেও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মনে হয় এরা ভিন্ন। কারণ অভিজাত দেশী সংগীত হোল মার্গ সংগীতের ক্রমবিবর্তিত রূপ এবং ক্লাসিক্যাল শ্রেণীর গান, যার বিবর্তিত রূপ হোল আধুনিক রাগ সংগীত। দেশী সংগীত বলতে মনে হয় লোকসংগীতই বোঝায়।

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে গান্ধর্ব গান ছিল দুই রকম। উদ্‌গ্রাহ মেলাপকাদি ধাতু এবং স্বর বিরুদাদি ছয়টি অঙ্গযুক্ত হলে নিবদ্ধ এবং তালের বন্ধনহীন হলে অনিবদ্ধ শ্রেণীর গান বলা হোত। বর্তমান রাগ সংগীতেও অনুরূপ বিধি প্রচলিত আছে। অতএব তালবদ্ধ যাবতীয় গীতরীতি নিবদ্ধ এবং তালহীন গীতরীতি অনিবদ্ধ শ্রেণীর গান।

নিবদ্ধ গানে তাল ছন্দ যতি পদ সমনিয়ত অক্ষর প্রভৃতি এবং বীণা বেণু ও মৃদঙ্গাদির সহযোগ থাকতো। অনিবদ্ধ গানে এগুলির সমাবেশ থাকলেও তালের বন্ধন মুক্ত হোত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তালের বন্ধন না থাকলেও, অনিবদ্ধ গানে ছন্দ থাকতো যা বাদ্যযন্ত্রাদির সাহায্যে প্রকাশিত হোত।

ধাতু ও মাতু

নিবদ্ধ গানের বিভিন্ন ভাগকে ধাতু বলা হোত। উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ ভেদে ধাতু ছিল পাঁচ প্রকার। পরবর্তী কালে স্থায়ী, অন্তরা (তুক) প্রভৃতি এর থেকেই উদ্ভাবিত। 'হরিবংশ সংগীতে এর পরিচয়ে বলা

হয়েছে—“গীতস্তবয়বো ধাতু রাগাদিমাতুরুচ্যতে,” অর্থাৎ গীতের অবয়বকে ধাতু এবং রাগাদিকে মাতু বলে। ধাতু ও মাতু সহযোগেই গানকে রঞ্জকগুণ বিশিষ্ট করা হয়। কেহ কেহ গানের স্বরকে ধাতু এবং কথা বা সাহিত্যকে মাতু, আবার কেহ কেহ গানের রাগকে ধাতু এবং ভাষাকে মাতু বলে উল্লেখ করেছেন।

আক্ষিপ্তিকা

স্বর তাল পদ প্রভৃতি সহযোগে রচিত যাবতীয় গানকে আক্ষিপ্তিকা বলা হোত, অর্থাৎ নিবদ্ধ গান মাত্রই আক্ষিপ্তিকা শ্রেণীভুক্ত।

বাগ্গেয়কার

বাগ্গেয়কার বলতে গীতিকার বোঝায়। পাশ্চাত্যে যাকে বলা হয় Composer। যার জন্য সংগীতজ্ঞান, কাব্য ও ভাষাজ্ঞান, লোকাভিরুচিজ্ঞান প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে বাগ্গেয়কারেব পদ্য ও স্বর রচনায় গভীর জ্ঞান থাকা কর্তব্য। যাকে অনেকে ধাতু ও মাতু জ্ঞান বলে থাকেন। পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব বাগ্গেয়কারের যে সকল গুণের কথা বলেছেন তা এইরূপ—

১। অমর কোষ তথা ব্যাকরণ শাস্ত্র-জ্ঞান।

২। নানাবিধ ছন্দ জ্ঞান।

৩। সংগীত শাস্ত্রোল্লিখিত অলংকার জ্ঞান।

৪। সাহিত্য তথা রস ও ভাবের জ্ঞান।

৫। আঞ্চলিক রীতিনীতির জ্ঞান।

৬। বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান।

৭। সংগীতের শাস্ত্র ও ক্রিয়াত্মক জ্ঞান।

৮। তাল লয় ও কলাজ্ঞান।

৯। ছয়প্রকার কাকু জ্ঞান।

১০। সুন্দর গান গাইবার ক্ষমতা।

১১। রাগ ও দ্বেষহীন অথচ বাক্‌পটুতায় দক্ষ।

১২। সরল সরস কিন্তু কোথায় কোন জিনিষ যোগ্য, সে বিষয়ে জ্ঞান।

১৩। স্বকীয়তা।

১৪। অন্যের মনোভাব বোঝার ক্ষমতা।

১৫। দ্রুত কবিতা রচনার ক্ষমতা।

১৬। বিভিন্ন গীতের ছায়া অনুকরণের ক্ষমতা।

১৭। প্রাচীন ও বর্তমান সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান।

১৮। চিত্তের একাগ্রতায় নিষ্ঠাবান।

পণ্ডিত

যিনি সংগীতজ্ঞ হিসাবে সাধারণ, কিন্তু যাবতীয় সংগীত শাস্ত্র জ্ঞানে অসাধারণ পারদর্শী তাকে সংগীত পণ্ডিত বলা হয়।

নায়ক

যিনি প্রাচীন ও বর্তমান সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং গুরুপরম্পরায় সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন এবং বন্দেশী সংগীত পরিবেশনে দক্ষ তাঁকে নায়ক বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে সংগীতের সর্ববিভাগেই শ্রেষ্ঠ গুনী এবং বিদ্বানকে নায়ক বলা হয়। হাকিম মহম্মদ করম ইমাম তাঁর রচিত 'মাদনুল মৌষিকী (১৮৫৩ খৃঃ) গ্রন্থে বারোজন নায়কের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন,

১। ভানু, ২। লোহঙ্গ, ৩। ডালু, ৪। ভগবান, ৫। গোপাল, ৬। বৈজু, ৭। পাঁড়ে, ৮। চর্জ্জু, ৯। বক্সু, ১০। ধোণ্ডু, ১১। মীরামধ এবং ১২। আমীর খসরু।

গায়ক গায়কী

যিনি গুরু পরম্পরায় সংগীতশিক্ষা লাভ তথা রস ও ভাব উপলব্ধি করে স্বকীয় ও সুললিত ভঙ্গীতে তা পরিবেশন করতে পারেন তাকে গায়ক এবং তাঁর বিশেষ গায়নভঙ্গীকে গায়কী বলা হয়। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার উত্তম গায়কের উল্লেখ আছে। যেমন,

১। শিক্ষাকার, যে গায়ক শিক্ষাদানে দক্ষ।

২। অনুকার, যে গায়ক অন্যের অনুকরণে দক্ষ।

৩। রসিক, যে গায়ক রস সৃষ্টিতে দক্ষ।

৪। রঞ্জক, যে গায়ক শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে রাখতে দক্ষ।

৫। ভাবুক, যে গায়ক সংগীতে নব নব উৎকর্ষ সাধনে দক্ষ।

প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক

প্রাচীনকালে গান মাত্রই ছিল প্রবন্ধ। শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক প্রভৃতিকে নিবদ্ধ গান বলে উল্লেখ করেছেন। তখন ছত্রিশটি ধারার প্রবন্ধ প্রচলিত ছিল। প্রবন্ধগানে পাঁচটি ধাতু, ছয়টি অঙ্গ এবং পাঁচটি শ্রেণী ছিল এবং ধ্রুপদের মতো গাওয়া হোত। পাঁচটি ধাতু হোল—উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ; ছয়টি অঙ্গ হোল—১। স্বর : সা রে গ ম প্রভৃতি, ২। বিরুদ : স্তুতিবাচক ধ্বনি; ৩। পদ : কাব্য বা বাণী; ৪। তেনক : মঙ্গলবাচক ধ্বনি; ৫। পাট : যন্ত্রাদির বোল এবং ৬। তাল : নানা লয়ভেদ; পাঁচটি শ্রেণী হোল : ১। পূর্বোক্ত ছয়টি অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধকে 'মেদিনী', ২। পাঁচটিতে 'নন্দিনী', ৩। চারটিতে 'দীপনী', ৪। তিনটিতে 'ভাবনী' এবং ৫। দুটিতে 'তারাবলী'। একটি মাত্র অঙ্গযুক্তকে প্রবন্ধ বলা হয় না।

ভরত বস্তুকে মাত্রা এবং স্বর সমন্বিত বিভিন্ন পদের প্রকাশক বলেছেন। আবার তালের সহযোগী বা উদ্বোধক বলেও উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব বস্তুকে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন যে, বস্তু প্রবন্ধে পাঁচটি পদ থাকে যার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পদে পনেরোটি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে বারোটি করে মাত্রার সমাবেশ থাকে। এগুলির প্রথমার্ধে স্বর ও বাদ্যের অক্ষর এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্বর ও কল্যাণবাচক শব্দ থাকে, এবং এগুলি 'দোধক' নামক ছন্দযুক্ত হয়। এছাড়া পূর্ণ প্রসন্নাদি দশটি গুণযুক্ত তথা দোষহীন হয়। কল্লিনাথ বলেছেন যে, বিভিন্ন রাগে এবং তাল, ছন্দ, লয়, গ্রহ, রস ভাব, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকাই রূপক এবং প্রবন্ধাদির বৈশিষ্ট্য। আলাপ পর্যায়ে আর একটি রূপকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে রূপকালাপ বলা হয়।

বিদারী

বিদারী অর্থ বিদীর্ণ। নাট্যশাস্ত্রকার এর অভিধানিক অর্থ বলেছেন—'গীতের খণ্ড বা বিভাগ'। কিন্তু তিনি এর পরিচয়ে বলেছেন :—

"পদবর্ণ সমাপ্তস্তু বিদারীত্যভিসংজ্ঞিতা"

অর্থাৎ পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম বিদারী। আসলে গান বা আলাপের ছোট ছোট অংশকে বিদারী বলে। সেই হিসাবে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপকাদি অথবা বর্তমান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী প্রভৃতি বিদারী শ্রেণীভুক্ত।

সামুদ্গ, অর্ধসামুদ্গ ও বিবৃত এই তিন প্রকার ভেদ ছাড়াও মহাবিদারী ও অন্তরবিদারী ভেদে বিদারী (প্রধানত) দুই প্রকার। গানের সম্পূর্ণ অবয়ব বা বস্তুকে মহাবিদারী এবং পদ ও বর্ণের দ্বারা যা শেষ হয় তাকে অন্তরবিদারী বলে বিদারীর অন্তিম স্বরগুলিকে অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতি বলা হয়।

আলাপ গান

আলাপ হোল অনিবদ্ধ গান। অর্থাৎ রাগ বিশেষের রূপকে স্বরবিস্তারের সাহায্যে পরিস্ফুট করাকে আলাপ গান বলে। তবে এতে তাল না থাকলেও ছন্দ থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রে এর বিবিধ শ্রেণীবিভাগের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলাপ ও আলপ্তি

চতুর কল্লিনাথ আলাপ ও আলপ্তির মধ্যে কিছুটা বৈষম্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে আলাপগান রাগ রূপের বিকাশসাধন করে, কিন্তু আলপ্তি তাকে কার্যকরী বা বাস্তবতায় পরিণত করে। পণ্ডিত ব্যংকটমুখীর মতে আলপ্তি হোল রাগালাপের এক প্রকারভেদ, যাতে রাগ লক্ষণগুলির সঙ্গে আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রক্রিয়া যুক্ত করে গাওয়া হোত। বস্তুতঃ আলাপ ও আলপ্তি উভয়েরই রাগরূপ প্রকাশের শক্তি আছে, তাই শব্দ হিসাবে এ'দুটি পৃথক হলেও এদের অন্তর্নিহিত অর্থ অভিন্ন।

স্বস্থান নিয়ম দ্ব্যর্ধ, দ্বিগুণ ও অর্ধস্থিত স্বর

আলাপ গানের এক বিশেষ রীতিকে বলা হোত স্বস্থান নিয়ম ; যা কঠোরভাবে পালন করা হোত। স্থায়ী বা অংশ স্বরের উপরেই সম্পূর্ণ আলাপগান নির্ভরশীল ; যার চতুর্থ স্বরকে 'দ্ব্যর্ধ' এবং অষ্টম স্বরকে 'দ্বিগুণ' স্বর বলা হোত। দ্ব্যর্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্তী স্বর কয়টিকে 'অর্ধস্থিত' স্বর বলা হোত। আলাপ গানের প্রথম অংশ দ্ব্যর্ধ স্বরের নীচে গাওয়ার রীতি ছিল এবং পরবর্তী অংশে অন্যান্য স্বর সমূহ ব্যবহৃত হোত।

বর্তমান রাগ-সংগীতের আলাপ গানেও বাদী সমবাদী প্রভৃতির প্রাধান্য প্রায় অনুরূপ নিয়মানুসারেই রক্ষিত হয়ে থাকে।

রাগালাপ

রাগালাপ পরিচয়ে পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব বলেছেন :

গ্রহাংশমন্দ্রতারাণাং ন্যাসাপন্যাসয়োস্তথা।
অল্পত্বস্য বহুত্বস্য ষাড়বৌড় বয়োরপি॥
অভিব্যক্তির্যত্র দৃষ্টা সা রাগালাপ উচ্যতে। [১]

অর্থাৎ যে আলাপ গানে রাগ বিশেষের গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষড়বত্ব ও ঔড়বত্ব এই দশটি লক্ষণ প্রকাশ করা হয় তাকে রাগালাপ বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিত ব্যংকটমুখী কিছুটা ভিন্নরূপে রাগ লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন :

রঞ্জয়ন্তি মনাংসীতি রাগাস্তে দশলক্ষণাঃ।
লক্ষণানি দেশোক্তানি লক্ষ্যন্তেতাবদাদিতঃ॥
গ্রহাংশৌ মন্দ্রতারৌ চ ন্যাসাপন্যাসকৌ তথা।
অথ সন্যাসবিন্যাসৌ বহুত্বংচাল্পতা তথা॥
লক্ষণানি দেশৈক্তানি রাগাণাং মুনয়োব্রুবন।

অর্থাৎ ইনি ষড়বত্ব ও ঔড়বত্বকে বর্জন করে এবং সন্যাস ও বিন্যাসকে গ্রহণ করে দশটি রাগলক্ষণ স্বীকার করেছেন।

রূপকালাপ

আলাপ গানের আর এক প্রকারভেদকে রূপকালাপ বলা হোত। একে রাগালাপের থেকে কিছুটা উন্নতর বা বিস্তৃত বলা যায়। এই গীত রীতিতে রাগ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রবন্ধের ধাতুর মতোই আলাপের বিভিন্ন ভাগ এতে প্রদর্শিত হোত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা প্রত্যক্ষ থাকতো। চতুর কল্লিনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই ভাগগুলির অন্তিম স্বরগুলিকেই ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতি বলা হোত। তবে পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব একে তালযুক্ত রূপক-প্রবন্ধ রূপে, স্বীকার করে পূর্ণ, প্রসন্ন প্রভৃতি দশটি গুণযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

[১] সংগীতরত্নাকর (আডেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ২০

প্রকৃতপক্ষে আলাপ, আলপ্তি, রাগালাপ, রূপকালাপ প্রভৃতির মূলগত উদ্দেশ্য ও অর্থ প্রায় একই। তবে রাগরূপের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের ক্রমবিকাশ বৈচিত্র্যের জন্যই এগুলির প্রয়োগ-পার্থক্য প্রদর্শিত হোত।

গ্রাম

গ্রাম প্রাচীন ঠাট বিশেষ (Scale)। প্রাচীনকালে গ্রামই বর্তমানের মেল, মেলকর্তা বা ঠাটের কাজ করতো। আসলে যে স্বরকে স্থিতি (আবস্তিক বা আদি স্বর) করে সংগীতারম্ভ করা হয় তাই গ্রাম। অর্থাৎ যে কোন স্বরই গ্রাম হতে পারে। রাগকে নিয়মন ও প্রকাশ করার জন্য পরে মূর্ছনার বিকাশ হয়েছিল। মোটকথা গ্রাম, মূর্ছনা, মেল, ঠাট প্রভৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তথা সাতটি স্বর নিয়ে গঠিত। এগুলির মূলগত অর্থ প্রায় অভিন্ন। প্রাচীন শাস্ত্রে তিনটি গ্রামের উল্লেখ আছে :

ষড়্‌জ মধ্যমগান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামা মতা ইহ ॥
ষড়্‌জগ্রামো ভবেদত্র মধ্যমগ্রাম এব চ।
স্বরলোকে চ গান্ধারোগ্রামঃ প্রচারিত ধ্রুবম্ ॥

সংগীতদামোদর—শুভংকর।

অর্থাৎ ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটি গ্রাম। এর প্রথম দুটি ভূলোকে এবং শেষেরটি দেবলোকে প্রচলিত ছিল। তবে নাট্যশাস্ত্রকার দুটি মাত্র গ্রামই স্বীকার করেছেন :

অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্‌জমধ্যমশ্চেতি।
তত্রাশ্রিতা দ্বাবিংশতি শ্রুতয়ঃ ॥

অর্থাৎ ষড়্‌জ ও মধ্যম এই দুটি গ্রাম এবং এদের প্রতিটিতে বাইশটি করে শ্রুতি আছে।

গান্ধার গ্রামটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অব্দের বহু পূর্বেই লোপ পেয়েছিল। কারণ রামায়ণ-মহাভারতাদিতে উল্লেখ থাকায় তখন পর্যন্ত যে গান্ধার গ্রামের প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। এছাড়া নারদীশিক্ষার "স্বর্গন্নান্তত্র গান্ধারঃ", সংগীতরত্নাকরের "প্রবর্ততে স্বর্গলোকে" প্রভৃতি উক্তি থেকে এর প্রচলন যে স্বর্গলোকে ছিল সেকথা বোঝা যায়, কিন্তু কবে ও কেন এর লোপ হোল তার কারণ জানা যায় না। কথিত আছে যে, গান্ধার গ্রামের আদি নাম ছিল নিষাদগ্রাম, কারণ এর আরম্ভিক স্বর নাকি

নিষাদ ছিল। কিন্তু গন্ধর্বগণ এর ব্যবহার করতেন বলে একে গান্ধর্বগ্রাম বলা হোত এবং কালক্রমে, অপভ্রংশরূপে 'গান্ধারগ্রাম' নামটির প্রচলন হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আসলে গান্ধার বাসীরা (বর্তমান কান্দাহার) এর ব্যবহার করতেন বলেই নাকি এই নামকরণ হয়েছিল।

গ্রাম যে আসলে সাতটি ছিল সেকথা নারদীশিক্ষা থেকে জানা যায়। প্রাচীন সাতটি গ্রাম যে প্রধান বা নিয়ামক রাগ হিসাবে প্রাচীন সংগীত সমাজে প্রচলিত ছিল সেকথা ৭ম শতাব্দীর কুড়ুমিয়ামালার প্রস্তর লিপিমালাও প্রমাণ করে। এই সাতটি প্রধান বা আশ্রয় গ্রামের নাম হোল। ১। ষড়্‌জ, ২। মধ্যম, ৩। পঞ্চম, ৪। ষড়ব, ৫। সাধারিত, ৬। কৈশিকমধ্যম ও ৭। কৈশিক। শেষোক্ত দুটিকে কেহ কেহ একই গ্রামরূপে গণ্য করে ছয়টি মাত্র গ্রাম স্বীকার করেন। শিক্ষাকার নারদও বলেছেন যে, ওই দুটি মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্ট, যখন মধ্যম ন্যাস হয় তখন কৈশিকমধ্যম এবং যখন পঞ্চম ন্যাস হয় তখন কৈশিকগ্রাম নামে পরিচিত হয়। অন্যান্য স্বর সমাবেশ ওই গ্রাম দুটিতে একই। অবশ্য প্রাচীন ভারতে ৭টি, ৬টি, ৫টি, ৩টি, ২টি প্রভৃতি বিভিন্ন অভিমত গ্রাম সম্পর্কে প্রচলিত, যে তর্কের কোন সুষ্ঠ মীমাংসা করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম তিনটি সম্বন্ধেই আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। অতঃপর এই গ্রামত্রয় সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় দেওয়া হোল।

গান্ধার গ্রাম সম্পর্কে মকবন্দকার নারদ বলেছেন যে, এর মহিমা অতুলনীয় এবং শাশ্বত। একে আশ্রয় করলে সাধক শিল্পী মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ এর স্বরবিন্যাস অনুশীলন বা আলাপ করলে অমরত্বলাভ করা যায়। এই কারণেই সম্ভবতঃ একে স্বর্গলোকের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। গান্ধার গ্রামের স্বরগুলি যথাক্রমে সা-৩য়, রে-৫ম, গ-৯ম, ম-১২শ, প-১৫শ, ধ-১৮শ এবং নি-২২শ শ্রুতিতে অবস্থিত।

ষড়্‌জ গ্রামের শ্রুতি বিভাজন সম্পর্কে ভরত বলেছেন :

> ষড়্‌জশ্চতুঃশ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃ শ্রুতিঃ স্মৃতঃ।
> দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ ॥
> চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিঃশ্রুতি ধৈবতস্তথা।
> দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়্‌জগ্রামে স্বরান্তরে ॥

অর্থাৎ ষড়্‌জ গ্রামের স্বরগুলি যথাক্রমে সা-৪র্থ, রে-৭ম, গ-৯ম, ম-১৩শ,

প-১৭শ, ধ-২০শ এবং নি-২২শ শ্রুতিতে অবস্থিত। এরপরে ভরত মধ্যমগ্রামের পরিচয়ে বলেছেন যে, ষড়্জগ্রামের পঞ্চমকে একশ্রুতি অপকৃষ্ট করলে মধ্যমগ্রাম উৎপন্ন হয়।

"মধ্যমগ্রামে তু শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্যঃ"। এর পরে স্বর স্থানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন :

> চতুঃশ্রুতি বিজ্ঞেয়ো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ পুনঃ।
> ত্রিশ্রুতির্ধৈবতস্তু স্যাচ্চঃতশ্রুতিক এব চ ॥
> নিষাদষড়্জৌ বিজ্ঞয়ৌ দ্বিচতুঃশ্রুতিসম্ভবৌ।
> ঋষভস্ত্রিঃশ্রুতিশ্চ স্যাৎ গান্ধারো দ্বিশ্রুতিস্তথা ॥

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামের স্বর স্থানগুলি (ষড়্জ থেকে আরম্ভ করলে) যথাক্রমে সা-৪র্থ, রে-৭ম, গ-৯ম, ম-১৩শ, প-১৬শ, ধ-২০শ এবং নি-২২শ শ্রুতিতে অবস্থিত। অতএব এই গ্রামত্রয়ের শ্রুতি বিভাজন এইরূপ—

১। ষড়্জগ্রাম = ৪—৩—২—৪—৪—৩—২

২। মধ্যমগ্রাম = ৪—৩—২—৪—৩—৪—২

৩। গান্ধারগ্রাম = ৩—২—৪—৩—৩—৩—৪

মনে রাখতে হবে যে, গ্রামগুলির স্বরসজ্জা ছিল অবরোহণ গতিতে, এবং স্বর সমূহের কম্পনসংখ্যায় তারতম্য থাকলেও স্বরসমাবেশ ছিল একই রকম। যেমন

১। ষড়্জগ্রাম—'সা নি ধ প ম গ রে' অথবা 'সা নি ধ প ম গ রে'

২। মধ্যমগ্রাম—ম গ রে সা নি ধ প অথবা ম গ রে সা নি ধ প

৩। গান্ধারগ্রাম—নি ধ প ম গ রে সা অথবা নি ধ প ম গ রে সা

বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'হারমনিয়ম' যন্ত্রে ষড়্জ পরিবর্তন করে, নিম্নোক্তরূপে এই গ্রামত্রয়ের কিছুটা আভাষ পাওয়া যেতে পারে। যেমন,

সা রে গ ম প ধ নি সা ষড়্জগ্রাম

ম প ধ নি সা রে গ ম মধ্যমগ্রাম

নি সা রে গ ম ধ নি গান্ধার গ্রাম

আধারগ্রাম (Ancient Basic Scale) হিসাবে মনে হয় ষড়্জগ্রামই

প্রাচীনতম এবং সামগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব অবশ্য কৈশিক-গ্রামকে শুদ্ধ গ্রাম (Standard Scale) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রামের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্ছ নাদেঃ সমাশ্রয়", অর্থাৎ গ্রাম সেই স্বরসমূহকে বলে যা মূর্ছনাদির আশ্রয়। পক্ষান্তরে, গ্রামের মৌলিক শ্রুতি ব্যবস্থা অনুসারে, কোন স্বর থেকে আরোহাবরোহণ করলে মূর্ছনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই ভিন্ন ভিন্ন আরোগবরোহণে যে বিভিন্ন প্রকার স্বরান্তরাল পাওয়া যাবে সেই স্বরান্তরালগুলি (শ্রুতি-ব্যবধান) গ্রামবিশেষের মৌলিক শ্রুতি ব্যবস্থানুযায়ী নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন্ মূর্ছনার স্বরান্তরাল কেমন হবে তা তার মূল স্বর সপ্তকের উপরে অবলম্বিত। কারণ সেই বিশেষ গ্রামের শ্রুতি ব্যবধান অনুসারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অতএব গ্রামত্রয়ের একুশটি মূর্ছনাতে, বিভিন্ন স্বরক্রমে স্বরণামের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে তা অসীম রহস্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রোয়জন, কারণ প্রাচীন সেই গ্রাম ও মূর্ছনাদির স্বরূপ প্রভৃতি নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে মধ্যযুগের শেষভাগে উত্তর ভারতে প্রচলিত শুদ্ধগ্রাম এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শুদ্ধগ্রাম নাকি সমশ্রেণীর ছিল, যার স্বরূপ বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের কাফী থাটের (রাগ) মতো ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

অতঃপর শ্রুতিনাম ও সংখ্যা সহযোগে গ্রামত্রয়ের স্বরস্থান নিম্নোক্ত তালিকায় দেওয়া হলো।

গ্রামচক্র

শ্রুতিসংখ্যা	শ্রুতিনাম	ষড়্জগ্রাম	মধ্যমগ্রাম	গান্ধারগ্রাম
১	তীব্রা			নিষাদ
২	কুমুদ্বতী			
৩	মন্দা			
৪	ছন্দোবতী	ষড়্জ	ষড়্জ	ষড়্জ
৫	দয়াবতী			
৬	রঞ্জনী			ঋষভ
৭	রক্তিকা	ঋষভ	ঋষভ	
৮	রৌদ্রী			

শ্রুতিসংখ্যা	শ্রুতিনাম	ষড়্জগ্রাম	মধ্যগ্রাম	গান্ধারগ্রাম
৯	ক্রোধা	গান্ধার	গান্ধার	
১০	বজ্রিকা			গান্ধার
১১	প্রসারিণী			
১২	প্রীতি			
১৩	মার্জনী	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম
১৪	ক্ষিতি			
১৫	রক্তা			
১৬	সন্দিপনী		পঞ্চম	পঞ্চম
১৭	আলাপনী	পঞ্চম		
১৮	মদন্তী			
১৯	রোহিনী			ধৈবত
২০	রম্যা	ধৈবত	ধৈবত	
২১	উগ্রা			
২২	ক্ষোভিনী	নিষাদ	নিষাদ	
১	তীব্রা			নিষাদ

মূর্ছনা

রামায়ণ আদিতে মূর্ছনার উল্লেখ থাকায় এর প্রচলন যে খৃষ্টীয় অব্দের বহুপূর্ব থেকেই ছিল সেকথা বোঝা যায়। শিক্ষকার নারদ 'স্বর মণ্ডলের' পরিচয়ে মূর্ছনার কথা বলেছেন এবং তিনটি গ্রাম তথা একুশটি মূর্ছনা স্বীকার করেছেন। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার মাত্র দুটি গ্রাম তথা চৌদ্দটি মূর্ছনা স্বীকার করেছেন। মূর্ছনার পরিচয়ে ভরত বলেছেন: "ক্রমযুক্তা স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনাস্তমিসংগিতাঃ", শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্" আর সংগীতদর্পণকার পণ্ডিত দামোদর বলেছেন:

ক্রমাৎস্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহনম্।
মূর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্তচ ॥

উক্ত ব্যাখ্যাগুলির তাৎপর্য হোল, ক্রমানুসারে সাতটি স্বরের আরোহাবরোহণ করলে মূর্ছনা হয় এবং গ্রামগুলির প্রতিটিতে সাতটি করে মূর্ছনা আছে।

মতঙ্গ শুদ্ধ ও বিকৃত বারোটি স্বরের মূর্ছনার কথাও বলেছেন। এছাড়া, ছয়টি, পাঁচটি প্রভৃতি স্বরযুক্ত মূর্ছনার কথাও অনেক বলেছেন। তবে মূলত তিনটি গ্রাম ও একুশটি মুর্ছনার নাম ও স্বরক্রম হোল এইরূপ।

ষড়্জগ্রামের মূর্ছনা ॥

১। উত্তরমন্দ্রা সা রে গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ রে সা
২। রজনী নি সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে সা নি
৩। উত্তরায়তা ধ নি সা রে গ ম প ধ প ম গ রে সা নি ধ
৪। শুদ্ধষড়্জী প ধ নি সা রে গ ম প ম গ রে সা নি ধ প
৫। মৎসরীকৃতা ম প ধ নি সা রে গ ম গ রে সা নি ধ প ম
৬। অশ্বক্রান্তা গ ম প ধ নি সা রে গ রে সা নি ধ প ম গ
৭। অভিরুদ্গতা রে গ ম প ধ নি সা রে সা নি ধ প ম গ রে

মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা ॥

১। সৌবিরী ম প ধ নি সা রে গ ম গ রে সা নি ধ প ম
২। হরিনাশ্বা গ ম প ধ নি সা রে গ রে সা নি ধ প ম গ
৩। কলোপনতা রে গ ম প ধ নি সা রে সা নি ধ প ম গ রে
৪। শুদ্ধমধ্যমা সা রে গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ রে সা
৫। মার্গী নি সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে সা নি
৬। পৌরবী ধ নি সা রে গ ম প ধ প ম গ রে সা নি ধ
৭। হৃষ্যকা প ধ নি সা রে গ ম প ম গ রে সা নি ধ প

গান্ধার গ্রামের মূর্ছনা॥

১। নন্দা নি সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে সা নি

২। বিশাখা ধ নি সা রে গ ম প ধ প ম গ রে সা নি ধ

৩। সুমুখী প ধ নি সা রে গ ম প ম গ রে সা নি ধ প

৪। বিচিত্রা ম প ধ নি সা রে গ ম গ রে সা নি ধ প ম

৫। রোহিনী গ ম প ধ নি সা রে গ রে সা নি ধ প ম গ

৬। সুখা রে গ ম প ধ নি সা রে সা নি ধ প ম গ রে

৭। আলাপা সা রে গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ রে সা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন এই মূর্ছনাগুলি শুধুমাত্র আরোহাবরোহনই ছিল না, বরং শ্রুতি-বিভেদ আদি নিয়ে এগুলি ছিল অসীম রহস্যপূর্ণ। বর্তমানে যমন অমুক রাগ, অমুক থাট থেকে উৎপন্ন বললে তার স্বররূপ সম্বন্ধে আমরা একটা মাটামুটি ধারণা করতে পারি, প্রাচীনকালে তেমনি গ্রাম ও মূর্ছনার সাহায্যে াগরূপ নির্দেশের ব্যবস্থা ছিল। শ্রুতি বিভেদের জটিলতা অতিক্রম করে উক্ত ূর্ছনাগুলির স্বররূপ নিরূপণ করা বর্তমানে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

মূর্ছনার রূপভেদ

মূর্ছনা শব্দটির সাংগীতিক সংজ্ঞা (Definition) কালভেদ অনুসারে কিছুটা ারিবর্তিত হয়েছে। কারণ প্রাচীনকালে মূর্ছনা রাগ-উৎপাদনের সহায়ক ছিল, া ক্রমানুসারে সাতটি, ছয়টি, পাঁচটি ইত্যাদি স্বর নিয়ে গঠিত হোত। মধ্যযুগেও ূর্ছনা, প্রাচীনকালের মতো কোন নিশ্চিত স্বর থেকে ক্রমানুসারে সাতটি স্বরের মারোহাবরোহণ বোঝাত কিন্তু ক্রমে অবরোহন লুপ্ত হয়। আধুনিককালের মূর্ছনা একেবারে ভিন্ন অর্থ বোধক হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমানে মূর্ছনার পরিভাষা হোল, কোন স্বর থেকে ঘর্ষণ বা কম্পনের সাহায্যে অন্য কোন স্বরোচ্চারণ করা।

স্থান / সপ্তক

মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান বা সপ্তক প্রাচীন কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্তই স্বীকৃত এবং প্রচলিত।

জাতি

জাতির মহত্ত্ব জানতে হলে, আগে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ বোঝা কর্তব্য। নান্যদেব বলেছেন যে, রস, ভাব, প্রকৃতি আদির বিশেষ প্রতিপত্তি জাতির সাহায্যেই বিকাশলাভ করে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে, যখন কোন স্বর-সম্ভার সন্নিবেশিত হয়ে মানব-চিত্ত-বিনোদন তথা অদৃশ্য অভ্যুদয় উৎপন্ন করে, তাকে জাতি বলে। (সংগীতের রস. ভাব ও অর্থ অনুসারে চিত্তে যে অদৃশ্য আনন্দ, বেদনা, পুলকাদির সঞ্চার হয়, তাকে অদৃশ্য অভ্যুদয় বলে)। মতঙ্গদেব বলেছেন যে, শ্রুতি, স্বর, গ্রহাদি নিয়ে যে স্বর-সম্ভার গঠিত ; অথবা যে স্বর-সম্ভারের লীলায়িত গতি ও বিকাশ রস প্রীতিত, উৎপন্ন বা আরম্ভ করে তাকে ; অথবা গান্ধর্ব বা দেশী রাগাদি যে মূল বা কারণ রাগ থেকে জন্মলাভ করেছে তাকে জাতি বলে ; অথবা মানব সাধারণের গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে জাতি বলে।

মতঙ্গ সকল প্রকার গান বা রাগের বীজ স্বরূপ জাতির উল্লেখ করেছেন। কারণ জাতি থেকেই গ্রামরাগ এবং গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষারাগ, অভিজাত দেশীরাগ প্রভৃতি সৃষ্টি। আসলে জাতি হোল ভারতীয় আদিম রাগ। মনে হয় প্রাচীন ভারতে রাগের সংজ্ঞা ছিল জাতি।

ভরত অন্যান্যদের মতো জাতির ব্যুৎপত্তিমূলক ব্যাখ্যা না করলেও এর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী সকল শাস্ত্রীরাই তা মোটামুটিভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন। এমন কি বর্তমান রাগ সংগীতেও যা অধিকাংশ প্রচলিত। সুতরাং ভরত প্রদত্ত পরিচয়ই অতঃপর আলোচিত হোল। জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য তিনি গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব এই দশটি লক্ষণ স্বীকার করেছেন।

গ্রহস্বর

জাতি সমূহের অংশ স্বরকেই গ্রহ বলে। আসলে যে স্বর থেকে সংগীতারম্ভ হয় ; অথবা সংগীত প্রবৃত্তির সুরুতেই যে স্বর প্রয়োগ করা হয় ; অথবা যে স্বর থেকে জাত্যাদির প্রয়োগ আরম্ভ হয় তাকে গ্রহস্বর বলে।

অংশ স্বর

রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত স্বরকে অংশ বলে। ভরত

দশটি বৈশিষ্ট্য সহযোগে এর ব্যাখ্যা করেছেন। যথা, যে স্বর রঞ্জকতাপূর্ণ হয়, বা যে স্বরের উপরে রাগের রঞ্জকতা অবলম্বিত ; রাগ, রঙ্গ বা রস উৎপাদনে যে স্বর মূখ্যত উপযোগী, বা যে স্বর স্বয়ং রাগ, রঙ্গ ও রস উৎপন্ন করে ; গান ক্রিয়াতে যে স্বরের সংবাদাত্মক প্রবৃত্তি মন্দ্র ও তার সপ্তকে পাঁচটি করে স্বর পর্যন্ত বিস্তার প্রাপ্ত হয় ; যে স্বর অন্য স্বরসমূহ দ্বারা বেষ্টিত বা আবৃত ; যার সঙ্গে সংবাদ ও অনুবাদ-কারক স্বরগুলিও বলবান ; গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাসাদির বারবার অভ্যাস করার সময়েও যে স্বর নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হয় তাকে অংশ স্বর বলে।

সংবাদ-বিবাদ-অনুবাদ প্রকরণে অংশ স্বর

ভরত সপ্তস্বরের নামোল্লেখের পরে স্বর সমূহকে চতুর্বিধ বলেছেন। যথা—বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী। এরা পরস্পর সম্বন্ধের দ্যোতক। কারণ সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য অন্তত দুটি স্বরের প্রয়োজন। একক স্বর কখনও বাদী, সংবাদী ইত্যাদির প্রতিনিধি হতে পারে না। সুতরাং স্বরের বাদী সংবাদাদি নিয়ত অন্তরাল সমূহের দ্যোতক হয়। অন্তরালের দুটি স্বরের মধ্যে যেটিকে আধার স্বীকার করে অপরটিকে সংবাদাদিরূপে স্থাপন করা হয় তাকে বাদীস্বর বলে। তাই ভরত বলেছেন : "যো যত্র অংশঃ স তস্য (তত্র ?) বাদী"। সুতরাং অংশ এবং বাদী অভিন্ন স্বর।

জাতির দশটি লক্ষণের মধ্যে অংশ অন্যতম এবং প্রধান স্বর হিসাবে স্বীকৃত। মতঙ্গ কতগুলি অলংকারের বর্ণনাকালে সেই অলংকারগুলির প্রত্যেকটির আরম্ভিক স্বরকেও অংশ স্বর বলে উল্লেখ করেছেন।

তার-মন্দ্র স্বর

অংশ স্বর প্রসঙ্গে তার ও মন্দ্র সপ্তকে ব্যাপ্তির মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি গানের ব্যাপ্তি ত্রিসপ্তকেই ছিল। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন তার ও মন্দ্র শব্দের উদ্দেশ্য হোল, মন্দ্র ও তার সপ্তকের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্বর সম্পর্কে ইঙ্গিত করা।

ন্যাস-অপন্যাস স্বর

গান ক্রিয়াকালে যে স্বরের উপরে বিশ্রাম লওয়া হয় তাকে ন্যাস এবং যে স্বরের উপরে গানক্রিয়া সমাপ্ত করা হয় তাকে অপন্যাস বলে।

অল্পত্ব-বহুত্ব

স্বর বিশেষের প্রয়োগ সম্পর্কে এই শব্দদ্বয় প্রযুক্ত। সেই হিসাবে এদের শাব্দিক অর্থই প্রায় স্পষ্ট। লংঘন বা অনভ্যাস এবং অলংঘন বা অভ্যাস এই দুই ভাবে অল্পত্ব ও বহুত্ব প্রদর্শিত হয়। সামান্যভাবে স্বরকে স্পর্শ করার নাম লংঘন এবং অনভ্যাস বলতে অনাবৃত্তি, অনুচ্চারণ বা দুর্বল প্রয়োগ বুঝায়। অর্থাৎ ষাড়বৌড়বিত রাগ ক্রিয়ার অন্তরমার্গে অনভ্যাস সহযোগে, অথবা কেদার হাম্বীর আদি রাগে কোমল নিষাদকে লংঘন সহযোগে অল্পত্ব দেওয়া হয়। এর বিপরীত ক্রিয়া সহযোগে, অর্থাৎ অলংঘন বা অভ্যাস সহযোগে বহুত্ব প্রদর্শিত হয়। কারণ বাদী, সমবাদী ছাড়াও যদি কোন স্বরের বহুত্ব প্রয়োজন হয় তখন সেই স্বরকে অভ্যাস ও অলংঘণ সহযোগে বহুত্ব দেওয়া হয়। যেমন ইমনের তীব্র-মধ্যম, হাম্বীর ও বাগেশ্রীর শুদ্ধ ধৈবত, পটদীপের শুদ্ধ নিষাদ ইত্যাদি।

ষাড়বত্ব-ঔড়বত্ব

সপ্তকের একটি স্বর বাদ দিলে ষাড়ব এবং দুটি স্বর বাদ দিলে ঔড়ব প্রকার হয়। সুতরাং কোন রাগের ছয়টি স্বরের নিয়ম রক্ষা করা হলে ষাড়বত্ব এবং পাঁচটি স্বরের নিময় রক্ষা করলে ঔড়বত্ব প্রদর্শন করা হয়।

সন্যাস-বিন্যাস স্বর

পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব ও অনুবর্তী শাস্ত্রী ব্যংকটমুখী সন্যাস ও বিন্যাস এই দুটি বিকল্প বা অধিক লক্ষণ স্বীকার করে বলেছেন যে, জাতিগান সামগান থেকে সৃষ্ট, তাই বৈদিক মন্ত্রের মতো পবিত্র, এগুলি যথাযথ রূপে না গাইলে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। এই স্বরদ্বয়ের পরিচয়ে বলেছেন যে, রাগের প্রথম ভাগ যে স্বরের উপরে সমাপ্ত হয় তাকে সন্যাস এবং বিভিন্ন পদের ছোট ছোট অংশগুলির অন্তিম স্বরকে বিন্যাস বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাগ বিশেষে গ্রহ, অংশ, ন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতি, কোন বিশেষ একটি মাত্র স্বরও হতে পারে।

শুদ্ধ জাতি

ভরত সাতটি স্বর নাম অনুসারে সাতটি শুদ্ধ জাতির পরিচয় দিয়েছেন। যথা-

১। ষড়্জী, ২। আর্ষভী, ৩। গান্ধারী, ৪। মধ্যমা, ৫। পঞ্চমী, ৬। ধৈবতী এবং ৭। নৈষাদী বা নিষাদবতী। এগুলির মধ্যে ষড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী ও নৈষাদী এই চারটি ষড়্জ গ্রামের এবং গান্ধারী, মধ্যমা ও পঞ্চমী এই তিনটি মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত। পূর্বোল্লিখিত লক্ষণগুলি ছাড়াও ভরত শুদ্ধ জাতি সম্পর্কে তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন,

১। অন্যূন স্বরাঃ = অর্থাৎ পূর্ণত্ব রক্ষা করা (আরোহাবরোহনে সাতটি স্বরযুক্ত হবে)।

২। স্বস্বরাংশ গ্রহন্যাসা = অর্থাৎ যে স্বরের নামানুসারে জাতির নামকরণ হয়েছে, সেই স্বরটিই তার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস হবে।

৩। ন্যাসবিধাবল্যাসাং মন্দ্রো নিয়মাৎ ভবতি শুদ্ধা = অর্থাৎ শুদ্ধ জাতিগুলিতে ন্যাস স্বর মন্দ্রেই হওয়া কর্তব্য।

এখানে মন্দ্র অর্থ যে স্বরের উপরে মন্দ্র সপ্তক পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ মধ্যষড়্জ বোঝায়, মন্দ্রস্থান নয়। এই বিধি আজও প্রচলিত আছে। কারণ যাবতীয় রাগে (অপ্রচলিত দু'একটি ছাড়া) এখনও ষড়্জের উপরেই পূর্ণন্যাস করা হয়। অর্থাৎ তান, আলাপ প্রভৃতির সমাপ্তি মধ্য-ষড়জের উপরেই হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, সাধারণ কথোপকথনেও আমরা মধ্যস্থানেই বিশ্রাম নিয়ে থাকি।

সাতটি জাতির ন্যাস স্বর হোল প্রত্যেকটির নাম-স্বর। বর্তমানে কোন রাগে একটির বেশী বাদীস্বর (অংশ) স্বীকৃত নয়, কিন্তু ভরত একটি জাতিতে তিনটিরও বেশী অংশ তথা গ্রহ স্বর এবং অন্তত দুটি করে অপন্যাস স্বর থাকতে পারে বলেছেন।

ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামে মোট ১৪টি মূর্ছনা আছে এবং সেগুলিতে গ্রহ, অংশাদি সহযোগে জাতির প্রকারভেদ বলে প্রচার করা যেত, কিন্তু ভরত শুধু সাতটি মাত্র মূর্ছনা কেন স্বীকার করলেন ? এর প্রকৃত কারণ মনে হয় ব্যংকট মুখীর ৭২ থাট রচনা এবং তার থেকে মাত্র ১৯টি গ্রহণ করার মতো। কেননা আমরা জানি যে, গ্রামদ্বয়ের স্বর ব্যবস্থাতে পার্থক্য হোল ষড়্জ গ্রামে ম প = চার শ্রুতি তথা প ধ = তিন শ্রুতি এবং মধ্যমগ্রামে ম প = তিন শ্রুতি তথা প ধ = চারশ্রুতি। গ্রামদ্বয়কে বীণাতে স্থাপন করলে এই সূক্ষ্ম প্রভেদ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ স্থূলরূপে গ্রামদ্বয়ের মূর্ছনাগুলিতে প্রায় সমান অন্তরালযুক্ত স্বরাবলীই পাওয়া যায়। সুতরাং পাছে কোন সপ্তকের পুনরাবৃত্তি হয়, তাই তিনি মাত্র সাতটি মূর্ছনাই নির্বাচন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মতঙ্গ জাতিকে সংগীতের বীজ স্বরূপ মনে করলেও, মনে হয়, জাতির বিকাশ পরবর্তীকালে হয়েছিল।

বিকৃত জাতি

ভরত মোট সাতটি শুদ্ধ এবং এগারোটি বিকৃত জাতির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় ভরতপূর্ব সমাজে বিকৃত জাতির প্রচলন ছিল না। খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় সম্ভবত এগুলির সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। ভরত দুটি উপায়ে বিকৃত জাতি উৎপন্ন করার কথা বলেছেন। যেমন,

১। পূর্ণত্ব রক্ষা না করা, অর্থাৎ ষড়ব বা ঔড়ব প্রকার রীতি রক্ষা করা।

২। যে স্বরের নামানুসারে শুদ্ধ জাতির নামকরণ হয়েছে সেই স্বরটিকে গ্রহ, অংশ, অপন্যাস ইত্যাদিরূপে অস্বীকার করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যদিও ন্যাস স্বরকে ভরত অপরিবর্তনশীল বলেছেন কিন্তু 'বিভিন্ন প্রকরণে অংশ' স্বরের মতো তিনি ন্যাসকেও দুটি অর্থে প্রয়োগ করেছেন; যেমন,

১। জাতি বিশেষের স্বরান্তরালের নিয়ামক রূপে, এবং

২। বিরাম, বিশ্রাম বা মোকাম রূপে।

১। জাতি বিশেষের স্বররূপের নিয়ামকত্ব প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন যে, শুদ্ধ জাতিতে তার ন্যাস-ই গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি হয়ে থাকে। এই নিয়ম থেকে ন্যাসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য লক্ষণের একটি, দুটি বা তার বেশী নিয়মের ভঙ্গ করলে বিকৃত জাতি উৎপন্ন হয়।

এখানে মনে হতে পারে যে, ন্যাস, গ্রহ, অংশ প্রভৃতি তো জাতি বিশেষে অভিন্নই হয়ে থাকে, তবে গ্রহ, অংশাদিও নিয়ামকত্বলাভ করবে না কেন? কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, জাতিগুলিতে গ্রহ, অংশাদি একাধিক হয়ে থাকে, অর্থাৎ এগুলি পরিবর্তনশীল। তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রহ, অংশ প্রভৃতি থেকে মূর্ছনা রচনা করতে গেলে, কোনটির সঠিক রূপ নিরূপণ করা সম্ভব হবে না, বরং জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই এইভাবে এদের নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে।

২। শুদ্ধ জাতিতে ন্যাস-বিধি অনুসারে ন্যাস সর্বদা মন্দ্রে হয়, কিন্তু বিকৃত জাতিতে তেমন নিয়ম নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি, ন্যাস কেমনভাবে অপরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনশীল হতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন। ন্যাসের এই ভিন্ন অর্থ হোল বিরামের (স্থায়িত্ব) প্রভৃতি।

আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিষয়টি বুঝতে হলে, তিনি ন্যাস শব্দের যে বিভিন্ন অর্থের বর্ণনা করেছেন

তা জানতে হবে। আমরা জানি যে, গ্রহ প্রবর্তক স্বর, অংশ প্রধান স্বর এবং ন্যাস নিয়ামক তথা সমাপ্তি স্বর। শুদ্ধ জাতিতে তো গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি একটি স্বরই হয়ে থাকে। সুতরাং উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি একই স্বরে অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু বিকৃত জাতিতে নাম-স্বর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ অংশাদি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু নিয়ামক হিসাবে ন্যাস অপরিবর্তিতই থাকে। তবে বিরামাদি রূপে তার পরিবর্তনও হতে পারে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্র স্থাপনের জন্যই সম্ভবত তিনি শুদ্ধ জাতিতেও একের অধিক গ্রহ, অংশাদির উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক জাতির ন্যাস তার গ্রহ অংশাদিরই একটি, তাই তিনি আবার বলেছেন যে, সমাপ্তিতে প্রযুক্ত স্বরকে অংশবলে।

জাতির দশটি লক্ষণ ছাড়াও ভরত রাগ বিকাশের জন্য পূর্ণ, প্রসন্ন, মধুর, শ্লক্ষ, সম, বক্ত, বিকৃষ্ট, সুকুমার, অলংকৃত ও ব্যক্ত এই দশটি গুণের কথা বলেছেন। এই সকল গুণ যুক্ত না হলে রাগ পরিপূর্ণ আবেগের সৃষ্টি করতে পারে না। বস্তুতঃ এই লাবণ্যগুণগুলি শুধু সংগীতেই নয়, সকল প্রকার শিল্পেই এর অধিকাংশ থাকা প্রয়োজন। তা না হলে জীবসাধারণের তা চিত্তাকর্ষক হতে পারে না। ভরত উল্লিখিত এই সকল গুণাবলীর পরিচয় পরবর্তী সকল শাস্ত্রীরাই মোটামুটিভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন।

নিম্নোক্ত তালিকায় বিকৃত এগারোটি জাতির নাম, কোন্ গ্রামের অন্তর্গত এবং কোন্ শুদ্ধ জাতির মিশ্রণে (সংসর্গে) সৃষ্ট তার পরিচয় দেওয়া হোল—

সংখ্যা	বিকৃত জাতি	গ্রাম	মিশ্রণ	ন্যাস
১	ষড়্জ মধ্যমা	ষড়্জ	ষড়্জী + মধ্যমা	সা, ম
২	ষড়্জকৈশিকী	ষড়্জ	ষড়্জী + গান্ধারী	গ
৩	ষড়্জোদীচ্যবা	ষড়্জ	ষড়্জী + গান্ধারী + ধৈবতী	ম
৪	কৈশিকী	মধ্যম	ষড়্জী + গান্ধারী + মধ্যমা + পঞ্চমী + নৈষাদী	গ, নি
৫	কর্মারবি	মধ্যম	নৈষাদী + আর্ষভী + পঞ্চমী	প
৬	আন্ধ্রী	মধ্যম	গান্ধারী + ষড়্জী	গ
৭	রক্ত গান্ধারী	মধ্যম	গান্ধারী + পঞ্চমী + নৈষাদী + মধ্যমা	গ
৮	মধ্যমোদীচ্যবা	মধ্যম	গান্ধারী + পঞ্চমী + ধৈবতী + মধ্যমা	ম
৯	গান্ধার পঞ্চমী	মধ্যম	গান্ধারী + পঞ্চমী	গ
১০	গান্ধারোদীচ্যবা	মধ্যম	ষড়্জী + গান্ধারী + ধৈবতী + মধ্যমা	ম
১১	নন্দয়ন্তী	মধ্যম	গান্ধারী + পঞ্চমী + আর্ষভী	গ

উপরোক্ত তালিকায় ন্যাস স্বর ছাড়া অন্যান্য পরিচয় দেওয়া হোল না। (শুদ্ধ জাতির তালিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন রাগ প্রসঙ্গ

মানব হৃদয়ের অবস্থা বিশেষকে রাগ বলে। রাগ অর্থ রক্তবর্ণ, রঞ্জক দ্রব্য, ক্রোধ প্রভৃতি। সংগীতশাস্ত্রে রাগ বলতে চিত্তরঞ্জক স্বর, সুর বা স্বরবিন্যাসবিশেষ বোঝায়। রাগ প্রাণীমাত্রেরই চিত্তকে রঞ্জিত তথা আকৃষ্ট করে। এই রঞ্জনাশক্তি আরো প্রাণময়ী হয়, যদি স্বরের সঙ্গে পদ বা সাহিত্য যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় গীতরীতির মধ্যেই রাগ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত।

প্রাচীন বা মধ্যযুগে রাগ-ব্যবস্থা বা রাগ-রূপ বৈচিত্র্য কেমন ছিল তার সঠিক রূপ নিরূপণ করা আজ কঠিন। কারণ তৎকালীন সংগীতজ্ঞদের নানাবিধ সংস্কার এবং সুষ্ঠু সংগীতলিপির অভাবে, সাধারণত শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংগীত প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শিষ্যপরম্পরায় প্রবাহিত সেই সংগীতধারাই বর্তমান রাগ-সংগীতে বিরাজমান, কিন্তু বর্তমান সংগীত যে তার যথেষ্ট ক্রমবিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। সুতরাং প্রাচীন রাগ-রাগিণীর রূপ আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আক্ষরিক ব্যাখ্যায় যতটা জানা যায় তার সামান্য পরিচয় এই পরিচ্ছদে দেওয়া হোল।

মতঙ্গ বলেছেন যে, গ্রাম থেকে জাতি, জাতি থেকে গ্রামরাগ, গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষা থেকে বিভাষারাগ, বিভাষা থেকে অন্তর ভাষারাগ প্রভৃতির সৃষ্টি। তিনি প্রাচীন সংগীতাচার্য যাষ্টিকের উক্তি উল্লেখ করে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়া, বেসরা ও সাধারণী এই পাঁচ প্রকার গ্রামরাগ স্বীকার করে এগুলিকে গান্ধর্ব শ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী শাস্ত্রীরাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে পরবর্তী শাস্ত্রীরাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে শার্ঙ্গদেবের রাগ-পরিচয় অনেক বিস্তৃত। তিনি পূর্বাচার্যদের মতো দশটি করে গুণ ও লক্ষণ স্বীকার করে মতঙ্গের মতো পাঁচটি গ্রামরাগ এবং যাষ্টিক উল্লিখিত পনেরটি জনকরাগ সহ বহু বিচিত্র রাগ-পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাগগুলিকে গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর ভাষা, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ এই দশ শ্রেণীতে বর্গীকরণ করেছেন। এগুলির অন্তর্গত ৩০টি গ্রামরাগ, ৮টি উপরাগ, ২০টি রাগ, ৯৬টি ভাষা-রাগ, ২০টি বিভাষারাগ, ৪টি অন্তরভাষারাগ, ৮টি রাগাঙ্গ, ১১টি ভাষাঙ্গ, ১২টি

ক্রিয়াঙ্গ ও ৩টি উপাঙ্গ তথা সমসাময়িক আরো ১৩টি রাগ, ৯টি ভাষাঙ্গ, ৩টি ক্রিয়াঙ্গ ও ২৭টি উপাঙ্গ মোট ২৬৪টি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় আন্ধ্রী, দ্রাবিড় প্রভৃতি আঞ্চলিক দেশী রাগের সঙ্গে শকঃ, শকতিলক, বোট্ট, তুরস্কতোড়ী, তুরস্কগৌড় প্রভৃতি বিদেশী রাগের তুলনাত্মক পর্যালোচনা করেছেন।

পরবর্তী ব্যংকটমুখী প্রমুখ শাস্ত্রীরা শার্ঙ্গদেবাদির অনুবর্তী ছিলেন। তিনিও উক্ত দশ শ্রেণীর রাগ বর্গীকরণ স্বীকার করে বলেছেন যে এগুলির প্রথম ছয়টি গান্ধর্ব সংগীতের ও অবশিষ্ট চারটি দেশী সংগীতের জন্য নিশ্চিত ছিল।

গ্রামরাগ

শার্ঙ্গদেব পাঁচ প্রকার মূল গ্রামরাগের পরিচয় দিয়েছেন—

১। শুদ্ধা—সরল ও সুমধুর স্বরযুক্ত গীতি।

২। ভিন্না—দ্রুত উচ্চারিত সূক্ষ্মস্বর ও গমকযুক্ত গীতি।

৩। গৌড়া—গম্ভীর, ত্রিসপ্তকে গমকযুক্ত অখণ্ড গীতি।

৪। বেসরা—অত্যধিক বেগযুক্ত স্বরবিন্যাস নিয়ে রচিত গীতি।

৫। সাধারণী (সাধারিতা)—উপরোক্ত চার শ্রেণীর মিশ্রণে রচিত এবং হ'কার ও উ'কার যোগে গেয় গীতি।

মধ্যযুগের ধ্রুপদগানে যে চারটি বাণীর প্রচলন ছিল তা উক্ত শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি গীতরীতি থেকেই উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করেন।

শার্ঙ্গদেব এই পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত তিরিশটি গ্রামাগেরও পরিচয় ছিয়েছেন, যার নামগুলি হোল এইরূপ—

শুদ্ধা—ষড়্‌জ, শুদ্ধকৌশিক, মধ্যম, শুদ্ধমধ্যম, কৈশিকমধ্যম, শুদ্ধসাধারি ও শুদ্ধষাড়্‌ব।

ভিন্না—ভিন্নষড়জ, ভিন্নপঞ্চম, ভিন্নকৈশিক, ভিন্নতান ও ভিন্নকৈশিকমধ্যম।

গৌড়া—গৌড়কৈশিক, গৌড়পঞ্চম ও গৌড়কৈশিকমধ্যম।

বেসরা—সৌবিরী, টক্ক, বোট্ট (ভোট্ট বা ভুটানের দেশীয় সুর), মালবকৈশিক, টক্ককৈশিক, হিন্দোল, মালবপঞ্চম ও বেসর ষাড়ব।

সাধারণী—রূপমাধার, শকঃ (শিথীয়ানদের জাতীয় সুর), ভংভানপঞ্চম, নর্তন, গান্ধারপঞ্চম, ষড়্‌জকৈশিক ও কুকুভ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গ্রামরাগ গীতি এবং মাগধী প্রভৃতি সমপর্য্যায় ভুক্ত নয়। কারণ গ্রামরাগ হোল স্বরাশ্রিত কিন্তু মাগধী প্রভৃতি পদ ও তালাশ্রিত।

উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতির সৃষ্টি গ্রামরাগ থেকেই হয়েছে। মতঙ্গ এই প্রসঙ্গে ৭০টি ভাষারাগ, ১২টি বিভাষারাগ এবং বহু প্রাচীন ও দেশজ রাগের নামোল্লেখ করেছেন এবং পরিচয়ও দিয়েছেন। তবে এগুলির পরিচয় তেমন স্পষ্ট নয়। যেমন ভাষারাগের পরিচয়ে বলেছেন : "ভাষাণাং গ্রামরাগালাপপ্রকারাণাম্" অর্থাৎ গ্রামরাগের আলাপের এক প্রকারভেদকে ভাষারাগ বলে। এই ধরণের সূত্রের সাহায্যে এগুলির মর্মোদ্ধার করা তৎকালীন গুণীর পক্ষে সম্ভব হলেও বর্তমানে আর সম্ভব নয়।

অবশিষ্ট রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ সম্পর্কে ভাতখণ্ডেজী নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যা তিনি দক্ষিণ ভারতীয় এক সংগীতজ্ঞের কাছে জেনেছিলেন।

রাগাঙ্গ

যে গীতিরীতি গ্রামরাগের ছায়া অবলম্বনে রচিত এবং শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে গাওয়া হোত তাকে রাগাঙ্গ বলা হোত।

ভাষাঙ্গ

যে গীত আঞ্চলিক ভাষা ও গীতরীতি অনুসারে এবং ভাষারাগের ছায়া অবলম্বনে রচিত, কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়ম যাতে রক্ষা করা হোত না তার নাম ছিল ভাষাঙ্গ।

ক্রিয়াঙ্গ

শিল্পী আপন স্বকীয়তায় যখন কোন রাগে বিবাদীস্বর প্রয়োগ করে বৈচিত্র সৃষ্টি করতো, তাকে বলা হোত ক্রিয়াঙ্গ। পণ্ডিত দামোদর বলেছেন: যে গানে ইন্দ্রিয় শিথিলতামুক্ত হয় সেই গীতরীতি হোল ক্রিয়াঙ্গ।

উপাঙ্গ

ক্রিয়াঙ্গের মতোই সাধনলব্ধ ক্ষমতায় কোন গীতরীতিকে কিছুটা অদল-বদল করে গাওয়াকে উপাঙ্গ বলা হোত। অর্থাৎ কোন রাগের নিয়মিত স্বরসমূহের

দু'একটি স্বর পরিবর্তন করেও সেই রাগ-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গাওয়াকে উপাঙ্গ বলা হোত।

রাগ-রাগিনীর পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতের সংগীতাচার্যেরা কল্পনার উপাসক ছিলেন। তাঁরা কল্পনাবলে রাগ-রাগিনীর এক সুবৃহৎ পরিবার সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় সংগীতোৎপত্তির প্রধান উৎস হোল বিশ্বপ্রকৃতির বন্দনা। যার জন্য তাঁরা স্ত্রী, পুরুষ এমনকি নপুংষক রূপেও রাগ সংগীতের কল্পনা করেছেন। যে সকল সংগীতাচার্যদের বিধিবিধান এবং অনুশাসনাদি থেকে ভাতরীয় রাগ সংগীতের বিকাশ তার মধ্যে ব্রহ্মা, ভরত, হনুমান, সোমেশ্বর, কল্লিনাথ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই রাগ, রাগিনী, (পুত্ররাগ, পুত্রবধুরাগ) প্রভৃতি স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন সংগীতে, চারটি মুখ্য পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যেমনঃ ১। শিব বা ব্রহ্মার মত, ২। ভরত মত, ৩। হনুমন্মত ও ৪। কল্লিনাথ মত। এই চারটি মতে রাগ সংখ্যা সমান কিন্তু রাগিনী সংখ্যায় পার্থক্য আছে। ব্রহ্মা ও কল্লিনাথ-মতে প্রত্যেক রাগের ছয়টি করে রাগিনী এবং ভরত ও হনুমন্মতে প্রত্যেক রাগের পাঁচটি করে রাগিনী। যেমন:

১। ব্রহ্মা মতের ছয়টি রাগ এবং তাদের প্রত্যেকটির ছয়টি করে রাগিনী :—

শ্রীরাগ—মালবী, ত্রিবেণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়িকা।

বসন্ত—দেশী, দেবগিরী, বরাটি, তোড়ী, ললিতা ও হিন্দোলী।

পঞ্চম—বিভাষা, ভূপালী, বর্ণাটি, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

মেঘ—মল্লারী, সৌরবী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারা।

ভৈরব—ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, সৈন্ধবী ও বঙ্গালী।

নটনারায়ণ—কামোদী, আভিরী, নাটিকা, কল্যাণী, সারঙ্গী ও নটহম্বীরা।

২। ভরত মতের ছয়টি রাগ এবং তাদের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে রাগিনী :—

ভৈরব—ভৈরবী, ললিতা, বরারী, বহুলী ও মধুমাধবী।

মালকৌস—গুর্জরী বিদ্যাবতী, তোড়ী, খম্বাবতী ও কুকভ।

হিন্দোল—রামকলি, মালবী, আশাবরী, দেবারী ও কেকী।

দীপক—কেদারী, গৌড়া, রুদ্রাবতী, কামোদ ও গুর্জরী।

শ্রীরাগ—সৈন্ধবী, কাফী, ঠুমরী, বিচিত্রা ও সোহনী।

মেঘরাগ—মল্লারী, সারঙ্গা, দেশী, রতিবল্লভা ও কানড়া।

৩। কল্লিনাথ মতের ছয়টি রাগ এবং তাদের প্রত্যেকটির ছয়টি করে রাগিনী :—

শ্রীরাগ—গৌরী, কোলাহল, ধবলা, বরোরাজী, মালকৌস ও দেবগান্ধার।

পঞ্চম—ত্রিবেনী, হস্তস্তরেতহা, অহিরী, কোকভা, বরারী ও আশাবরী।

ভৈরব—ভৈরবী, গুর্জরী, বেলাবলী, বিহাগ, কর্ণাট ও কানড়া।

মেঘ—বঙালী, মধুরা, কামোদী, ধনাশ্রী, দেবতির্থী ও দিবালী।

নটনারায়ণ—ত্রিবংকী, তিলংগী, পূর্বী, গান্ধারী, রামা ও সিন্ধমল্লার।

বসন্ত—অন্ধালী, গুণকলি, পটমঞ্জরী, গৌড়গিরী, ধাংকি ও দেবসাগ।

৪। হনুমন্মতের ছয়টি রাগ এবং তাদের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে রাগিনী :—

ভৈরব—ভৈরবী, বঙালী, বরাটি, মধ্যমাদি ও সৈন্ধবী।

মালবকৌশিক—তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী ও কুকুভা।

হিন্দোল—রামকলি, বেলাবলী, দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা।

দীপক—দেশী, কামোদী, কেদারী, কানাড়া ও নাটিকা।

শ্রীরাগ—বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাশ্রী ও আশাবরী।

মেঘ—মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জরী ও টংকী।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে এই রাগ-রাগিনীর নামগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই রাগরাগিনীর নামধারী বর্তমানে প্রচলিত রাগ সমূহের মধ্যে পরস্পর কতটুকু সাদৃশ্য আছে, কি নেই তা নিরূপণ করা আজ আর সম্ভব নয়।

বর্ণ

বর্ণের পরিচয়ে অভিনব মঞ্জরীকার বিষ্ণু শর্মা বলেছেন :

গান ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥

অর্থাৎ গানের ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। বর্ণ চার প্রকার। যথা—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী বর্ণ।

স্থায়ীবর্ণ

স্থায়ীবর্ণ সাধারণত মন্দ্রসপ্তক এবং মধ্যসপ্তকের পূর্বঅঙ্গের মধ্যবর্তী স্বরসমূহ-সহযোগে রচিত হয়। স্থায়ী বর্ণের উচ্চারণ সা…, রে…, ম… ইত্যাদি রূপে ধীরে ধীরে করা হয়।

আরোহী বর্ণ

মধ্যষড়জ থেকে ধীরে ধীরে ক্রমানুসারে তারষড়্জের দিকে যাওয়াকে আরোহী বর্ণ বলা হয়।

অবরোহী বর্ণ

আরোহীবর্ণের বিপরীত ক্রিয়াকে অবরোহীবর্ণ বলা হয়।

সঞ্চারী বর্ণ

স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এই বর্ণত্রয়ের সংমিশ্রণে সঞ্চারীবর্ণ গঠিত হয়।

পরবর্তীকালে এবং বর্তমান সংগীতে, এগুলি কিঞ্চিৎ বিবর্তিত রূপে (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ বা ভনিতা প্রভৃতি নামে) প্রচলিত হয়েছে।

ঋতু অনুযায়ী রাগ গায়ন রীতি

পূর্বোল্লিখিত হনুমন্মতের ছয়টি রাগ প্রাচীন কালে ছয়টি বিশেষ ঋতুতে গাওয়ার প্রথা ছিল। যেমন,

গ্রীষ্মে—দীপক   হেমন্তে—মালকৌস
বর্ষায়—মেঘ   শীতে—শ্রীরাগ
শরতে—ভৈরব   বসন্তে—হিন্দোল

এই প্রথা শুধুমাত্র কবিত্ব বা কল্পনা প্রসূত, না এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, সেটা গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যে বিশেষ বিশেষ রাগ অত্যন্ত মনোরঞ্জক হয় সে বিষয়ে মনে হয় সকলেই একমত।

সামগান

সাম বলতে সামবেদ বোঝায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহের গেয়রূপকে সামবেদ বলে।

কেহ বলেন সাম্য বা সমতা থেকে সাম শব্দের উৎপত্তি। কারণ বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা করে গান করার নাম সাম। আবার কারো মতে তখন শুধু ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম দুটিতেই গান করা হোত এবং এদুটির আদি অক্ষর 'সা+ম' থেকেই সাম শব্দের উৎপত্তি।

বৈদিক যুগে গান মাত্রই ছিল সামগান। অবশ্য শাখাবহুল বেদের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন গায়ন-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য-গুলিতে গাথা, গান, স্তোম, স্তোভ প্রভৃতি গীতরীতির উল্লেখ আছে। এগুলি সামগানেরই অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদে সামগানের সাতরকম গায়কীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে রথন্তর, বৃহদসাম প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন ছিল। এই সকল গায়ন রীতির পার্থক্য একটি থেকে সাতটি পর্যন্ত স্বরযুক্ত এবং অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী, বিরাট প্রভৃতি ছন্দে বেদপাঠ থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। কারণ শ্রী ও যশকামী, পশুকামী, বীর্যকামী প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানকারীরা বেদ-পাঠ করতেন। শস্ত্র ও সামের পাঁচটি অঙ্গ কল্পিত ছিল। যেমন,

	শস্ত্র		সাম	
(১)	আহার	···	হিংকার	সকলে উচ্চারণ করতেন।
(২)	প্রথম ঋক্	···	প্রস্তাব	প্রস্তোতা গান করতেন।
(৩)	মধ্যম ঋক্	···	উদ্‌গীথ	উদ্‌গাতা গান করতেন।
(৪)	অন্তিম ঋক্	···	প্রতিহার	প্রতিহর্তা গান করতেন।
(৫)	বষট্‌কার	···	নিধন	তিনজনে মিলেগান করতেন।

উপনিষদে সামগানের পরিচয় হোল, যে উদ্‌গাতা যজ্ঞে সামগান আরম্ভ করতেন তাঁকে 'প্রস্তোতা' এবং তাঁর গানকে প্রস্তাব বলা হোত। যে গানে স্তুতি থাকতো তার নাম ছিল 'উদ্‌গীথ'। স্তুতিবাদে মন্ত্ররূপ দেবতার আবির্ভাব হোত। প্রতিহর্তার গানে দেবতার প্রস্থান বা তিরোভাব হোত। নিধন দ্বারা প্রয়ানকারী দেবতাকে তাঁর দিব্য লোকে প্রতিষ্ঠিত করা হোত। সে সময়ে পাঁচজন উদ্‌গাতা সমবেতভাবে গান করতেন। প্রস্তাব ও উদ্‌গীথ এ'দুটির মধ্যে প্রণব বা ওঙ্কার এবং প্রতিহার ও নিধনের মধ্যে উপদ্রব প্রভৃতি বিভাগও ছিল। প্রণব গান করে দেবতাদের আহ্বান এবং উপদ্রব দ্বারা তাঁদের বিসর্জন দেওয়া হোত। সামগানের বর্ণে বিশ্লেষণ, বিকার, বিরাম, অভ্যাস, লোপ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এই

শব্দগুলিকে স্তোভ বলা হোত। বর্ণগুলির উচ্চারণ সোজাসুজি বা বিপরীতভাবে করার রীতি ছিল। যেমন, "অগ্ন আয়াহী", এর উচ্চারণ হোত 'ওগ্নায়ি'। আবার বিশ্লেষণ, বিরাম আদি বর্ণোচ্চারণেও নানা পার্থক্য সৃষ্টি করা হোত। এই রীতি বেয়গান, গেয়গান, যোনিগান প্রভৃতিতেও প্রযুক্ত ছিল। ভরত এই স্তোভ গানের অনুকরণে নাটকের জন্য বহির্গীতির প্রচলন করেছিলেন। সামগানের পাঁচটি অঙ্গকে মহারাজ নান্যদেব শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী নামে গান্ধর্বগানের পাঁচটি অঙ্গ এবং এই পাঁচটি অঙ্গকে পাঁচটি রাগগীতি বলে বর্ণনা করেছেন।

সামগানের পাঁচরকম উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, ১। কথা ও সুরের উপরে জোর দেওয়া, ২। দুটি উচ্চারণ রীতির ব্যবধান নির্ণয় করা ও তাদের পছন্দমতো সাজানো, ৩। স্বর প্রয়োগের উচ্চতা ও দীর্ঘতা, ৪। কথা ও স্বরের সৌষ্টব বৃদ্ধি করা এবং ৫। বিভিন্ন উচ্চতার মাঝে পারস্পরিক পরিমাপ নির্ণয় করা। অর্থাৎ স্বর স্থান, ছন্দ, রস প্রভৃতি নিয়ে সামগান ছিল সুসংগত ও নিয়মানুগ। বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন গানের উদ্ভব হয়েছিল এবং গোড়ার দিকে না হলেও পরে তাতে স্বরমণ্ডলের সমাবেশ হয়।

সামবেদের সংগ্রহ গ্রন্থাদিকে সাম-সংহিতা বলা হোত। পতঞ্জলির বর্ণনানুসারে, সামবেদের একহাজার শাখা ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু সাম-সংহিতা মাত্র একখানাই প্রাপ্ত যাতে ৮১০টি শ্লোক আছে। সম্ভবত বৌদ্ধ যুগের পরে সামগানের মুখ্য ঋত্বিকদের সঙ্গে উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা প্রভৃতি এবং বীণা, বান, বংশী আদি সহযোগে সামগানের সহযোগী শিল্পীদের পরম্পরা ক্রমে লোপ পাওয়ায় পরবর্তীকালে সামগানের স্থানটি সামপাঠ অধিকার করেছে। অতএব বর্তমানে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে যে সামপাঠ শোনা যায়, তার সঙ্গে প্রাচীন সামগানের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল, এমন কথা মনে করা সঙ্গত নয়।

স্তোভ

স্তোভ বলতে ঋক্‌ বা সামবেদ পাঠের বর্ণদীর্ঘত্ব বোঝায়। স্তোভাক্ষরগুলি ছিল ঔ হো বা; ইয়; ইহ; হুয়ে; য়ে দেব; অহা ব; প্রভৃতি। বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন, নয় রকম বাক্যস্তোভ, পনেরো রকম পদস্তোভ ইত্যাদি। স্তোভ গান প্রথমাদি স্বর সহযোগে করা হোত।

গাথা

গাথা হোল নিবদ্ধ গান। বিহিত মন্ত্রবিশেষ, কল্যাণ বা আশীর্বাদবাচক স্তুতি, দেবতা ও ধার্মিক নৃপতিদের শৌর্য-বীর্য বিষয়ক স্তুতি প্রভৃতিকে গাথা বলা হোত। মহাভারতে দিব্যগান ও দিব্যগাথা পৃথকভাবে বর্ণিত তথা দিব্যগানকে গাথারূপ ব্রহ্মগীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গীত ব্রহ্মগীতি

ভরত গীতের পরিচয়ে বলেছেন যে, বিবিধ বর্ণদ্বারা অলংকৃত, পদ ও লয় সমন্বিত যে গান ক্রিয়া তার নাম গীত। আবার নানাবিধ গীতের পরিচয়ে তিনি গ্রামরাগ-গীতি, মাগধী, ব্রহ্মগীতি প্রভৃতি বহু বিচিত্র গীতের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ব্রহ্মগীতি হিসাবে ঋক্, সাম, পাণিকা প্রভৃতি পদগীতির উল্লেখ করে এগুলিকে নানা ছন্দযুক্ত ধ্রুবাগীতি আখ্যা দিয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক অপরান্তক, ও বেমক, গাথা, সাম প্রভৃতিকে এবং শার্ঙ্গদেব বর্ণ ও অলংকারযুক্ত ব্রহ্মপদবিশিষ্ট গানকে ব্রহ্মগীতি বলেছেন। ব্রহ্মগীতিতে 'ঝণ্টুং' 'হুঁ', হোং প্রভৃতি শব্দ স্তোভাক্ষরের মতো ব্যবহৃত হোত। তবে যাবতীয় গানে অক্ষর, অক্ষরযুক্ত পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি থাকা চাই তবেই তা স্বরযুক্ত হলে গানের উযোগী হয়।

কপাল ও কম্বল গীতি

দেবাদিদেব মহাদেব ভ্রমণে বেরিয়ে গান ধরেছেন; নানাবিধ জাতি গান। সেই অপূর্ব সংগীতে তাঁর ললাটের চন্দ্রকলা থেকে রসক্ষরণ হতে লাগল। এই রস হোল অমৃতরস। সেই রসধারায় অভিষিক্ত হোল ব্রহ্মার মস্তক শোভিত কপাল বা করোটি মালা। অমৃত সংযোগে সেই সকল কঙ্কাল-কপাল সজীব হয়ে উঠল এবং তারাও মহাদেবের সেই মহাসংগীতে অনুষ্ঠান করতে লাগল। কপালগীতি নামক সংগীত সম্বন্ধে এই পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত।

শুদ্ধজাতি বা জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন সাতটি কপাল খৃষ্টপূর্ব যুগে ব্রহ্মপদ নামে পরিচিত ছিল। সংগীতশাস্ত্রী কম্বল (নাগরাজ অশ্বতরের ভ্রাতা) নামাংকিত ব্রহ্মপদাবলীকে কম্বলগীতি বলা হোত। শার্ঙ্গদেব কপাল পদাবলীর পরিচয়ে ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী ধৈবতী ও নৈষাদী কপালের নামোল্লেখ করেছেন। এগুলি জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট বলে জন্যরাগ বলে কথিত এবং গ্রামরাগের শ্রেণীভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব মদ্রকাদি সাতটি এবং ছন্দকাদি সাতটি মোট চৌদ্দটি শিবস্তুতির উল্লেখ করেছেন। যেমন, মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর আসারিত, আসারিত ছন্দক, বর্ধমানক, পাণিকা, ঋক, গাথা ও সাম। কপালাদি যেমন ব্রহ্মপদ তেমনি শিবস্তুতিও বটে, সুতরাং এগুলি সামগানেরই বিভিন্ন রূপ।

মঙ্গলগীতি

রামায়ণ-মহাভারতাদিতে উল্লেখ থাকায় মঙ্গলগীতি যে খৃষ্টীয় অব্দের বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল সেকথা বোঝা যায়। তখন ব্রাহ্মণ, বৈতালিক, স্তাবক, সূত মাগধ, বন্দী প্রভৃতিরা রাজ্যাধিপতির গুণগান তথা মঙ্গলকামনা করে মঙ্গলগীতি গাইতো। ভরত নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকের প্রারম্ভে আশীর্বচনসহ মঙ্গলস্তুতির বিধির কথা বলেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমার সম্ভব' গ্রন্থে বিলম্বিত লয়ে কিম্বা মঙ্গলপদে (ছন্দে) কৈশিক বা বোট্ট রাগে মঙ্গলপ্রবন্ধ (গীতি) গাওয়ার কথা বলেছেন। শার্ঙ্গদেব একে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের পর্য্যায়ভুক্ত করে মঙ্গলাচার ও মঙ্গলপ্রবন্ধ দুটিকে পৃথক শ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধগীতির তিনটি শ্রেণী—সূড় বা মার্গসূড়, অলিসংশ্রিত ও বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ আবার ছত্রিশ রকম, যার মধ্যে চর্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, ধবল, মঙ্গল বা মঙ্গলগীতি অন্যতম। পাল ও সেন রাজত্বকালে (১০ম-১১শ শতাব্দী) এগুলি নতুন ভাবে রূপায়িত হয় এবং পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ তারই বিবর্তিতরূপ মঙ্গলকাব্যের বিকাশ হয়।

ধ্রুবাগান

ধ্রুবা বা ধ্রুবাগান প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন যে এই গান আনন্দের উদ্বোধক হয় এবং মানুষের পাপকালিকা দূর করে পূণ্য বা মোক্ষের পথে নিয়ে যায়। ধ্রুবাগানে পূর্ণস্বর, বিলম্বিত বর্ণ, তিন স্থান, বিলম্বিতাদি মাত্রা প্রভৃতির বিকাশ থাকে এবং পরিগীতিকা মদ্রক, চতুষ্পদা প্রভৃতি বস্তু ও রক্ত, সম, শ্লক্ষ্ণ প্রভৃতি উপাদান-যুক্ত হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, ধ্রুবাগান শীর্ষকা, উদ্ধতা, অনবদ্ধা, বিলম্বিতা, অড্ডিতা ও অপকৃষ্টা ভেদে ছয় শ্রেণীর তথা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন রকম প্রকৃতির এবং নাটকের জন্য প্রযুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট গানের রীতির কথাও উল্লেখ করেছেন।

জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নাম এই পাঁচটিকে ধ্রুবার হেতু বা কারণ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্ত, অক্ষর ও প্রমানকে জাতি বলে; আশ্রয়কে স্থান এবং পরিচয়কে নাম বলে। সম, অর্ধ ও বিষমকে প্রকার বলে। ষট্‌কলা ও অষ্টকলা ভেদে প্রমাণ দুটি। সমান বৃত্ত যুক্তকে সম ও অসমান বৃত্তযুক্তকে বিষম ধ্রুবা বলে। সম ও বিষমভেদে চৌষট্টিটি ধ্রুবা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন বৃত্ত থেকে সৃষ্ট ধ্রুবাগুলি আবার প্রাবেশিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তরা ও নৈষ্ক্রামিকী এই পাঁচভাগে বিভক্ত। এগুলি সবই রস ও ভাবযুক্ত করে গাওয়া হোত। নাটকের প্রস্তাবনায় প্রাবেশিকী; কোন অংকের শেষে নিষ্ক্রমনের সময়ে নৈষ্ক্রামিকী; নৃত্যকালে যথারীতি ক্রমভঙ্গ করে দ্রুতলয়ে আক্ষেপিকী; নির্দিষ্ট রসের পরিবর্তে ভিন্ন রসের অবতারণা করে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে সাম্য সৃষ্টির জন্য প্রাসাদিকী এবং বিষন্নতা, ক্রোধ, মত্ততা, মূর্ছা, পতন প্রভৃতি ব্যাপারে অন্তরা ধ্রুবাগান করা হোত। এগুলির নামও ছিল বিচিত্র যেমন: তটি, ধৃতি রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিদ্যুৎভ্রান্তা, ভূতলতন্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্‌ক্তি, মালিনী, জলা, বিমলা, রম্যা, ভীমা, নলিনী নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা সমুদ্রা প্রভৃতি। অধিকাংশ ধ্রুবা শংকস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত ও শূরসেনী ভাষায় রচিত ছিল।

দিব্য সংকীর্তন

প্রাচীনকালে ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত গানকে দিব্য এবং শৌর্য-বীর্য-গুণগাথা-রূপ স্তুতি মূলক গানকে সংকীর্তন বলা হোত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সংকীর্তন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকর্তাদেরই সৃষ্ট নয়, এর প্রচলন খৃষ্টপূর্ব সমাজেও ছিল। আশীর্বাদ, বিজয়, প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও দেবতার আরাধনায় ঋক্‌, সাম, পাণিকা, গাথা, ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক এই সাতটি অঙ্গগীতি করার প্রথা ছিল। এগুলি ধ্রুবার অঙ্গ এবং বৈদিক গানের উপাদানে সৃষ্ট।

বৃত্তি

চিত্তের বিকাশ, বিক্ষেপ, সংকোচ, বিস্তার প্রভৃতি সাধন যে করে তাই বৃত্তি অর্থাৎ বৃত্তি মনের স্বভাব বা ধর্মবিশেষ। ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী ভেদে নাটকীয়া বৃত্তি চার প্রকার। চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা ভেদে সাংগীতিক

বৃত্তি তিন প্রকার। চিত্রা বৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত বাদ্য, দ্রুতলয়, সমযতি ও অনাগত গ্রহের প্রাধান্য থাকে; আবৃত্তি বৃত্তিতে মাগধী প্রভৃতি গীতি, বাদ্য, দ্বিকলাবিশিষ্ট তাল মধ্যলয়, স্রোতগতায়তি ও সমগ্রহের প্রাধান্য থাকে এবং দক্ষিণা বৃত্তিতে গীতি, চতুষ্কলাযুক্ত তাল, বিলম্বিত লয়, গোপুচ্ছাযতি ও অতীতগ্রহের প্রাধান্য থাকে। বৃত্তি নাটকাভিনয়ে প্রযুক্ত, নাটকে অভিপ্রেত এবং ধ্রুবাদি গানে ব্যবহৃত হয়। ভরত বলেছেন যে, ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম দুটিতে যেমন সকল স্বরের সমাবেশ থাকে; নাটক বা প্রকরণে তেমনি সকল বৃত্তির সমাবেশ থাকে। তিনি নাটকের উপযোগী সংগীতেরই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। যাতে মনে হয় প্রাচীনকালে যাগযজ্ঞ ও উপাসনাদি ছাড়া যাবতীয় সংগীত নাটকের জন্যই অভিপ্রেত ছিল।

বহির্গীত

যে গান রঙ্গের বাইরে গাওয়া হয় তাই বহির্গীত। ভরত এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পরে আসারিত, বর্ধমান প্রভৃতি যে সকল গান করা হোত সেগুলিকে বলা হোত বহির্গীত। প্রাচীন স্তোভের অনুকরণে এর সৃষ্টি তাই এতে কতগুলি অর্থহীন শব্দের সমাবেশ থাকতো এবং প্রধানত চচ্চৎপুট ও চাচপুট (এ দুটি যথাক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কল ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল) তাল ব্যবহৃত হোত।

অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্বরঙ্গ-বিধানের প্রথমার্ধে শুষ্ক অক্ষরের মাধ্যমে আসারিত গীতির প্রয়োগ করা হোত এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্তোভকপদের মাধ্যমে আসারিত গান করার নাম ছিল বহির্গীত; তারপরে কুতপ শ্রেণীকে একত্রিত করে যবনিকা উদ্‌ঘাটন করার পরে নৃত্য ও মদ্রকাদি গান করা হোত।

চতুর্বিধগীতি

নাটকে প্রযুক্ত ধ্রুবাগান প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন যে, অংশাদিযুক্ত জাতিরাগগুলি তিনটি বৃত্তি এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চতুর্বিধ গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হোত। এগুলি বর্ণ, অলংকার, পদ, ধাতু, লয় প্রভৃতি উপাদান বিশিষ্ট ছিল। বিভিন্ন বৃত্তিতে যে গান করা হয় তাকে মাগধী; অর্ধকলা বিশিষ্ট হলে অর্ধ-মাগধী; গুরু অক্ষরযুক্ত হলে সম্ভাবিতা এবং লঘু অক্ষর যুক্ত হলে পৃথুলা বলা হোত।

মগধ বা বিদর্ভ দেশ থেকে নাকি এগুলির আমদানী। তবে যেখান থেকেই

প্রবর্তন হোক না কেন এগুলির প্রচলন যে ব্রহ্মা বা সদাশিব ভরতের সময়েও ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি গান্ধর্ব শ্রেণীর গান।

আসারিত

আসারিত গীতির পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার এই অঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বহির্গীত হিসাবে আসারিত, বর্ধমানক (বর্ধমান) প্রভৃতি গীতির ব্যবস্থা থাকতো। 'বর্ধমান' আসারিত থেকেই সৃষ্ট এবং আসারিত অপরান্তকাদির মতো অক্ষর, দ্বিকল, চতুষ্কল ভেদে ছিল তিন রকম। মার্গভেদে তিনি ছয় রকম বর্ধমান গীতিরও পরিচয় দিয়েছেন। এই গীতিগুলি সব নাটকের জন্যই অভিপ্রেত ছিল।

মতঙ্গ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আসারিত গীতিতে নাটকের মুখে, বা প্রস্তাবনায় 'মধ্যম', প্রতিমুখে 'ষড়্জ', দেহে বা গর্ভে 'সাধারিত', অবমর্শে 'পঞ্চম', সংহারে 'কৈশিক' এবং পূর্বরঙ্গে 'ষাড়ব' গ্রামরাগ গাওয়ার রীতি ছিল: অর্থাৎ তিনি নাটকের ছয়টি অঙ্গ বা সন্ধির উল্লেখ করে ছয়টি গ্রামরাগে গীতিগুলি গাওয়ার কথা বলেছেন। এই প্রথা নাকি ব্রহ্মাভরত রচিত আদি নাট্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

হরিবংশ পুরাণাদিতে আসারিত নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আসারিত' অর্থে, অভিনয়ে অঙ্গ হিসাবে নৃত্যক্রিয়াবিধি, একে 'চিত্রতাণ্ডব'ও বলা হোত। এই বিধিতে প্রথমে নর্তকীর প্রবেশ, তারপরে অভিনয় প্রদর্শন, তারপরে তাল ও ছন্দ অনুযায়ী অঙ্গহার প্রয়োগ এবং পরিশেষে দেবতা চিহ্নরূপ নৃত্য প্রদর্শন। এই চারটি নৃত্যক্রিয়া নাকি অভিসার অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হোত।

আবার গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে তালরক্ষা করার নাম আসারিত এবং নানাবিধ তাল প্রয়োগের রীতির নাম আসারিতবিধি। আসারিতবিধিতে কলাপাত হিসাবে শম্যাদি তালের প্রয়োগ থাকতো।

দেবতাদের গুণ ও মহিমাকীর্তন করে গান করার নাম 'গীতবিধি' এবং রঙ্গপীঠের চতুর্দিকে লোকপালদের বন্দনাগীতি করার নাম ছিল 'পরিবর্তন'।

ছালিক্য

ছালিক্য গান্ধর্ব শ্রেণীর নিবদ্ধ গান। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর হরিবংশ পুরাণে সাংগীতিক উপকরণ হিসাবে হল্লীসক নৃত্য, ছালিক্য গীত নৃত্য ও ক্রীড়া প্রভৃতির

উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক স্ত্রী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যাদি সহযোগে এই গান করতো। এই অনুষ্ঠানে ছয়টি গ্রামরাগ, বিভিন্ন তাল তথা ধাতু ও মাতুর সমাবেশ থাকতো। বর্তমান 'রাগমালা' সম্ভবত এর থেকেই উদ্ভাবিত। আবার অনেকে মনে করেন খৃষ্টপূর্ব সমাজের ছালিক্যগানই পরবর্তীকালে রূপক নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছালিক্য গান যুক্ত খেলার নাম ছিল ছালিক্যক্রীড়া। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অসংখ্য প্রকার ক্রীড়ার উল্লেখ আছে, যার অধিকাংশ নৃত্য ও গীত সহযোগে অনুষ্ঠিত হোত। যেমন, জলক্রীড়া, ছালিক্যক্রীড়া, রাসক্রীড়া, নৃত্যক্রীড়া, নাট্যক্রীড়া, বংশ-নৃত্য, ইন্দ্রধ্বজোৎসব, দেবযাত্রাদি মহোৎসব, হোলিকামহোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি। অনেক স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে ছালিক্য নৃত্য এবং ছালিক্যক্রীড়া অনুষ্ঠিত হোত।

কুতপবিন্যাস

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশ করে নৃত্য বা নাট্যোপযোগী আসর তৈরী করাকে কুতপবিন্যাস বলে। ভরত তত, আনদ্ধ এবং নাট্য এই তিনরকম কুতপ স্বীকার করেছেন, যা উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্রভেদে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অবশ্য ভরত গায়ক ও বাদকবৃন্দের সমাবেশ, অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশ বা সমবেত রূপ প্রভৃতি নানারকমে কুতপের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে "চতুর্বিধং আতোদ্যং কুতপং" এই বাক্যটিকেই এর আসল বর্ণনা বলা যায়। এখানে তিনি বৈপাক্ষিক বীণাবাদক, বংশীবাদক, মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দুর বাদক প্রভৃতি শিল্পীদের সমাবেশকে কুতপ বলেছেন।

আশ্রাবণাবিধি

আশ্রাবণাবিধি বলতেও নাট্যের উপযোগী করে বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সাজানো বোঝায়। আতোদ্য বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যে রঞ্জনাশক্তি সৃষ্টির জন্যই আশ্রাবণা-বিধির সার্থকতা।

শুষ্কবাদ্য

ভরত যন্ত্রসংগীতকে শুষ্ক বা নির্গীতবাদ্য বলেছেন। নৃত্য বা গীতাদির বিরাম-কালে এর প্রয়োগ হোত। বর্তমানে যাকে বলা হয় আবহসংগীত (Orchestra)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তানসেনের বংশ (১)

বিঃ দ্রঃ নাম-ঐক্যতা-বিভ্রাট।
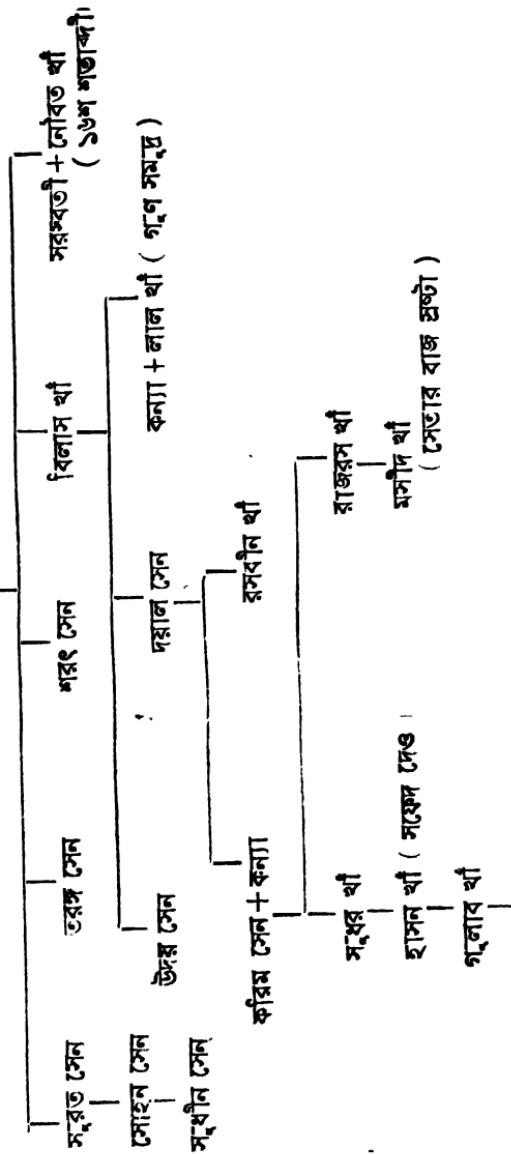
মুসলমানী নামের ঐকতার জন্য সংগীতের ইতিহাসে যে জটিলতা দেখা যায় সেকথা অনেকেই জানেন। একই নামের বহু সংগীতজ্ঞের সন্ধান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। যাঁদের সময়কাল এবং সংগীতের বিষয় সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদে সেই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুষ্ঠু এবং নির্ভুল তথ্যাদি সংকলনের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থকার।

* তানসেনের শিষ্য—খোদাবক্স, মদনদআলী, রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ মামুদ খাঁ, ধাণ্ডেরাও, যুন্দিবর খাঁ, চাঁদ খাঁ, সরজ খাঁ, লাল খাঁ রমজান খাঁ, নিজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, শোভা খাঁ, বীরমণ্ডল, মলিন খাঁ, চঞ্চলশশী, ভীমরাও, তাজবাহাদুর, ভগবানদাস চন্দ্রলাল, দেবীলাল। তানসেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রচিত "হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান" (১৩৬৪) নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
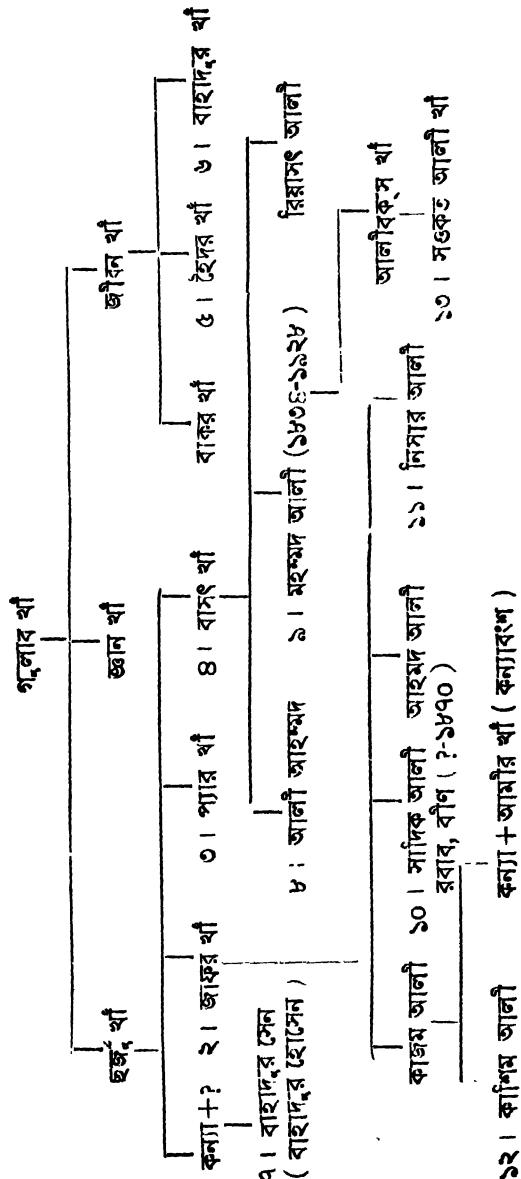
১। স্বামী হরিদাসের শিষ্য—গোপাললাল, তানসেন, দিবাকর পণ্ডিত, বৈজুবাওরা, মহারাজ সমোধন সিং, মদন রায়, রাজা সৌর সেন, রামদাস, সোমনাথ।

২। জাফর খাঁ'র শিষ্য—বাহাদুর সেন, মহারাজা বিশ্বনাথ সিং (রেওয়া)।

৩। প্যার খাঁ'র শিষ্য—আনন্দকিশোর (বেতিয়া), গুরুপ্রসাদ মিশ্র, কুতুব-বক্স, নবাব হসমৎজঙ্গ (টংক), বখতাওয়র জী, বাহাদুর সেন, শিবনারায়ণ মিশ্র।

৪। বাসৎ খাঁ'র শিষ্য—কাশিম আলী, নিয়ামতুল্লা খাঁ (স্বরোদ), রাজা হরকুমার ঠাকুর।

৫। হৈদর খাঁ'র শিষ্য—নবাব আলী নক্কী খাঁ (নবাব ওয়াজেদ আলীর দেওয়ান)।

৬। বাহাদুর খাঁ'র শিষ্য— গদাধর চক্রবর্তী (বিষ্ণুপুর)।

৭। বাহাদুর সেনের শিষ্য—আসীহোসেন, ইনায়ত হোসেন ও মহম্মদ হোসেন খাঁ (সহসবান), উজীর খাঁ ও নবাব হৈদর আলী খাঁ (রামপুর), গোলাম নবী, পান্নালাল বাজপেয়ী (সেতার), বুনিয়াদ হোসেন (গান)।

৮। আলী আহমদ খাঁর শিষ্য—অর্জুন বৈদ্য, তারাপ্রসাদ ঘোষ, নন্নে খাঁ, পান্নালাল জৈন, প্যারে নবাব খাঁ (পাটনা), মিঠাইলাল, মীর সাহেব (জলন্ধর), রামশেবক মিশ্র।

৯। মহম্মদ আলীর শিষ্য—কানাইলাল ঢেঁড়ী (গয়া), গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, ঠাকুর নবাব আলী খাঁ (ছম্মন সাহেব), নবাব হামিদ আলী (রামপুর), বিহারীলাল পাণ্ডা (গয়া), ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রবাব, সুরশৃঙ্গার), সওকৎ আলী খাঁ (রবাব সুরশৃঙ্গার)।

১০। সাদিক আলীর শিষ্য—চিন্তামনি বাপুলী (সুরশৃঙ্গার), পান্নালাল বাজপেয়ী (সেতার), কাশিম আলী, অর্জুন বৈদ্য, নিসারআলী, মহেশচন্দ্র সরকার (বীণ)।

১১। নিসার আলীর শিষ্য—উজীর খাঁ (রামপুর) (রবাব, বীণ, সুরশৃঙ্গার), অর্জুন বৈদ্য, পান্নালাল বাজপেয়ী (সেতার)।

১২। কাশিম আলীর শিষ্য—গনেশ বাজপেয়ী, মহেশচন্দ্র সরকার, মিঠাইলাল, যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট)।

১৩। সওকৎ আলী খাঁ অতি গুণী যন্ত্রী ও গায়ক। ইনি 'সেনী গীতিমালা' নামক (৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তানসেনের বংশ (২)
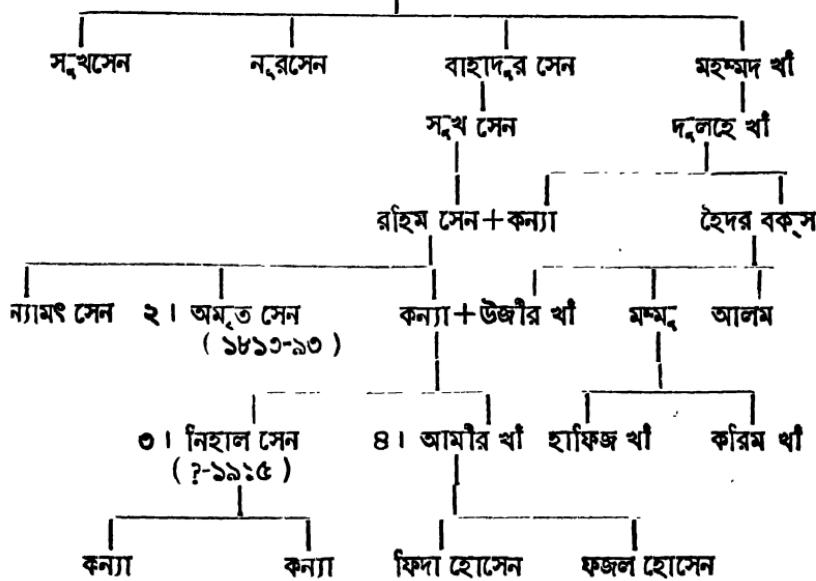
১। মসীদ খাঁ'র শিষ্য—বংশধরেরা এবং গোলাম রেজা খাঁ। ইনি মসীতখানি ও রেজাখানি বাজ প্রবর্তন করেছিলেন এইরূপ কথিত আছে।

২। অমৃতসেন অতি গুণী সেতারী ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি সুদর্শন আচার্যকে সেতারে তালিম দিয়েছিলেন।

৩। নিহালসেন অমৃতসেনের দত্তকপুত্র এবং গুণী সেতারী ছিলেন। এঁর দুই কন্যাকে আমীর খাঁ'র দুই পুত্র বিবাহ করেন।

৪। আমীর খাঁ'র শিষ্য—বংশধরেরা এবং ৫। বরকতুল্লা (সেতার)।

৫। বরকতুল্লা খাঁ'র শিষ্য—৬। আশিক্ আলী খাঁ ও ৭। মুস্তাকআলী খাঁ। (সহসবান)।

৬। আশিক আলী খাঁ'র শিষ্য—অমিয় গোপাল ভট্টাচার্য, গোপীনাথ গোস্বামী।

৭। মুস্তাকআলীর শিষ্য—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, দেবব্রত চৌধুরী, নিখিল বন্দোপাধ্যায়, নিতাইচন্দ্র বসু, নির্মলকুমার গুহঠাকুরতা, নৃপেন্দ্রনাথ গুহ, ফটিক চ্যাটার্জী, হরেন্দ্রকান্ত লাহড়ি চৌধুরী।

তানসেনের কন্যাবংশ
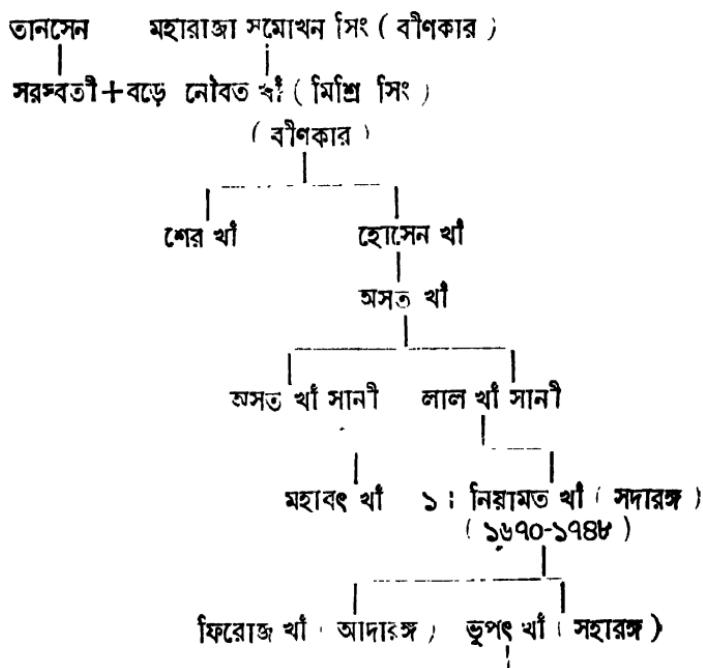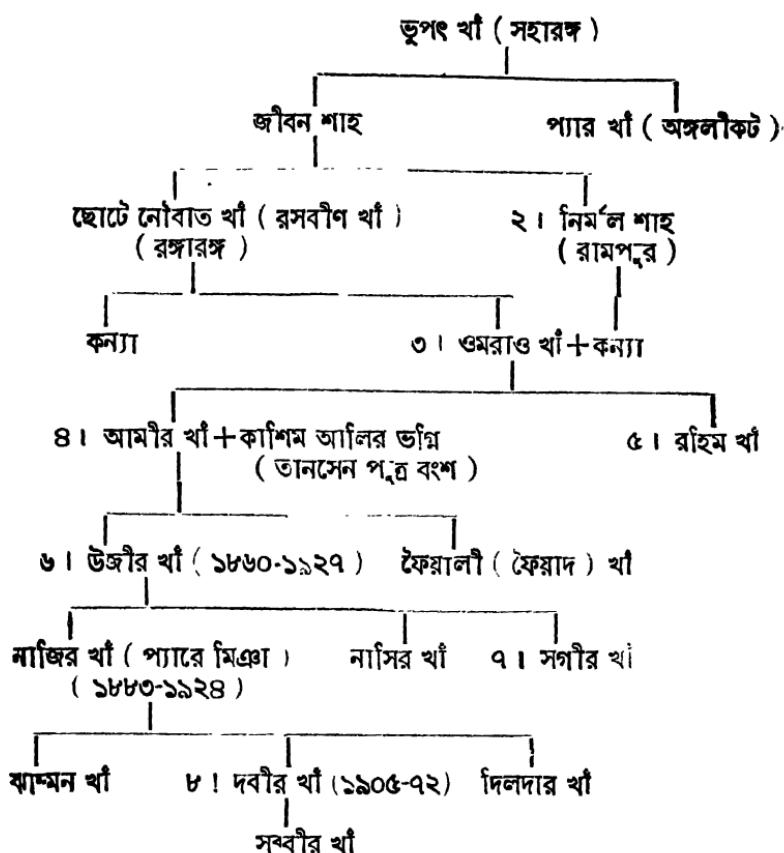
১। সদারঙ্গের শিষ্য—কাওয়াল বালকদ্বয় (যাঁরা সম্ভবত গোলামরসুল ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্বপুরুষ), মনরঙ্গ।

২। নির্মলশাহের শিষ্য—ওমরাও খাঁ (পুত্র), জাফর খাঁ, মখখন খাঁ, প্যার খাঁ, বাসৎ খাঁ, বন্দেআলী খাঁ, মুরাদ খাঁ, ১১। খলিফা মহম্মদ জমা, শক্কর খাঁ, সাহেবদাদ খাঁ।

৩। ওমরাও খাঁ'র শিষ্য-কুতুববক্স (তানেরস খাঁ) (দিল্লী), গোলাম মহম্মদ খাঁ ও তৎপুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, হসমৎজঙ্গ খাঁ (বান্দার নবাব)।

৪। আমীর খাঁ'র শিষ্য—ফিদাহোসেন (সেকেন্দ্রাবাদ), বুনিয়াদ হোসেন, মহম্মদহোসেন।

৫। রহিম খাঁ'র শিষ্য—অসগর আলী খাঁ, উজীর খাঁ।

৬। উজীর খাঁ'র শিষ্য—আলাউদ্দীন খাঁ, আব্বার রহিম, তারাপ্রসাদ ঘোষ, নাসির আলী, মহম্মর হোসেন, ৯। প্রথমনাথ বন্দোপাধ্যায়, দবীর খাঁ, যাদবেন্দ্র মহাপাত্র, সৈয়দ ইব্বন আলী, ১০। হাফিজআলী, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, হামিদ আলী (রামপুরের নবাব)।

৭। সগীর খাঁ'র শিষ্য—ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বীণাপানী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৮। দবীর খাঁ'র শিষ্য—অজিত মুখার্জী, কালীদাস সান্ন্যাল, ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী, নন্দগোপাল বিশ্বাস, ডঃ তৃণা পুরোহিত, ডঃ দীনা রায়, ডলি দে, বিপিনচন্দ্র দাস, বীণাপানী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মমতা মৈত্র, মায়া মিত্র, মায়া রায়, রাজা রায়, রাধিকামোহন মৈত্র, শেখর হালদার, শ্যামল চ্যাটার্জী, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নিতাই রায়, মধু চিনচানি, সন্তোষ বন্দোপাধ্যায়।

৯। প্রমথনাথের শিষ্য—কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জামাতা), বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শচীন্দ্র মিত্র, শীতল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার শূর।

১০। হাফিজ আলীর শিষ্য—কুমার জগন্নাথ মিশ্র, কিষণচাঁদ বড়াল।

১১। খলিফা মহম্মদ জমা ছিলেন নির্মলশাহ ও খলিফা রমজাণীর শিষ্য। ইনি অতি গুণী গায়ক, বীণকার, রবাবী ও সেতারী ছিলেন। ইনি সাহারানপুরের অধিবাসী ও বাহাদুরশাহ জাফরের দরবারে নিযুক্ত এবং উদয়পুর ঘরাণা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।

গোয়ালিয়র ঘরাণা (১)
কব্বাল বংশীয় ?
১। গোলাম রসুল
মিঞা জানি
২। গোলাম নবী (শোরী মিঞা)
কন্যা + মিঞামৌজ
৩। শক্কর
মখ্‌খন
৪। বড়ে মহম্মদ খাঁ
আহম্মদ খাঁ
রহমৎ খাঁ
হিম্মৎ খাঁ
৫। কাদির বক্‌স
আবদুল্লা খাঁ
বারিস আলী
ইনায়ত আলী
৬। নত্থন খাঁ
পীর বক্‌স

৪। বড়ে মহম্মদ খাঁ
নথন খাঁ
আমন আলী
বাকর আলী
৭। মুবারক আলী
(?-১৮৮০)
মুনব্বর আলী
ফৈয়াজ খাঁ
করম আলী
দিলাবর আলী
৮। হদ্দু খাঁ
(?-১৮৭০)
৯। হস্সু খাঁ
১০। নথ্থু খাঁ
গুলে ইমাম
১১। নিসার হোসেন খাঁ
(১৮৪৪-১৯১৬)
ছোটে মহম্মদ খাঁ
রহমৎ খাঁ
হৈদর খাঁ
কন্যা +
বন্দে আলী খাঁ
(কিরানা)
কন্যা +
ইনায়ত হোসেন খাঁ
(সহসবান)
১২। মেহেদী হোসেন
(?-১৯২০)

গোয়ালিয়র ঘরাণার বৈশিষ্ট্য :

১। খোলা আওয়াজ তথা জোরদার গীতরীতি।

২। ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল।

৩। সরল সাপট তানের প্রাধান্য।

৪। বোলতান প্রয়োগকালে লয়কারী।

৫। গমকের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১। গোলাম রসুল ও মিঞাজানি অতিগুণী গায়ক এবং তৎকালীন সংগীতাকাশের চন্দ্রসূর্যরূপে স্বীকৃত ছিলেন। এঁরা লক্ষ্ণৌর রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২। গোলাম নবী পিতা ও বাহাদুর সেনের কাছে তালিম পেয়েছেন। এঁর শিষ্য গম্মুও অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। যাঁর শিষ্য শাদী খাঁও গুণী শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বেনারসের মনোহর, প্রসিদ্ধকেও ইনি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন বলে শোনা যায়।

৩। শক্কর ও মখ্খন গোলাম রসুল, মিঞাজানি ও নির্মল শায়ের শিষ্য এবং গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা বংশধরদেরই তালিম দিয়েছেন।

৪। বড়ে মহম্মদ খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ, ও নথু খাঁ'র মতো অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এঁরই তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট।

৫। কাদিরবক্স ও আব্দুল্লা খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং ভিনকুজিরা ও সিন্ধিয়ার দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৬। নথন খাঁ ও পীরবক্স গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার গুরু এবং দরবারী সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

৭। মুবারক আলী অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং অলবরের মহারাজা শিবদিন সিংয়ের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর কোন প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিল না বটে, কিন্তু এঁর সংস্পর্শে এসে যাঁরা জ্ঞানার্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আগ্রার নথন খাঁ ও অত্রৌলির আল্লাদিয়া খাঁ উল্লেখযোগ্য।

৮। হদ্দু খাঁ'র শিষ্য—ইনায়ত হোসেন (জামাতা), নিসারহোসেন (ভ্রাতুষ্পুত্র), ছোটে মহম্মদ খাঁ ও রহমত খাঁ (পুত্র), মেহদীহোসেন (পৌত্র), পণ্ডিত দীক্ষিত, পণ্ডিত বালাগুরু, পণ্ডিত যোশী, বালকৃষ্ণ বুয়া

(ইচলকরংজীকর), ইমদাদ খাঁ, রহ্মে খাঁ, নজীর খাঁ, গোপাল চক্রবর্তী (মুলোগোপাল), সাহেবদাদ খাঁ।

৯। হস্মু খাঁ'র শিষ্য—মুলোগোপাল, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সাহেবদাদ খাঁ, হরকুমার ঠাকুর।

১০। নথ্থু খাঁ'র শিষ্য—নিসার হোসেন (পুত্র), লক্ষীকান্ত ভট্টাচার্য।

১১। নিসার হোসেনের শিষ্য—ভাউরাও যোশী, রামকৃষ্ণ বুয়াবাঝ, শংকর রাও পণ্ডিত, হরদেকর।

১২। মেহদী হোসেনের শিষ্য—১৩। বলদেওজী পুঞ্ছওয়ালে, মোঘুবাঈ।

১৩। বলদেপজীর শিষ্যা—১৪। ডঃ সুমতী মুটাটকর।

১৪। ডঃ সুমতী মুটাটকরের শিষ্য—অমলদাশ গুপ্ত।

গোয়ালিয়র (স্বরোদ) ঘরাণা (২)

১। বন্দেগী খাঁ কাবুল থেকে ঘোড়ার ব্যবসা উপলক্ষে ভারতে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিল প্রিয় স্বরোদ যন্ত্রটি। কারু মতে ইনিই ভারতবর্ষে স্বরোদ প্রচলন করেন। এঁর পুত্র হক্‌দাদ খাঁ অতিগুণী স্বরোদীয়া এবং গোয়ালিয়রের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

২। নন্নে খাঁ অতিগুণী স্বরোদীয়া ছিলেন এবং বংশধরদের উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন।

৩। আব্দুল্লা খাঁ মুরাদ আলীর শিষ্য এবং অতিগুণী স্বরোদীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—বংশধরেরা এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর ও বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৪। হাফিজ আলী খাঁ বিশ্ববিখ্যাত স্বরোদীয়া এবং গোয়ালিয়র ও রামপুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনি গণেশীপ্রসাদ চতুর্বেদী ও রামপুরের উজীর খাঁ'র কাছে তালিম পেয়েছেন। এঁর শিষ্য—পুত্রেরা, কুমার জগৎ নারায়ণ মিত্র ও বিষণচাঁদ বড়াল।

৫। আমীর খাঁ অতিগুণী স্বরোদীয়া এবং রাজসাহী জমিদার পরিবারের সংগীত গুরু ছিলেন। এঁর শিষ্য—আশুতোষ কুণ্ডু, কুমার জগৎ নারায়ণ মিত্র, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, পান্নালাল রায় চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শীতলচন্দ্র মুখার্জী, রাধিকামোহন মৈত্র।

সেকেন্দ্রাবাদ ঘরানা (দিল্লী)
১। কাদির বক্‌স
২ কুতুব বক্‌স / তানরস খাঁ
(কুতুবুদ্দোলা)
(?-১৮৯০)
মাদার খাঁ
হৈদর খাঁ
শব্বু খাঁ
(?-১৯৩২)
গোলাম গৌস খাঁ
৪। ওমরাও খাঁ
সরদার খাঁ
(১৮৬০-১৯৩০)
কন্যা +
আলী হোসেন
(সহসবান)
কন্যা +
মহম্মদ হোসেন
(সহসবান)
আব্দুল রহিম
আব্দুল করিম
?
৩। কুতুব আলী খাঁ
গোলাম আব্বাস খাঁ
(ভূপাল)

১। কাদিরবক্‌স ছিলেন দিল্লীর নিকটবর্তী ডাসনা নামক স্থানের অধিবাসী এবং দিল্লী রাজদরবারের সংগীতজ্ঞ। ইনি নাকি কৌড়িওয়ালে মস্তক নামে এক অতিগুণী সংগীতজ্ঞের বংশধর।

২। কুতুব ছিলেন পিতা, অচপল এবং তানসেন বংশীয় ওমরাও খাঁর শিষ্য। ইনি অতিগুণী গায়ক ও সেতারী ছিলেন। এঁর শিষ্য—আব্দুল্লা খাঁ, আলীবক্‌স ও ফতেআলী (পাঞ্জাব), ইনায়ত হোসেন (সহসবান), পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতাদ্বয় এবং মহমুদ খাঁ (দরশপিয়া)। এছাড়া সারেঙ্গীবাদক উজাগর সিং ও ননহীবাঈ প্রমুখও তালিম নিয়েছেন।

৩। কুতুবআলী ছিলেন সেকেন্দ্রাবাদের অধিবাসী এবং অতিগুণী গায়ক। এঁর সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যাদি সঠিকভাবে না জানা গেলেও ইনি যে হদ্দু খাঁ, তানরস খাঁ, মহম্মদ আলী প্রমুখের সমসাময়িক তথা সমান মর্যাদার সংগীতজ্ঞ ছিলেন সেকথা জানা যায়। রমজান খাঁ রঙ্গিলের পরে সেকেন্দ্রাবাদে ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ গায়কশিল্পী, এইরূপ কথিত আছে।

৪। ওমরাও খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং ইন্দোর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের সভাগায়ক ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি আব্দুল আজিজ খাঁকে তালিম দিয়েছেন।

সেকেন্দ্রাবাদ (রঙ্গীলে) ঘরাণা
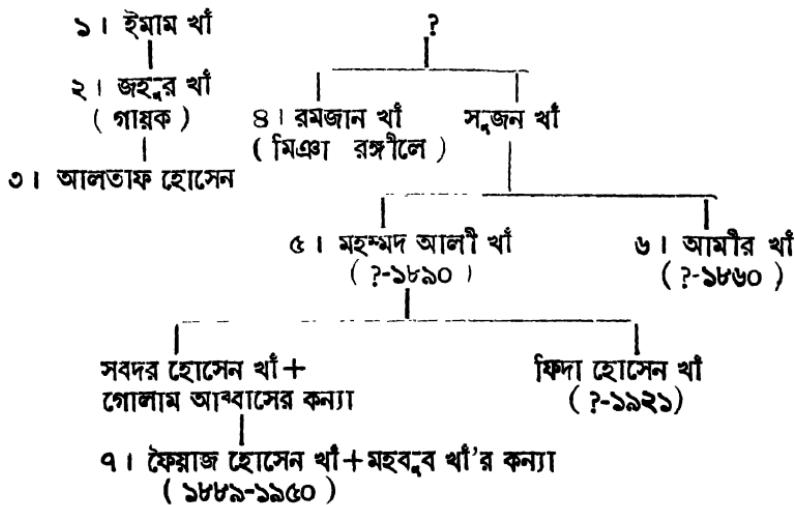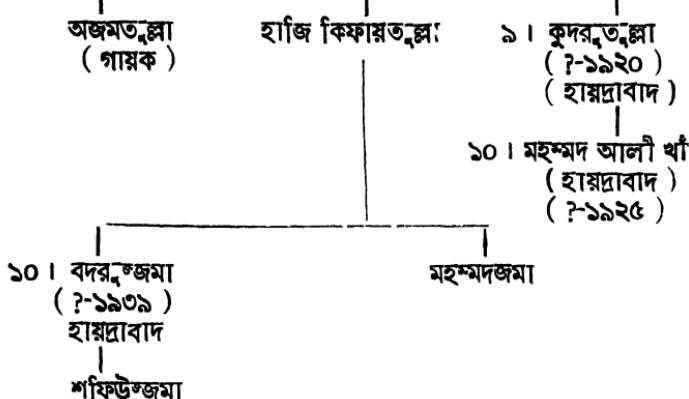
১। ইমাম খাঁ সেকেন্দ্রাবাদ নিবাসী এবং উত্তম ঢোল বাদক ছিলেন।

২। জহুর খাঁ বংশীয় গুরুজন ছাড়া তানরস খাঁ ও মহবুব খাঁর কাছে তালিম পান। ইনি অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন।

৩। আলতাফ হোসেন পিতার কাছে তালিম পান। এঁর শিষ্য অজমৎ হোসেন খাঁ (ভাগ্নে, অত্রৌলি)।

৪। রমজান খাঁ অত্রৌলির ইমাম বক্সের শিষ্য এবং বুলন্দশহরের অধিবাসী ছিলেন। রঙ্গীলে ছদ্মনামে ইনি বহু সংগীত রচনা করেছেন। সংগীত রচনায় ইনি প্রায় সদারঙ্গের সমকক্ষ ছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

৫। মহম্মদ আলী খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ইনি বংশীয় গুরুজন এবং ইমামবক্সের কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি জয়পুর, অলবর, বুঁদি প্রভৃতি রিয়াসতের দরবারী গায়ক থাকার পরে ঝালরাপটনের রাজ-দরবারে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই এঁর মৃত্যু হয়।

৬। আমীর খাঁ অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমধুর ছিল। তাই ঈর্ষাবশত কেহ এঁকে সিন্দুর খাইয়ে গলা নষ্ট করে দেয়। পরে হজরত মখদুম সফরুদ্দীনের (বিহার) দরগায় দু'বছর প্রার্থনা করার পরে আবার নাকি তাঁর কণ্ঠস্বর ভাল হয়ে যায়।

৭। ফৈয়াজ হোসেন সংগীত শিক্ষা পান মাতামহ গোলাম আব্বাস, শ্বশুর

মহবুব খাঁ এবং খুল্লতাত ফিদাহোসেনের কাছে। ইনি অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—অজমৎ হোসেন, আতাহোসেন, এম. এম. কুড়ওকর, ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপচাঁদ বেদী, ধ্রুবতারা যোশী, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনজনকর, সরাফৎ হোসেন, সুনীল বসু, মোহন সিং, কে. এল. সায়গল, বিলায়ত হোসেন (আগ্রা), স্বামী বল্লভদাস, বশীর খাঁ (অত্রৌলি)।

৮। রহমতুল্লা বুলন্দশহর (সেকেন্দ্রাবাদ) নিবাসী ছিলেন। ইনি তানরস খাঁ, হদ্দু খাঁ প্রমুখের শিষ্য এবং অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

৯। কুদরুতুল্লা অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ইনি উত্তম কাওয়ালি গাইতেন এবং মীর মহবুব আলী নিজামের দরবারে (হায়দ্রাবাদ) নিযুক্ত ছিলেন।

১০ বদরুজ্জমা ও মহম্মদআলী অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং হায়দ্রাবাদ রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

সহসবান ঘরাণা (রামপুর)
?
করিম বক্‌স খাঁ
রহিম বক্‌স খাঁ
কল্লন খাঁ +
পদ্দুন খাঁর ভগ্নি
১। আলিবক্‌স খাঁ
ভেলিবক্‌স খাঁ
১। মহবুব বক্‌স খাঁ
বলিবক্‌স খাঁ
বাবু খাঁ + কল্লন খাঁ'র কন্যা
আশিক হোসেন
কন্যা
৫। মুস্তাকহোসেন (১৮৮০-১৯৬৪) (গায়ক)
হৈদর খাঁ + কন্যা
২। ইনায়ত হোসেন + (১৮৪৯-১৯১৯) হদ্দু খাঁ'র কন্যা
৩। আলীহোসেন (বীণকার)
৪। মহম্মদ হোসেন (বীণকার)
৮। ইস্তিয়াক হোসেন (গায়ক)
৯। ইশাখ হোসেন (হারমণিয়ম)
কন্যা +
৫। মুস্তাকহোসেন
কন্যা +
৬। নিসারহোসেন
কন্যা +
বারিসহোসেন

১। আলীবক্স ও মহবুব বক্স অতিগুণী গায়ক।শল্পী ছিলেন। বংশধরদেরই এঁরা তালিম দিয়েছেন।

২। ইনায়ত হোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং রামপুর দরবারে নিযুক্ত

ছিলেন। বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনি হদ্দু খাঁ, বাহাদুর খাঁ ও তানরস খাঁ'র কাছে তালিম পেয়েছেন। এঁর শিষ্য—আলীহোসেন, খাদিম হোসেন, ছজ্জু খাঁ, নজীর খাঁ, নিসার হোসেন, বশীর খাঁ, মহম্মদ হোসেন, মুস্তাক হোসেন, রামকৃষ্ণ বুয়া, শিবসেবক মিশ্র, ১৩। হাফিজ খাঁ (গুড়য়ানী) (মহীশূর), ফিদাহোসেন (বড়োদা)।

৩। আলীহোসেন ও ৪। মহম্মদ হোসেন অতিগুণী বীণকার এবং রামপুর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন এঁরা বংশীয় গুরুজন ছাড়া কুতুববক্‌সের (তানরস) কাছে তালিম পান এবং তাঁর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

৫। মুস্তাক হোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং নেপাল, হায়দ্রাবাদ ও রামপুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি পিতা, মামা পুত্তন খাঁ ও শ্বশুর ইনায়ত হোসেনের কাছে তামিল পান। তাছাড়া রামপুরের উজির খাঁর কাছেও ইনি তালিম পেয়েছিলেন। এঁর শিষ্য—পুত্রেরা, জামাতা এবং গোলাম সাদিক খাঁ, মুজদ্দত নিয়াজী, সুলোচনা চতুর্বেদী।

৬। নিসার হোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং বড়োদার রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য গোলাম আকবর, গোলাম মুস্তাফা, পুত্রেরা, জামাতা ও সমরেশ গোস্বামী।

৭। গোলাম মুস্তাফা বম্বে ছায়াচিত্রে গায়ক শিল্পী হিসাবে কর্মরত আছেন।

৮। ইস্তিয়াক হোসেন ও ৯। ইশাখ হোসেন গুণী সংগীতজ্ঞ এবং রামপুর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

১০। ফিদাহোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং রামপুর ও বড়োদার রাজ-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বংশীয় গুরুজনদের কাছেই ইনি তালিম পেয়েছেন। এঁর শিষ্য—গোলাম মুস্তাফা, গোলাম সাবির খাঁ, নিসার হোসেন খাঁ, সরফরাজ হোসেন খাঁ, রসিদ আহমদ, হাফিজ আহমদ।

১১। হাফিজ আহমদ গায়কশিল্পী হিসাবে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এই বংশীয় তথ্যাদি সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

১২। সরফরাজ হোসেন গায়কশিল্পী তথা প্রযোজকরূপে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এই বংশীয় তথা অন্যান্য ঘরানা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য কয়েছেন।

১৩। হাফিজ খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ তথা গায়ক শিল্পী এবং মহীশূরের গুড়য়ানী ঘরানার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁর অগ্রজ বশীর খাঁ ও কনিষ্ঠ
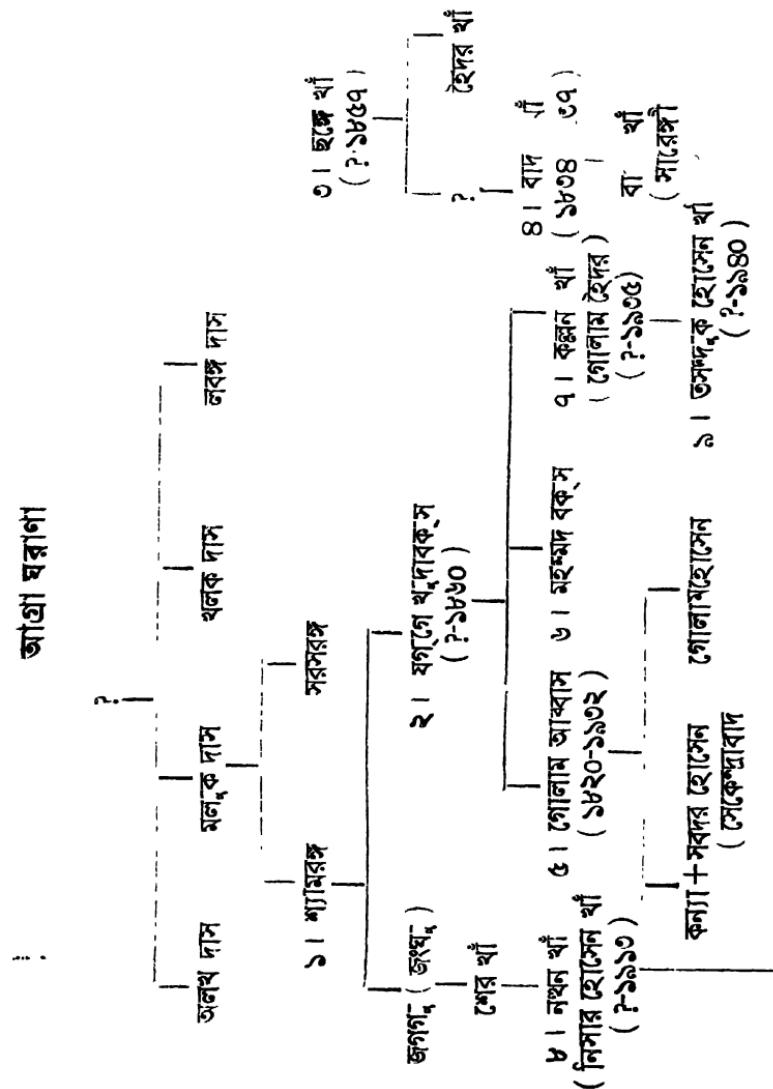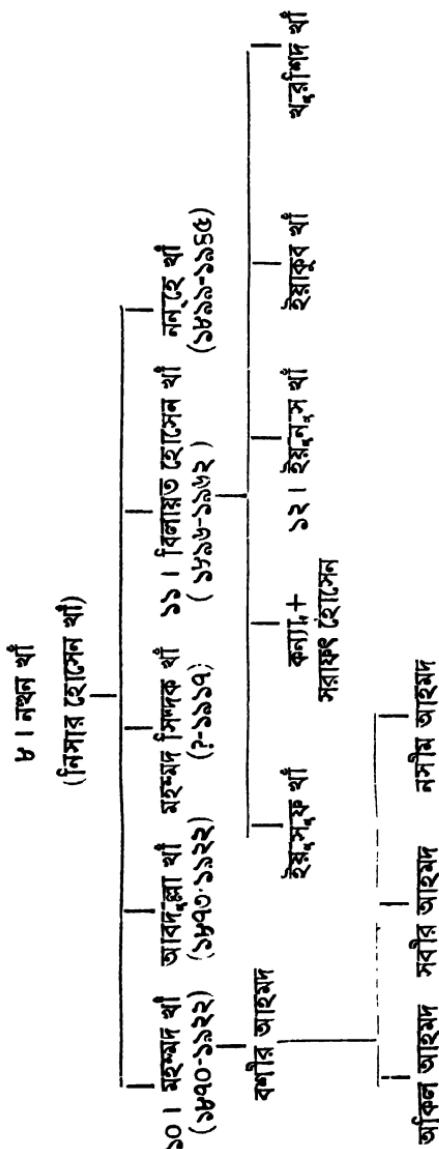
ভ্রাতা হাবীর খাঁ এবং পুত্র শরীফআলী খাঁ সকলেই গুণী সংগীতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।

মন্তব্য॥ ললিত মোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখের গুরু ওস্তাদ তসদ্দুক হোসেন বেনারস ও মেটিয়াবুরুজ নিবাসী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ; যিনি কিছুদিন নেপালেও ছিলেন।

আগ্রা ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। নোমতোম সহযোগে আলাপচারী।
২। উদাত্ত ও জোরদার আওয়াজ।
৩। বহু বিচিত্র বোলতান প্রয়োগ।
৪। সুন্দর বন্দীশযুক্ত গীতরচনা।
৫। খেয়ালের সঙ্গে ধ্রুপদ ধামার প্রভৃতি গায়নরীতি।

১। শ্যামরঙ্গ ও সরসরঙ্গ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং কাশীর মহারাজা, আগ্রাবাসী বীরভদ্রের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শোনা যায় এঁদের বহু শিষ্যও ছিল, কিন্তু এঁদের বা শিষ্যদের সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি জানা যায় না।

২। ঘগ্‌গে খুদাবক্‌স অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং জয়পুরের মহারাজা সবাই রামসিংহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শিবদিনকে (পণ্ডিত বিশ্বনাথের পুত্র) এবং ভরতপুরের আলীবক্‌সকে সংগীত শিক্ষাদান করেছেন।

৩। ছঙ্গে খাঁ ছিলেন অতিগুণী সংঙ্গীতজ্ঞ এবং মিঞা অচপলের সমসাময়িক। বর্তমানকালের ওস্তাদেরা এঁর নামে, অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন-স্বরূপ কানে হাত দিয়ে থাকেন। ইনি দিল্লী রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৪। বাদল খাঁ অতিগুণী সারেঙ্গীবাদক ও গায়কশিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য অনিল হোম, খাদিম হোসেন, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জমীরুদ্দীন খাঁ, ১৩। ডঃ অমিয়নাথ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, মেহদী হোসেন, শচীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শচীনদাস, মতিলাল, শোভনা রায়, সতীশচন্দ্র অর্ণব, ১৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৫। গোলাম আব্বাস অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি চন্দন চৌবেকে তালিম দিয়েছেন।

৬। মহম্মদ বক্‌স উত্তম গায়ক শিল্পী এবং জয়পুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৭। কল্লন খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি অসদ আলীখাঁ, খাদিম হোসেন, অনবর হোসেন, প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

৮। নথন খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গোলাম আব্বাস ছাড়া ইনি

ঘসিট খাঁ (ফতেপুর), খ্বাজাবক্স (দিল্লী) প্রমুখের কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি বড়োদার রাজদরবারে ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি ভাস্কর রাও ভখেলে (ভাস্কর বুয়া) কে তালিম দিয়েছেন।

৯। তসদ্দুক হোসেন বংশধরদের ছাড়া দীপালী নাগ চৌধুরীকে তালিম দিয়েছেন।

১০। মহম্মদ খাঁ বংশধরদের ছাড়া চম্পাবাঈ করলেকর, তারাবাঈ, বাঁকাবাঈ সিবেলেকর, বিসমিল্লা খাঁ (সানাই) প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

১১। বিলায়ত হোসেন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন (জীবন কথা দ্রষ্টব্য)।

১২। ইয়ুনুস খাঁ গুণী সেতারী, বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত আছেন।

১৩। ডঃ অমিয় সান্যালের শিষ্যা—রেবা মহুরী (কন্যা)।

১৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের শিষ্য—ডাঃ বিমল রায়।

শাহারাণপুর ঘরাণা (১ম কিরাণা)

কিরাণা ঘরাণার বৈশিষ্ট্য :

১। এক একটি স্বর সংযোগে বড়ত-ফিরত-সহ গায়ন রীতি।

২। স্বতন্ত্র স্বর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য।

৩। আলাপ প্রধান গায়কী।

৪। ঠুংরী অঙ্গে বিশেষ পারদর্শী।

৫। খেয়ালের সঙ্গে ঠুংরী গায়নরীতি।

অতিগুণী সংগীতজ্ঞ খলিফা রমজানীর শিষ্য
১। খলিফা মহম্মদ জমা
আল্লারক্খে খাঁ
২। গোলাম তকী খাঁ
গোলাম জাকির খাঁ
গোলাম আজম খাঁ
গোলাম কাশিম খাঁ
গোলাম জামিন খাঁ
৩। বন্দে আলী খাঁ + চুন্দু খাঁর কন্যা
(১৮৩০-১৮৯০)
(বীণকার)
বারস আলী খাঁ
রাজা আলী খাঁ
কন্যা + জাকিরুদ্দিন খাঁ
(উদয়পুর)
কন্যা + আল্লাবন্দে খাঁ
(উদয়পুর)

১। খলিফা মহম্মদ জমা অতিগুণী বীণকার, রবাবী, সেতারী এবং গায়ক শিল্পী ছিলেন। ইনি শাহারণপুর নিবাসী এবং অন্তিম মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি তানসেন বংশীয় নির্মলশা'র কাছেও তালিম পান। দিল্লীতে এঁর মৃত্যু হয়।

২। গোলাম তকী খাঁ এবং এঁর ভাইয়েরা সকলেই উত্তম গায়ক শিল্পী এবং জয়পুর, অলবর প্রভৃতি রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৩। বন্দে আলী খাঁ যন্ত্র-সংগীতে কিরাণা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি বংশীয় গুরুজন ছাড়া নির্মলশাহ, বহরম খাঁ, ফৈয়াজহোসেন খাঁ প্রমুখ অতিগুণী সংগীতজ্ঞদের কাছে তালিম পেয়েছেন এবং স্বয়ং অতিগুণী বীণকার ছিলেন। এঁর শিষ্য পরম্পরা অতি বিশাল। যেমন,

৪। গণপৎ রাও, চুন্নাবাঈ (দ্বিতীয় পত্নী), ৫। জামালুদ্দীন খাঁ (জয়পুর), জোহরাবাঈ, ৬। বহীদ খাঁ (বীণ), বলবন্ত রাও, মঙ্গলু খাঁ, ৭। মুরাদ খাঁ, ৮। রজবআলী খাঁ, রহীম খাঁ (বীণ), ৯। শাহমীর খাঁ (সারেঙ্গী)।

৪। গণপৎরাও'র শিষ্য গহরজানবাঈ, গিরিজা শংকর চক্রবর্তী (বিষ্ণুপুর), গফুর খাঁ, জঙ্গী খাঁ, ১০। প্যারে সাহেব, বড়ে মোতিবাঈ, বশীর খাঁ (অত্রৌলি), মালকাজান, ১১। মৈজুদ্দীন, ১২। শ্যামলাল ক্ষেত্রী।

৫। জামালুদ্দীনের শিষ্য—১৩। আবিদহোসেন (পুত্র)।

৬। বহীদ খাঁ'র শিষ্যা—১৪। আব্দুল বহীদ খাঁ, বেগম আখতর।

৭। মুরাদ খাঁ'র শিষ্য—১৫। বাবু খাঁ (সেতার)।

৮। রজব আলী প্রসিদ্ধ গায়ক মঙ্গলু খাঁর পুত্র এবং অতিগুণী গায়কশিল্পী ছিলেন। ইনি কোলহাপুরে নিযুক্ত ছিলেন এবং ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত উত্তম গাইতে পারতেন। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতি এঁকে একাডেমি পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেন।

এঁর শিষ্য—গণপৎরাও দেবাস্কর, বহরে বুয়া, শংকররাও সরনায়ক।

৯। শাহমীর খাঁ'র শিষ্য—১৬। আমন আলী, ১৭। আমীর খাঁ (পুত্র), রসুলন বাঈ।

১০। প্যারেসাহেব (মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা) লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলীর ভ্রাতা ছিলেন। ইনি খুব সুন্দর গজল, দাদরা প্রভৃতি গাইতে পারতেন।

১১। মৈজুদ্দীনের শিষ্য—নন্দলাল (শানাই), বড়ে মোতিবাঈ, শের আলী, সিদ্ধেশ্বরীবাঈ।

১২। শ্যামলালের শিষ্য—ডঃ অমিয় কুমার সান্ন্যাল।

১৩। আবিদ হোসেনের শিষ্য—বিমল মুখোপাধ্যায়।

১৪। আব্দুল রহীদের শিষ্য—মহম্মদ খাঁ ফরিদী (পুত্র), শ্যামসুদ্দীন ফরিদী (পৌত্র)।

১৫। বাবু খাঁ'র শিষ্য—আব্দুল হালিম জাফর খাঁ।

১৬। আমান আলীর শিষ্য—শিবকুমার শুক্ল।

১৭। আমীর খাঁ'র শিষ্য—এ. কানন, পূরবী মুখোপাধ্যায়, অমর নাথ, প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনির খাঁ (সারেঙ্গী)।

২য় কিরাণা ঘরাণা

১। আব্দুল করিম খাঁ অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—আব্দুল বহিদ খাঁ, গণেশচন্দ্র বহরে (বহরে বুয়া), বালকৃষ্ণ বুয়া, বিশ্বনাথ বুয়া, যাদব মধুসূদন আচার্য, ৩। রামভাই কুন্দগোলকর (সওয়াই গন্ধর্ব), রোসনারা বেগম, সরস্বতী বাঈ রাণে, ৪। সুরেশবাবু মানে, শংকর রাও সরনায়ক, ৫। হীরাবাঈ বড়োদেকর।

২। আব্দুল বহিদ খাঁ অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্যা—বেগম অখতর, হীরাবাঈ বড়োদেকর।

৩। সওয়াই গন্ধর্ব অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর শিষ্য—গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, বাসবরাজ রাজগুরু, ভীমসেন যোশী, সরস্বতী বাঈ রাণে।

৪। সুরেশবাবু মানে'র শিষ্য বাসবরাজ রাজগুরু, ৫। হীরাবাঈ বড়োদেকর, মাণিক ভর্মা।

৫ হীরাবাঈ বড়োদেকরের শিষ্যা— সরস্বতী বাঈ রাণে

৪র্থ কিরাণা ঘরাণা

১। রহমান বক্‌স — ভ্রাতা

১। রহমান বক্‌স → ২। মজীদ খাঁ, হামিদ খাঁ

ভ্রাতা → ৩। আব্দুল হক্
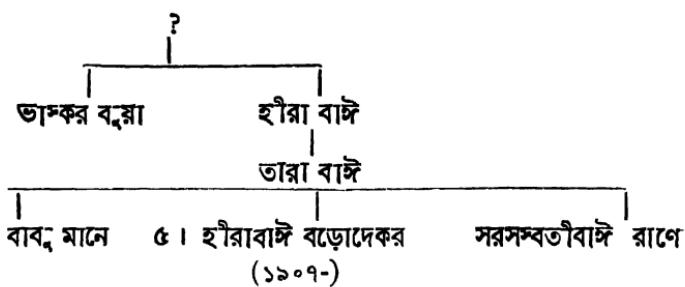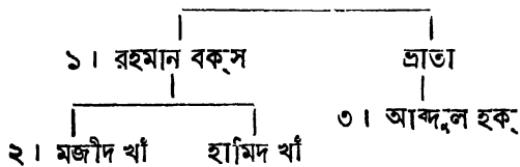
১। রহমান বক্‌স কিরাণার অতি প্রবীণ সারেঙ্গী বাদক এবং জয়পুরের রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২। মজীদ খাঁ ও হামিদ খাঁ প্রথমে উত্তম সারেঙ্গী বাদক ছিলেন কিন্তু পরে গান আরম্ভ করেন এবং গায়ক হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁরা এবং খুল্লতাত ভ্রাতা ৩। আব্দুল হক সমগ্র ভারতে সংগীত সফর করেন। তবে এঁরা বাংলা ও বিহারে বেশী থেকেছেন এবং শেষ জীবনে পূর্ণিয়ার রাজদরবারে আশ্রয়লাভ করেছিলেন।

৫ম কিরাণা ঘরাণা

আব্দুল রহিম খাঁ
(গায়ক)

১। গফুর খাঁ
(সারেঙ্গী)

২। সকুর খাঁ
(সারেঙ্গী)
(১৯০৮-১৯৭৫)

মসকুর আলী খাঁ
(গায়ক)
(১৯৫০-)

মুবারক আলী

১। গফুর খাঁ অতিগুণী সারেঙ্গী বাদক এবং নানগাঁও তথা ভোপাল ষ্টেটে নিযুক্ত ছিলেন।

২। সকুর খাঁ পিতা এবং কিরাণার বহীদ খাঁর কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি প্রায় ১৮ বছর দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। প্রতিনিধি হিসাবে ইনি ভারতের নানা স্থানে এবং আফগানিস্থান, কাবুল, রাশিয়া প্রভৃতি বহুস্থানে সংগীত সফর করেছেন। এঁর বংশের যাবতীয় তথ্য ইনি স্বয়ং লেখককে দিয়েছেন। বিগত ৬ই অকটোবর '৭৫ এঁর মৃত্যু হয়।

শ্যামচৌরাশী ঘরাণা (পাঞ্জাব)
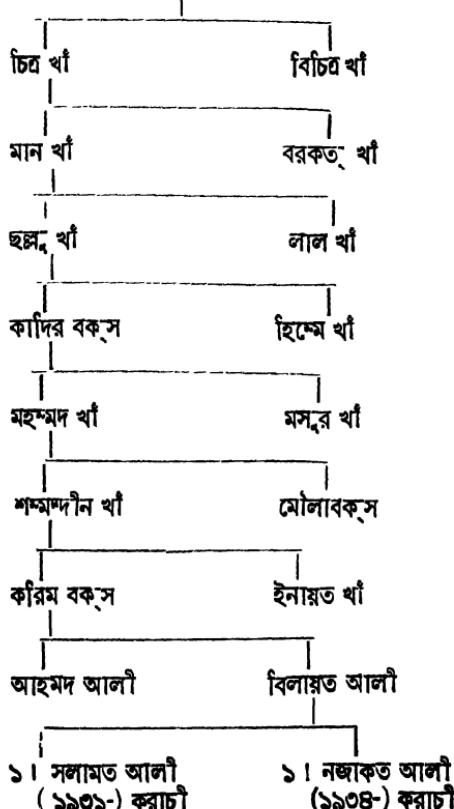
১। এই ভ্রাতৃদ্বয় অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং পাকিস্তানের (করাচী) অধিবাসী। এঁরা সাধারণত দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে থাকেন।
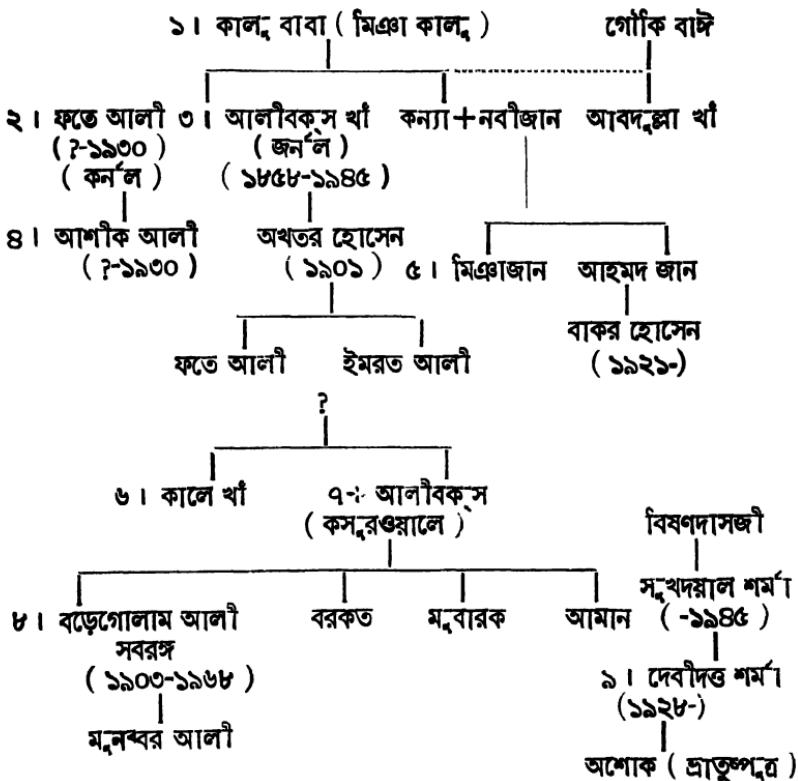
১। মিঞা কালু অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং তানরস খাঁর মিত্র ছিলেন। ইনি বহরাম খাঁ'র (উদয়পুর) শিষ্য ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি ফতে আলী, গৌকিবাঈ (রক্ষিতা) প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

২। ফতে আলী ও ৩। আলীবক্স ছিলেন পাতানো ভাই ও কালু মিঞার শিষ্য এবং টংক রাজদরবারে নিযুক্ত। এঁরা অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং যথাক্রমে 'তান কাপ্তান' ও 'জর্নল খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। এঁরা এবং আব্দুল্লা খাঁ তানরস খাঁর কাছেও তালিম পেয়েছিলেন। বংশধরদের ছাড়া এঁরা কালে খাঁ ও আলীবক্সকে তালিম দিয়েছেন।

৪। আশীক আলী অতি গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বহু শিষ্যকে ইনি তালিম দিয়েছেন। ৬০ বছর বয়সে পাঞ্জাবেই এঁর মৃত্যু হয়।

৫। মিক্কা জান অতিগুণী গায়কশিল্পী এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। টংক, পাতিয়ালা, বড়োদা, মহীশূর প্রভৃতি বহু রাজদরবারে ইনি বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। কালে খাঁ অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত আত্মভোলা প্রকৃতির হওয়ায় কোথাও বেশীদিন থাকতেন না। বড়ে গোলাম আলী ও তারাপদ ঘোষকে ইনি কিছুদিন তালিম দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়সেই এই অসাধারণ প্রতিভার মৃত্যু হয়।

৭। আলীবক্স কসুর নামক স্থানের অধিবাসী এবং আলীবক্সের শিষ্য ও অতিগুণী দিলরুবা বাদক ছিলেন।

৮। বড়ে গোলাম আলী অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—প্রসূন বন্দোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রভাতী মুখোপাধ্যায়।

৯। দেবীদত্ত শর্মা সংগীতে বংশগত অধিকার প্রাপ্ত। এঁর পিতা ছিলেন পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া স্বামী এতোয়ার নাথজীর এবং পাঞ্জাবের তিলবন্তী ঘরাণার মেহের আলীর শিষ্য। দেবীদত্তজী আশীকআলী ও বাকর হোসেনের কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এই ঘরাণার কিছু তথ্য এঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(ক) ফতে আলী ও আলীবক্সের নামের প্রথমাংশ নিয়ে আলীয়াফত্তু শব্দের উৎপত্তি।

*শাজাহানপুর ঘরাণা (সরোদ)
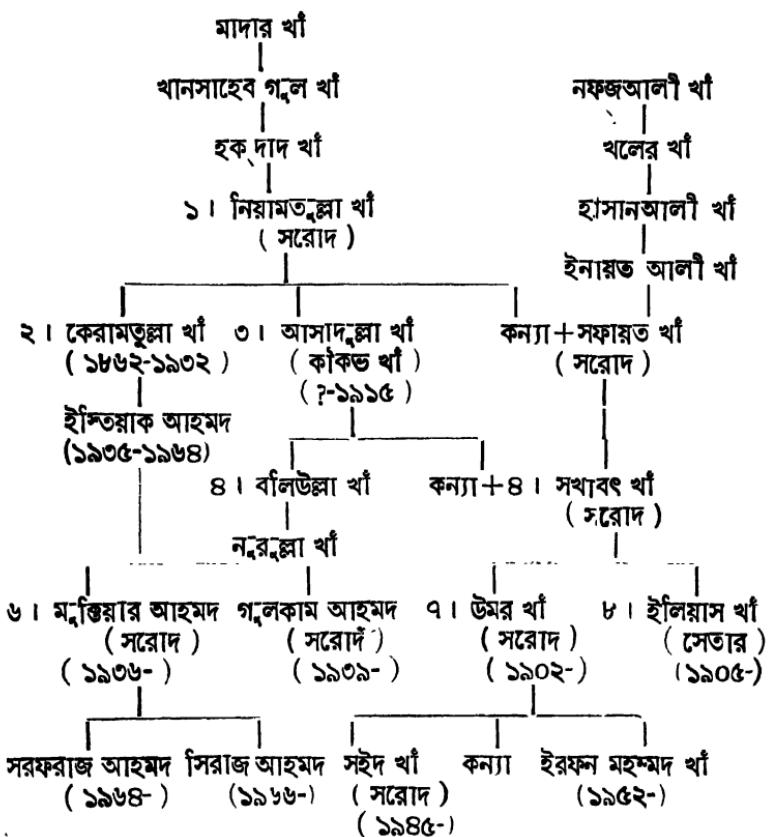
১। নিয়ামতুল্লা খাঁ অতিগুণী সরোদ বাদক ছিলেন। বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনি তানসেন বংশীয় বাসৎ খাঁ'র কাছেও তালিম পেয়েছেন।

২। কেরামতুল্লা ও ৩। আসাতুল্লা বংশীয় গুরুজনদের কাছে তালিম পেয়েছেন। এঁরা অতিগুণী সরোদ ও সেতার বাদক ছিলেন।

২। এঁর শিষ্য—কালীচরণ রায়, (৯) কালীপাল (এস্রাজ), ক্ষিতিশচন্দ্র লাহিড়ী (সেতার), জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবর ডাঙা), মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), রফিকুল্লা (হারমনিয়ম), শ্যামকুমার গাঙ্গুলী, (৫) সখাবৎ খাঁ, (১০) সফিকুল্লা খাঁ, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (সুরবাহার)।

* এই ঘরাণার অধিকাংশ তথ্য ওস্তাদ কহিমুদ্দীন ডাগুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩। এঁর শিষ্য—জ্ঞানপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙা), (১১) ধীরেন্দ্রনাথ বসু, (১২) ননীগোপাল মতিলাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (সাহিত্যিক), বেচাচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর বাবু), শরৎচন্দ্র সিংহ, (১৩) সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৪) বল্লিউল্লা খাঁ।

৪। বলিউল্লা খাঁর শিষ্য—(১৪) পুলিনচন্দ্র পাল।

৫। সখাবৎ খাঁ অতিগুণী সরোদীয়া তথা লণ্ডন, ফ্রান্স প্রভৃতি নানাস্থানে খ্যাতি প্রাপ্ত এবং লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। মুক্তিয়ার আহমদ অতিগুণী সরোদীয়া, বর্তমানে দিল্লী সংগীত কলা কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। লেখককে ইনি তথ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। এঁর শিষ্য কুমারী কাঞ্চন, চুন্নীলাল, রাজকুমারী জয়ন্ত।

৭। উমর খাঁ'র শিষ্য—নবাবজাদী বেগম জব্বর সাহেবা (জলপাইগুড়ি), সন্তোষ স্বামী।

৮। ইলিয়াস খাঁ'র শিষ্য—বেগম আখতর। ইনি বংশীয় গুরুজন ছাড়াও আব্দুল গণি ও ইউসুফ খাঁ (লক্ষ্ণৌ) প্রমুখের কাছে তালিম পেয়েছেন।

৯। কালীপালের শিষ্য—ইস্তিয়াক আহমদ, দেবী মুখার্জী।

১০। সফিকুল্লা খাঁ'র শিষ্য—ইস্তিয়াক আহমদ।

১১। ধীরেন্দ্রনাথ বসুর শিষ্য—অনিল রায়চৌধুরী, সন্তোষ স্বামী, সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী।

১২। ননীগোপালের শিষ্য—শ্রীপদ ব্যানার্জী।

১৩। সত্যেন্দ্রনাথের শিষ্য—সন্তোষ স্বামী।

১৪। পুলিনচন্দ্রের শিষ্যা—জয়া বসু।

ফতেপুর শিকরী ঘরাণা
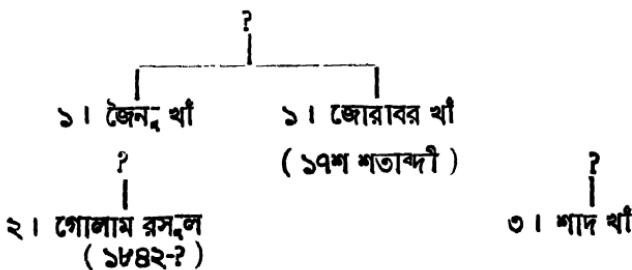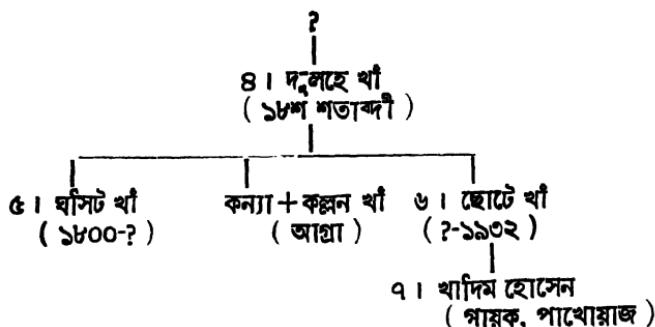
১। জৈনু খাঁ ও জোরাবর খাঁ। অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের (১৬০৫—১৬২৭) দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা শেখ সলীম চিস্তির দরগাতে কাওয়ালিও গাইতেন। এই বংশের শিল্পীরা এমন ছড়িয়ে পড়েছেন যে এঁদের সম্পর্কের যোগসূত্র নির্ণয় করা কঠিন।

২। গোলাম রসুল অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং মৌলা আলী সুমরণ নামক এক গুণী সংগীতজ্ঞের বংশধর ছিলেন। ফতেপুরে এঁর জন্ম হয়। আগ্রা ও আশেপাশের অঞ্চলে এঁর বহু শিষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩। শাদ খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ তথা কবি এবং আগ্রা নিবাসী কাশীরাজের সভাতে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও শেখ সলীমের দরগায় কাওয়ালি গাইতেন।

৪। দুলহে খাঁ অতিগুণী গায়কশিল্পী ছিলেন। ইনিও শেখ সলীমের দরগায় কাওয়ালি গাইতেন।

৫। ঘসিট খাঁ অতিগুণী গায়কশিল্পী এবং হদ্দু-হস্সু খাঁ প্রমুখের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি পিতা এবং লক্ষ্ণৌর হৈদর খাঁ'র কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি কল্লন খাঁ, ছোটে খাঁ, বিলায়েত খাঁ প্রমুখ অনেককে তালিম দিয়েছেন।

৬। ছোটে খাঁ ছিলেন অতিগুণী গায়ক এবং পাখোয়াজ বাদক। ইনি কুদ্দু সিংহের কাছে পাখোয়াজ এবং বংশীয় গুরুজনদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। ইনি বিলায়েত খাঁ এবং বাংলার অনেককে সংগীত শিক্ষা দান করেছেন।

৭। খাদিম হোসেন উত্তম গায়ক ও পাখোয়াজী ছিলেন। পিতার কাছেই ইনি সংগীত শিক্ষা করেন।

অত্রৌলি ঘরাণা
১। সাহাব খাঁ
?
হস্সু খাঁ
(ধ্রুপদীয়া)
?
ভূপত খাঁ
নথ্থু খাঁ
৩। মানতোল খাঁ
২। হোসেন খাঁ
(?-১৮৩৬)
গুলাব খাঁ
(?-১৯৩৪)
করিম বক্‌স
কাদির খাঁ
দৌলত খাঁ
(গায়ক)
আলীআহমদ
(গায়ক)
মহম্মদ খাঁ
(গায়ক)
কন্যা+
আল্লাদিয়া খাঁ
৪। ইমাম বক্‌স
(উদয়পুর)
৫। খৈরাতি খাঁ
(গায়ক)
৬। খবাজা আহমদ খাঁ
৭। জাহাঙ্গীর খাঁ
চিম্মন খাঁ
৮। করিম বক্‌স
৯। অজমতহোসেন
(১৯১১-)
১১। বশীর খাঁ
(?-১৯৩৮)
১২। আল্লাদিয়া খাঁ
(১৮৫৫-১৯৪৬)
হৈদর খাঁ
(?-১৯৩৫)

আল্লাদিয়া খাঁ
১০। জহুর খাঁ
(গায়ক)
নসীরুদ্দীন (বড়েজী)
(১৮৮৬-১৯৩৬)
১৪। বদরুদ্দীন (মঞ্জী)
(১৮৮৮-১৯৩৫)
১৫। সমশুদ্দীন (ভূঁজি)
(১৮৯০-
আজীজুদ্দীন
১৩। মহবুব খাঁ (দর্শপিয়া)
জামাল আহমদ
কন্যা +
লিয়াকত আলী
কন্যা +
ফৈয়াজহোসেন
(আগ্রা)
আতাহোসেন
(১৮৯৮-)
১৬। বন্দেহোসেন
(১৯০২-)
নাসিরহোসেন
হসমত আলী
শরাফত হোসেন
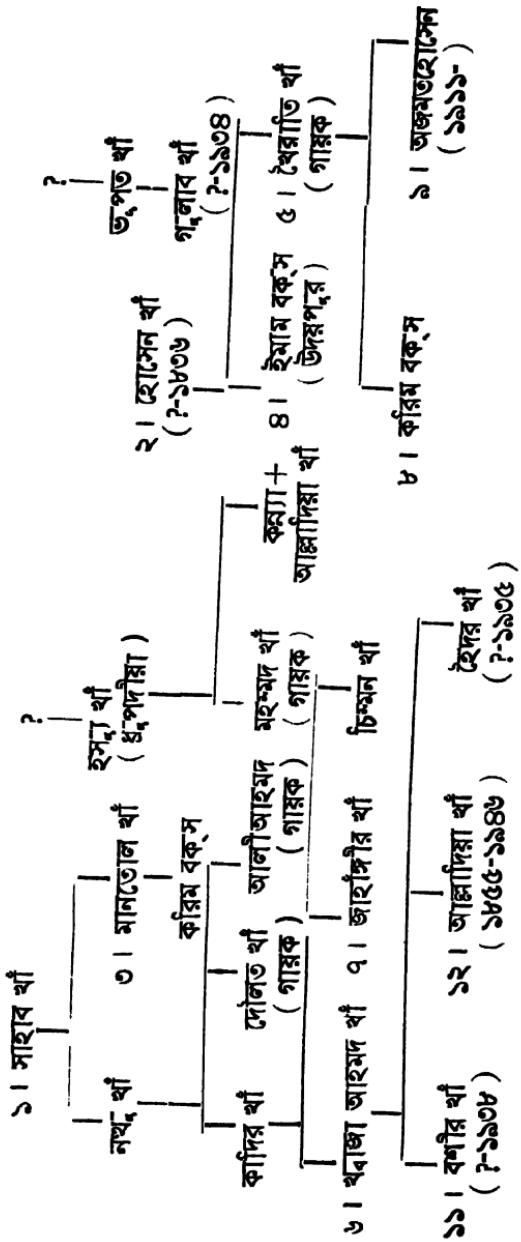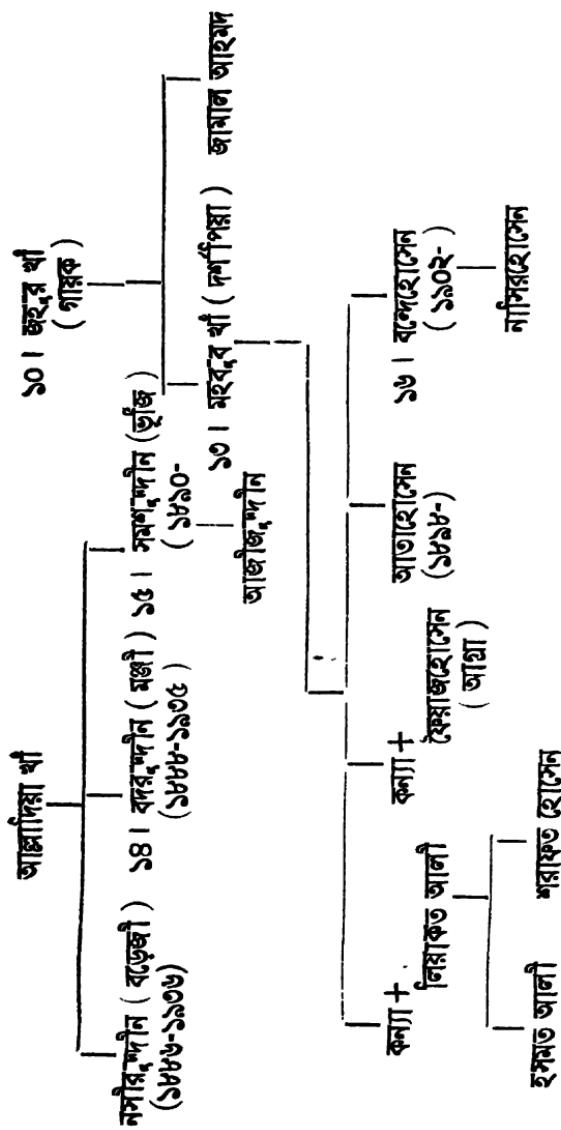
১। সাহাব খাঁ'র জন্ম হয় ঔরঙ্গাবাদে। এঁদের পূর্বপুরুষ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫—১৬২৭) ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতিগুণী ধ্রুপদ-ধামার গায়ক ছিলেন।

২। হোসেন খাঁর জন্ম হয় অত্রোলিতে। ইনি অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

৩। এঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। 'মানতোল' এঁর উপাধি যা রামপুরের নবাব কাশিম আলী দিয়েছিলেন। এঁর পুত্র করিমবক্সও উত্তম সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

৪। ইমামবক্স অতিগুণী ধ্রুপদীয়া এবং জোধপুরের মহারাজা মানসিংয়ের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সেকেন্দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ গায়ক কবি রমজান খাঁ'র গুরু ছিলেন। এঁর বংশধরেরা উদয়পুরে বসবাস আরম্ভ করেন।

৫। খৈরাতী খাঁ বংশীয় গুরুজন ছাড়াও (১৭) দুল্লু খাঁ ও ছজ্জু খাঁর কাছে তালিম পান। ইনি উত্তম গায়ক এবং উনিয়ারের ঠাকুর সাহাব বিশন-সিংয়ের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। খ্বাজাআহমদ খাঁ উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং জয়পুর তথা বহু রাজদরবারে নিযুক্ত থেকেছেন।

৭। জাহাঙ্গীর খাঁ উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং জয়পুর, টংক ও উনিয়ারের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আল্লাদিয়া খাঁ এঁর কাছেই বিশেষ-ভাবে তালিম পেয়েছেন।

৮। করিমবক্স উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং ঠাকুর সাহাব ফতেসিংয়ের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৯। অজমত হোসেন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে ইনি বড়োদা রাজদরবারে প্রথম শ্রেণীর গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি মৈকশ ছদ্ম নামে উর্দূ এবং দিলরঙ্গ ছদ্ম নামে হিন্দী কবিতা লিখতেন। ইনি কতগুলি রাগভিত্তিক সংগীতও রচনা করেছেন। এঁর শিষ্য—নলিনী বোরকর, দুর্গাবাঈ শিরোড়কর, টি. এল. রাজু, মানিক ভর্মা।

১০। জহুর খাঁ উত্তম ধ্রুপদীয়া এবং জোধপুরের মহারাজা মানসিংয়ের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

১১। বশীর খাঁ উত্তম সংগীতজ্ঞ তথা হারমনিয়ম বাদক ছিলেন। এঁর শিষ্যা—অর্পণা চক্রবর্তী, দীপালি নাগ চৌধুরী।

১২। আল্লাদিয়া খাঁ অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং বিভিন্ন রাজা-মহারাজার দরবারে নিযুক্ত তথা বম্বে নিবাসী ছিলেন। এঁর শিষ্য—ইনায়ত হোসেন (সহসবান), কেশরবাঈ কেরকর, গোবিন্দ বুয়া শালিগ্রাম, দীলিপচাঁদ বেদী, বরকতুল্লা খাঁ (তানসেন বংশ), মোঘুবাঈ, সেখদাউদ।

১৩। মেহবুব খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ, দর্শপিয়া ছদ্মনামে সংগীত রচয়িতা এবং তানরস খাঁর শিষ্য ছিলেন। বংশধরদের এবং জামাতাদের ইনি তালিম দিয়েছেন।

১৪। বদরুদ্দীনের শিষ্য—মল্লিকার্জুন মনসুর, মহমুদ ভাই শেঠ।

১৫। সমশুদ্দীনের শিষ্য—অনন্ত মনোহর যোশী, কানেটকর, গজাননরাও যোশী, মোঘুবাঈ।

১৬। বন্দেহোসেন গুণী সংগীতজ্ঞ (দিল্লী বেতার শিল্পী)। ইনি ঘরাণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করে গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

১৭। ডুল্লু খাঁ ও ছজ্জু খাঁ অত্রৌলি নিবাসী এবং অতিগুণী সংগীতজ্ঞ তথা উনিয়ারের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

[ক] সমাপুর ঘরাণা (দিল্লী)

দিল্লী ঘরাণার বৈশিষ্ট :

১। খেয়াল গানের বৈচিত্র্যপূর্ণ বন্দীশ।

২। বিলম্বিত খেয়ালের বহুবিচিত্র রচনা বৈশিষ্ট্য।

৩। বিচিত্র স্বরবিন্যাস সহযোগে গায়ন রীতি।

৪। বহু বিচিত্র লয়কারী সহযোগে তান প্রয়োগরীতি।

৫। আকার যুক্ত দ্রুত তানের স্বতন্ত্র প্রয়োগ রীতি।

(ক) 'সমা' একটি আরবী শব্দ, এর অর্থ আলো, জ্ঞান, সংগীত প্রভৃতি। এই সংগীতজ্ঞ বংশের বসবাস থেকেই নাকি উক্ত স্থানের এই নামকরণ হয়।

মহম্মদ বীন কাশিম, যিনি ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁর বংশোদ্ভব নাকি এই ভ্রাতৃদ্বয় :—
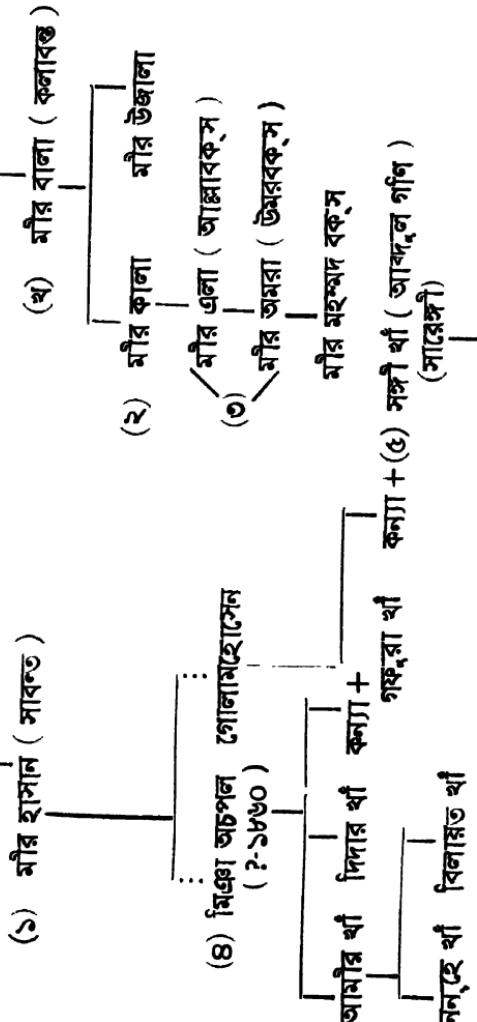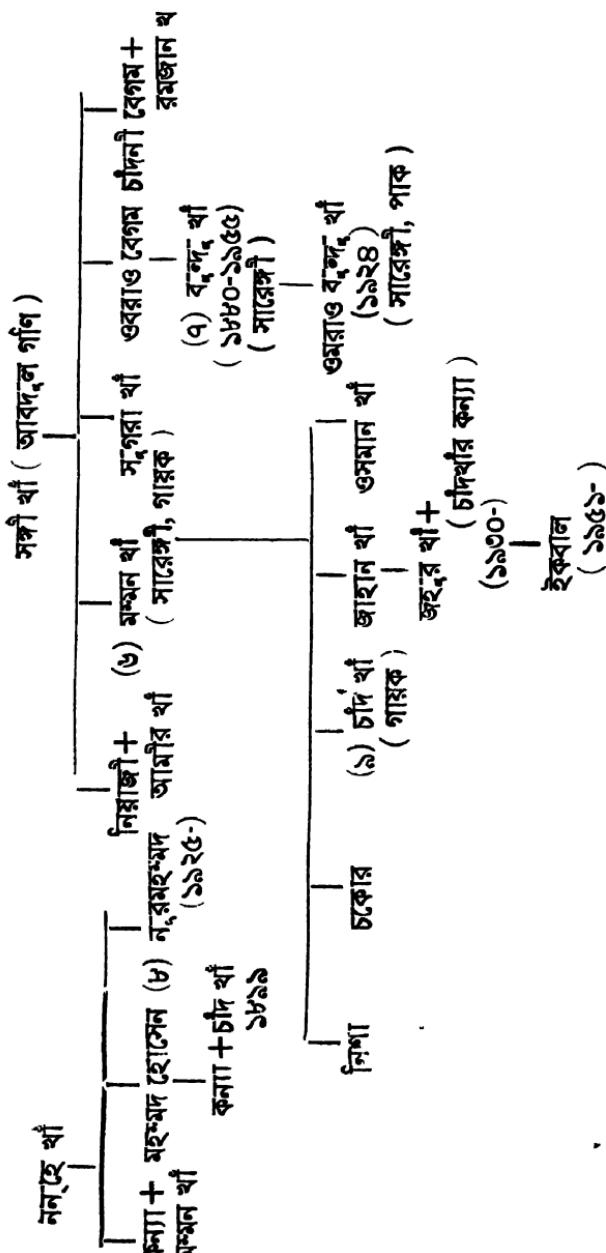
(খ) মীর শব্দটি আরবী মীরাসী শব্দের অপভ্রংশ। মীরাসীর অর্থ ধন, সম্পদ বা গুণবান।

এই বংশের অধিকাংশ তথ্যাদি (৯) ওস্তাদ চাঁদ খাঁ এবং (৮) ওস্তাদ নূরমহম্মদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১। এই ভ্রাতৃদ্বয় অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং সুলতান সমশুদ্দীন অলতমসের (১২১১—১২৩৬) দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান মীরহাসানকে 'সাবন্ত' এবং মীরবালাকে 'কলাবন্ত' উপাধি দান করেছিলেন।

মীর হাসান ছিলেন স্থফী প্রকৃতির, তাই কিছুকাল পরে ইনি দরবার ত্যাগ করে দরগায় আশ্রয় নেন। সেখানে, ইনি কাওয়ালি গাইতেন। পরবর্তীকালে তাই এঁর বংশধরদের 'কব্বলে বচ্চে' বলা হোত। (অবশ্য এবিষয়ে মতভেদ আছে)।

২। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত নাম জানা যায় না। এই নামকরণ এঁদের গায়ন দক্ষতার জন্য হয়েছিল। কারণ মীরকালা রাত্রিকালের এবং মীরউজালা দিবাভাগের রাগগায়নে পারদর্শী ছিলেন।

৩। মীর এলা ও মীর অমরা গুণী সংগীতজ্ঞ এবং বল্লভগড়ের মহারাজা নাহার সিংয়ের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। আর মীর মহম্মদ বক্স মহারাজা লোহারু'র রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৪। মিঞা অচপল দিল্লীর নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী এবং অতি উচ্চস্তরের সংগীত রচয়িতা ও স্রষ্টা গায়ক শিল্পী ছিলেন। ইনি দিল্লীর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বহু শিষ্যকে তালিম দিয়েছেন, যার মধ্যে অতিগুণী তানরস খাঁ উল্লেখযোগ্য।

৫। সঙ্গী খাঁ অতিগুণী গায়ক এবং বল্লভগড়ের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। মম্মন খাঁ অতিগুণী গায়ক ও সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। ইনি পতিয়ালা ষ্টেটে নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা সকলেই বংশধরদেরই তালিম দিয়েছেন।

৭। বুন্দু খাঁ অতিগুণী সারেঙ্গী বাদক ছিলেন। বংশীয় আত্মীয়দের ছাড়া ইনি আমীর আহমদ অলবী, ছোটে খাঁ, তুরুখ সিং, পি. এন. নিগম, মজীদ খাঁ, মহম্মদ সাগীরুদ্দীন খাঁ প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

৮। নূরমহম্মদ গুণী গায়কশিল্পী এবং দিল্লী আকাশবাণী কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

৯। চাঁদ খাঁ 'সংগীত মার্তণ্ড' উপাধিপ্রাপ্ত অতিগুণী গায়কশিল্পী। বংশীয়দের ছাড়া ইনি অমিয় প্রকাশ ঘোষ (রাঁচি), ইকবাল বানু (পাক), কমল ও বিজয়লক্ষ্মী সায়গল, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, খুর্শিদ মেহতা সিং, জে.বি. মোথিয়াল রাও (Dy Minister, A. P.), নিসার আহমদ (পাক), নিজাম আহমদ (পাক), ফারুখ মির্জা, পণ্ডিত ভগবত শরণ শর্মা, পদ্মরঙ্গ নাথন,

সাহাব সিং, নিরঞ্জন, মিণ্টু, সিণ্টু ও সুষমা দাস, জগদীশ প্রকাশ কমর (শানাই), শংকর-শম্ভু (কাওয়াল) (বম্বে), সতীশপ্রকাশ (সানাই), হৈজলীচরণ প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।
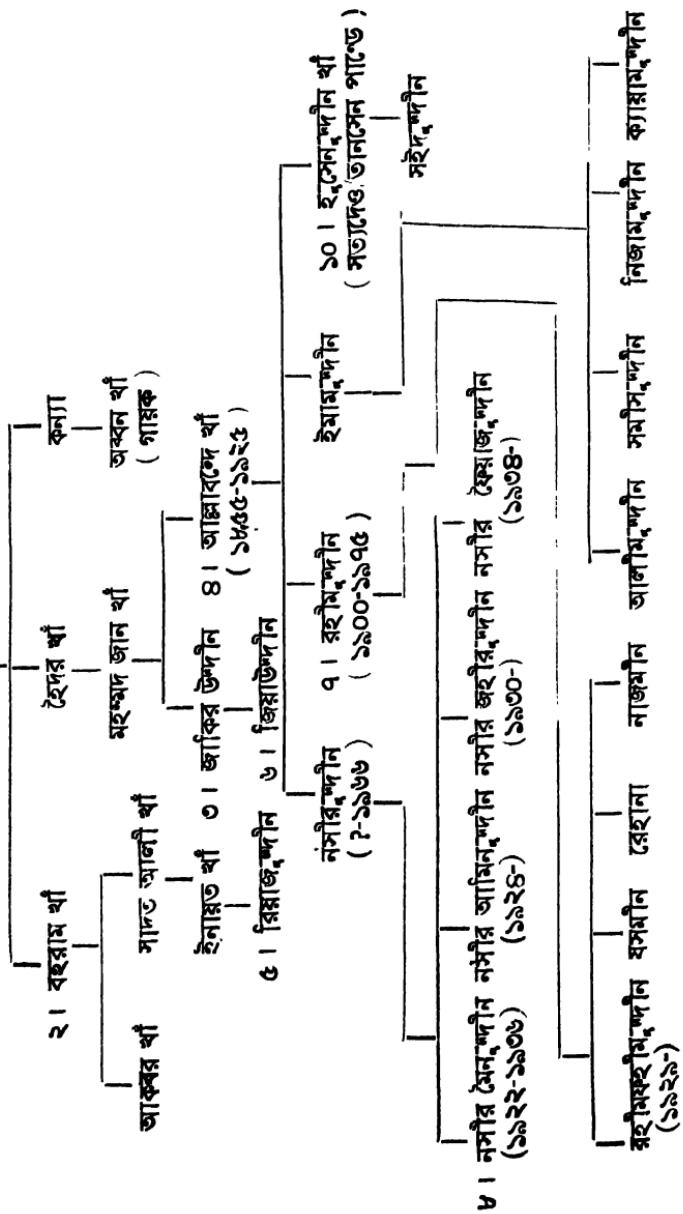
১। ইমাম বক্‌স খাঁ'র জন্ম হয় অত্রৌলিতে। এঁর পূর্বপুরুষ হরিদাস ডাগুর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ কথিত আছে।

২। বহরাম খাঁ'র জন্ম হয় শাহারামপুরের অম্বেঠা গ্রামে। ইনি অতিগুণী সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত, ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে পারদর্শী তথা জয়পুর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি গোকিবাঈ, ফরীদ খাঁ, বন্দে-আলী খাঁ (কিরাণা), মিঞাকালু, মৌলাবক্‌স প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

৩। জাকিরুদ্দীন ও ৪। আল্লাবন্দে খাঁ বংশীয় গুরুজনদের কাছে তালিম পান। এঁরা উত্তম শাস্ত্রজ্ঞানী তথা অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ইনি বিভিন্ন সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁরা বন্দেআলী খাঁ'র দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। বস্তুত ৩। জাকিরুদ্দী খাঁ'র সময় থেকেই উদয়পুর ঘরাণার প্রবর্তন হয়, কারণ ইনি শেষ বয়সে উদয়পুর দরবারেই ছিলেন। বংশধর ছাড়াও এঁরা অনেককে সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন।

৫। রিয়াজুদ্দীন ও ৬। জিয়াউদ্দীন অতি উত্তম সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা বংশধরদের ছাড়া প্রসিদ্ধ মৈজুদ্দীন খাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।

৭। রহীমুদ্দীন খাঁ অতিগুণী ধ্রুপদীয়া এবং দিল্লী বেতার শিল্পী। ইনি লেখককে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইনি জয়পুর, ইন্দোর, অলবর প্রভৃতি রাজদরবারে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন।

৮। মৈনুদ্দীনের শিষ্য—বংশধরেরা এবং গঙ্গাধর ঝাবর ও নিমাইচাঁদ বড়াল।

৯। ফহীমুদ্দীন উত্তম ধ্রুপদীয়া ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন। লেখককে ইনি এবং এঁর ভগ্নিরা ঘরাণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন।

১০। হুসেনুদ্দীনের শিষ্য—কেতকী ঘোষ ও নিমাইচাঁদ বড়াল।

জয়পুর ঘরাণা (১ম)

জয়পুর ঘরাণার বৈশিষ্ট্য :

১। স্বর প্রয়োগের স্বতন্ত্র রীতি।

২। উদাত্ত কণ্ঠস্বর যুক্ত গীতরীতি।

৩। আলাপকালে ছোট ছোট তানসহ বড়ত ফিরত।

৪। বক্রতানের প্রাধান্য এবং সংক্ষিপ্ত বন্দিশ।

৫। খেয়াল গানের স্বতন্ত্র বন্দিশ বৈশিষ্ট্য।
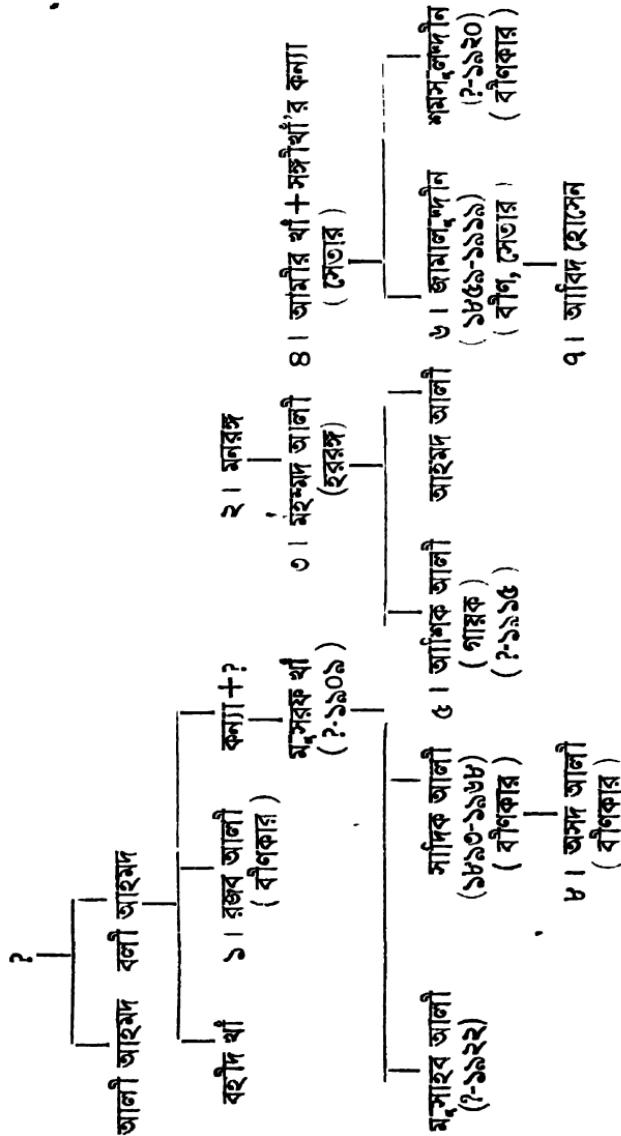
১। রজব আলীর জন্ম হয় আলীগড় নামক স্থানে। ইনি অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং বীণা, সেতার, দিলরুবা প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র বাদনে সুনিপুণ ছিলেন। ইনি তামঝামিয়ার ইনায়ত হোসেন ও আম্বোঠের হসন খাঁ'র কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি জয়পুরের মহারাজা রাম সিংহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

২। মনরঙ্গ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ সদারঙ্গের শিষ্য ছিলেন। ইনি অতি উত্তম গায়ক শিল্পী তথা সংগীত রচয়িতা ছিলেন। 'মনরঙ্গ' ছদ্মনামে ইনি বহু গান রচনা করেছেন। এঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না।

৩। মহম্মদ আলী ছিলেন মনরঙ্গের পৌত্র। ইনি অতিগুণী গায়কশিল্পী এবং জয়পুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য—বংশধরেরা এবং দুর্গাবাঈ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, হরিবল্লভ আচার্য।

৪। আমীর খাঁ অতিগুণী সেতারী ছিলেন। বংশধরদের ছাড়া ইনি সুবিখ্যাত হাফিজআলী খাঁকে তালিম দিয়েছেন।

৫। আশিক আলী অতিগুণী গায়ক শিল্পী এবং মহারাজা রামসিংহের পুত্র মহারাজা মাধোসিংহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া কিশনগড়, রামপুর প্রভৃতি রাজদরবারেও এঁর অসাধারণ সমাদর ছিল। এই ভ্রাতৃ-দ্বয়ের কাছেও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

৬। জামালুদ্দীন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং বড়োদার মহারাজা সিয়াজীরাও গায়কোয়ারের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। গুণপনার জন্য ইনি 'বীণাবিনোদ' উপাধিলাভ করেন।

৭। আবিদ হোসেন অতিগুণী বীণকার এবং অল্প বয়স থেকেই বড়োদার রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ইনি জংজীরার নবাবের বিশেষ অনুরোধে সেখানে নিযুক্ত হন।

৮। অসদ আলী উত্তম বীণকার এবং দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এই ঘরাণার তথ্য সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

জয়পুর ঘরাণা ২য়
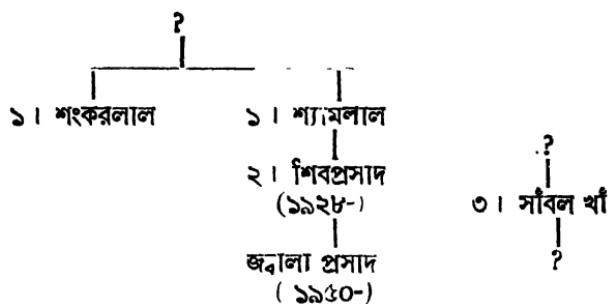
১। শংকরলাল ও শ্যামলাল অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা একাধারে গীত, নৃত্য ও বাদ্য সকল বিষয়েই পারদর্শী এবং জয়পুর রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

২। শিবপ্রসাদ গুণী সংগীতজ্ঞ এবং দিল্লী আকাশবানীতে সংগীত প্রযোজক রূপে নিযুক্ত আছেন। ইনি চিত্র জগতের সঙ্গেও যুক্ত এবং কিছু পরিচালনার কাজও করেছেন। এই ঘরাণার তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

৩। সাঁবল খাঁ অতিগুণী বীণকার এবং জয়পুর মহারাজ মাধোসিংহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি প্রাচীন পন্থী এবং সর্ব বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত প্রভাবশালী কলাকার এবং সুসংস্কৃত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

মথুরা ঘরাণা
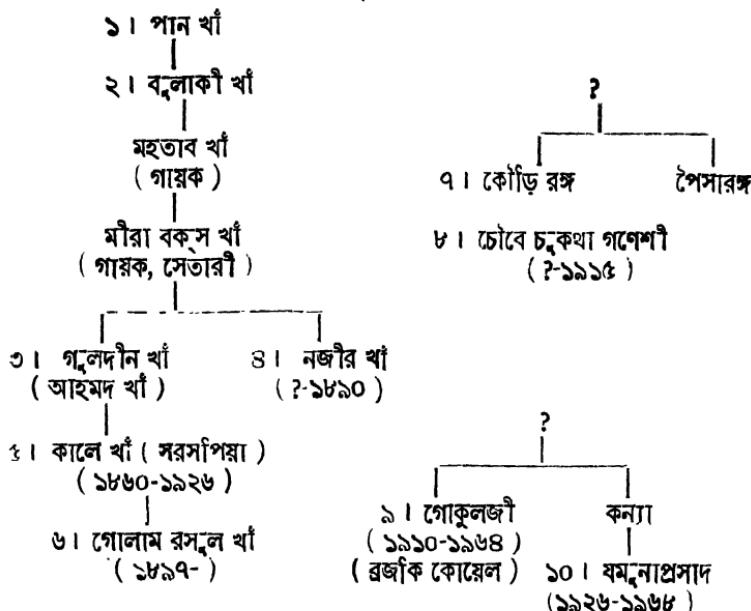
১। পান খাঁ অতিগুণী গায়ক এবং মথুরা নিবাসী। ইনি নবাব নবীখাঁ'র দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

২। বুলাকী খাঁ অতি উত্তম গায়ক তথা শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ছিলেন।

৩। গুলদীন খাঁ অতিগুণী গায়ক ও সেতারী এবং লুনাবরা রাজ্যের সভাগায়ক ও রাজগুরু ছিলেন।

৪। নজীর খাঁ বংশীয় গুরুজন ছাড়াও আমীর বক্সের (গোঁদপুর) কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি অতিগুণী সেতারী এবং বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন।

৫। কালে খাঁ অতি উত্তম গায়ক তথা সংগীত রচয়িতা ছিলেন। সরসপিয়া নামে ইনি বহু সংগীত রচনা করেছেন। সেতার আদি অন্যান্য যন্ত্রেও এঁর যথেষ্ট দখল ছিল।

৬। গোলাম রসুল খাঁ অতিগুণী গায়ক ও সংগীতবিদ্বান এবং ইন্দোর সংগীত-শালাতে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে বড়োদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

৭। কৌড়িরঙ্গ ও পৈসারঙ্গ ভ্রাতৃদ্বয় অতিগুণী গায়ক এবং ১৮শ শতাব্দীতে মথুরার সুবেদার নবাব নবী খাঁ'র দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৮। চৌবে চুক্থা গণেশী অতিগুণী গায়ক তথা সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি নেপাল রাজদরবারে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন, এছাড়া কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানেও ইনি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

৯। গোকুলজী অতি উত্তম গায়ক শিল্পী এবং উত্তর প্রদেশের গভর্ণর দ্বারা "ব্রজকি কোয়েল" উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন।

১০। যমুনাপ্রসাদ উত্তম গায়ক ও সংগীত বিদ্বান ছিলেন।

জগমন মিশ্র
দিলারাম মিশ্র
১। ঠাকুরদয়াল মিশ্র
২। মনোহর মিশ্র
(?-১৮৩৭)
২। হরিপ্রসাদ মিশ্র
(প্রসিদ্ধ)
(১৮০২-১৮৬২)
২। বিশেশ্বর মিশ্র
(গায়ক)
৩। রামকুমার মিশ্র
(গায়ক, বীণকার)
কন্য + ?
শিবসহায় মিশ্র
রামসেবক মিশ্র
৮। লছমীপ্রসাদ
(১৮৬০-১৯২৯)
গোবিন্দ দাস
৫। ঠাকুর প্রসাদ
কন্যা + ?
ছোটে রামদাস
৬। পশুপতি সেবক
(১৮৮১-১৯৩১)
৭। শিবসেবক
(১৮৮৪-১৯৩৩)
৯। বন্দি মিশ্র
(তবলা)
চমরু মিশ্র
(সারেঙ্গী)
দুর্গা মিশ্র
(তবলা)
দামোদর মিশ্র
(গায়ক)
১০। রামকিষণ
মারুতি সেবক
(মিট্ঠুলাল)
ভবানীসেবক
বিষ্ণুসেবক

১। ঠাকুরদয়াল সোনপুরা নামক স্থানের অধিবাসী। সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের শিষ্য এবং পরম সংগীত সাধক ছিলেন। ইনি অতিগুণী গায়ক তথা তবলা বাদক ছিলেন।

২। মনোহর, প্রসিদ্ধ ও বিশ্বেশ্বর ভ্রাতৃত্রয় অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী ও শ্রুতিধর এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। এঁরা মোগল তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দরবারী গায়ক শিল্পী রূপে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন।

৩। রামকুমার অতিগুণী গায়ক ও বীণকার ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় ইনি কলকাতার কালীচরণ ঠাকুরের কাছে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৪। রামসেবক উত্তম গায়ক ও তবলা বাদক ছিলেন। এঁর শিষ্য— বুন্দি মিশ্র

৫। ঠাকুর প্রসাদ উত্তম সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর শিষ্য—ছোটে রামদাস (নাতি)।

৬। পশুপতি সেবক বংশীয় গুরুজন ছাড়া মহম্মদ হোসেনের (সহসবান) কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং পরম ভক্ত প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

৭। শিবসেবক বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনায়ত হোসেনের (সহসবান) কাছে তালিম পেয়েছেন। ইনি উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং বহুকাল কলকাতায় ছিলেন। এঁর শিষ্য—১১। বিজয়দাস পাকড়ে (সেতার), মহারাজ কুমার শীতাংশু কান্ত আচার্য, সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার।

৮। লছমীপ্রসাদ অতিগুণী গায়ক, বীণকার তথা পাখোয়াজী ছিলেন। ইনি নেপাল তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সভাসংগীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি কলকাতার কালীচরণ ঠাকুরের কাছে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য—১২। অনাথ বসু, ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, বুন্দি মিশ্র, মাণিকলাল হালদার, সতীশচন্দ্র অর্ণব।

৯। বুন্দি মিশ্র ছিলেন অতিগুণী তবলীয়া। ইনি (মামা) রামসেবক (মামাতোভাই) লছমীপ্রসাদ ও (জ্যেষ্ঠ তাত) শ্যামাপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সংগীত শিক্ষা পেয়েছেন।

১০। রামকিষণ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর শিষ্য—জ্যোতিকিশোর আচার্য চৌধুরী।

১১। বিজয়দাস পাকড়ে'র শিষ্য—রবি সেন, রেখা সেন।

১২। অনাথ বসু'র শিষ্য—সুবোধ নন্দী।

২য় বেনারস ঘরাণা (তবলা)

১। দীনুমিশ্র অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলা বাদক এবং বেনারসের অধিবাসী ছিলেন।

২। বিহারী মিশ্র অতিগুণী সারেঙ্গী ও তবলা বাদক।

৩। মৌলবীরাম ছিলেন অতিগুণী তবলা বাদক। এঁর শিষ্য—অমৃতলাল মিশ্র (দ্বারভাঙ্গা), উপেন্দ্রচন্দ্র রায় (মৈমনসিং), বিপিনচন্দ্র রায় (মুক্তাগাছা), হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর), রামকৃষ্ণ কর্মকার (মুক্তাগাছা), সুবোধচন্দ্র রায় (মৈমনসিং)।

৪। ভৈরবপ্রসাদ অতিগুণী তবলীয়া এবং অতি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। এঁর শিষ্য—৫। আনোখেলাল, নাগেশ্বর প্রসাদ, মহাদেব মিশ্র, মহাবীর চাঁদ, মৌলবীরাম।

৫। আনোখেলাল ছিলেন বিশ্বখ্যাত তবলীয়া। এঁর শিষ্য মহাপুরুষ মিশ্র, রাধাকান্ত নন্দী, রামজী মিশ্র।

৩য় বেনারস ঘরাণা (সারেঙ্গী)
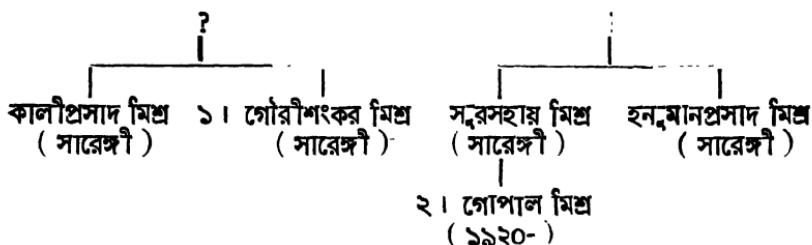
১। গৌরীশংকর অতিগুণী সারেঙ্গী-বাদক এবং বেনারসের অধিবাসী ছিলেন। এঁর শিষ্য—ডাঃ দীনা রায় (সারেঙ্গী), মায়া রায় (এস্রাজ), ইন্দুবালা (ইনি ছন্নু মিশ্রের কাছেও তালিম নিয়েছেন), সতীশচন্দ্র ঘোষ।

২। গোপাল মিশ্র অতিগুণী সারেঙ্গী-বাদক এবং কাশীর অধিবাসী ছিলেন। ইনি বেনারসের বড়ে রামদাসজীর শিষ্য। ইনি বেনারসের কবীর চৌরাতে পরবর্তী জীবন কাটিয়েছেন।

৪র্থ বেনারস ঘরাণা (সানাই)

১। অল্লন খাঁ (আলী বক্স) — ২। মিঞা বিলাতু (বিলায়ত খাঁ) — সাদিক আলী — কন্যা + ৩। পয়গম্বর বক্স

মিঞা বিলাতু → কন্যা + ৫। বিসমিল্লা খাঁ (১৯০৮-)

সাদিক আলী → ৪। শের আলী (সানাই) → আলী মহম্মদ

কন্যা + ৩। পয়গম্বর বক্স → শমসুদ্দীন, ৫। বিসমিল্লা খাঁ + বিলাতু-কন্যা
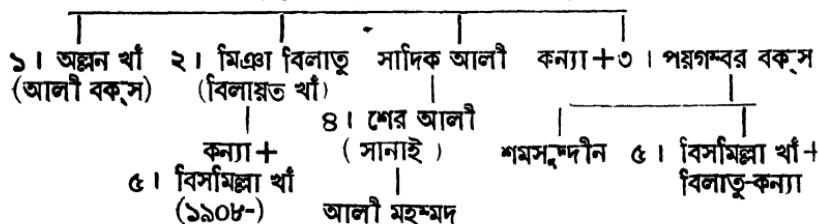
১। অল্লন খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং ভোজপুর রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই প্রথমে শমসুদ্দীন ও বিসমিল্লা (নাতিদ্বয় কে) সংগীত শিক্ষা দেন।

২। মিঞা বিলাতু অতিগুণী সানাই বাদক এবং ভোজপুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। বংশধরদের ইনি তালিম দেন।

৩। পয়গম্বর বক্স অতিগুণী সানাইবাদক এবং ভোজপুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৪। শেরআলী উত্তম সানাইবাদক ছিলেন। ইনি পুত্র আলীমহম্মদ এবং ভায়রাভাই সুলতানকে (দেওঘরের বিখ্যাত শানাই বাদক) তালিম দিয়েছেন।

৫। বিশ্ববিখ্যাত বিসমিল্লা অতিগুণী সানাই বাদক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ইনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। এঁর অজস্র শিষ্য এবং রেকর্ড আছে।

৫ম বেনারস ঘরাণা (তবলা)
?
১। রামদাস সহায় (১৮৩০-১৯১৩)
জানকী সহায়
গৌরী সহায়
২। ভৈরব সহায়
৩। বলদেব সহায়
৪। কণ্ঠে মহারাজ (১৮৮০-১৯৬৯)
কন্যা + হরি মহারাজ
৫। নন্নে (দুর্গা) সহায় + কন্যা (সুরদাস) (১৮৯২-১৯২৬)
কিষণ মহারাজ (১৯২৩-১৯৬৬)
পূরণ মহারাজ (১৯৫৪-)
৬। মহারাজ প্রতাপ মিশ্র
মহারাজ জগন্নাথ মিশ্র
শিবসুন্দর
৭। হরিসুন্দর (বাচাগুরু) (১৮৭০-১৯২৬)
৮। সামতাপ্রসাদ (গুদই মহারাজ) (১৯২১-)
কুমার
কৈলাস

১। রামদাস সহায় লক্ষ্ণৌর মথ্থু খাঁর শিষ্য এবং বেনারস ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন। ইনি অতিগুণী তবলীয়া এবং বেনারসের অধিবাসী ছিলেন। এঁর শিষ্য—জানকী সহায় (ভ্রাতা), ৬। প্রতাপ মিশ্র, ২। ভৈরব সহায় (ভ্রাতুষ্পুত্র), ভৈরব প্রসাদ, যদুনন্দন, রঘুনন্দন।

২। ভৈরব সহায়ের শিষ্য—৫। নান্নে সহায়, ৬। প্রতাপ মিশ্র, বীরু মিশ্র, বলদেব সহায় (পুত্র)।

৩। বলদেব সহায়ের শিষ্য—৪। কণ্ঠে মহারাজ।

৪। কণ্ঠে মহারাজের শিষ্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, কিষণ মহারাজ (ভাগিনেয়), কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু), রমানাথ মিশ্র, ৮। সামতা প্রসাদ।

৫। নান্নে সহায়ের শিষ্য—নাটুবাবু, ৭। বাচাগুরু, বিক্কু মহারাজ, শ্যামলাল (ছম্মাগুরু)।

৬। প্রতাপ মিশ্রের শিষ্য—জগন্নাথ (পুত্র), শিবসুন্দর ও হরিসুন্দর (পৌত্র)।

৭। বাচাগুরু অতিগুণী তবলীয়া এবং তৎকালীন অতিগুণী নথু খাঁ (দিল্লী), আজীম খাঁ প্রমুখের মিত্র ছিলেন।

৮। সামতাপ্রসাদ পিতা ও বিক্কু মিশ্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর শিষ্য—চন্দ্রকান্ত কামঠ, জিরুল মসী, নবকুমার পাণ্ডা, বসন্ত পাবর, মানিকলাল দাস, মাণিক পোপটকর, সত্যনারায়ণ বশিষ্ঠ।

১ম মোরাদাবাদের সংগীতজ্ঞ
১। গফুর খাঁ (?-১৯৪৫)
মৌলবী
২। কালে নজীর খাঁ (?-১৯৪৮)
৩। ছজ্জু খাঁ (?-১৯২২)
নজীর খাঁ
বিলায়ত খাঁ
৪। খাদিম হোসেন
কালিয়া করিম বক্স (গায়ক)
মুবারক আলী
চন্দু খাঁ (পোষ্যপুত্র)
কন্যা+ মহবুব খাঁ
৬। আমান আলী
৫। তোলাবাবা+ (বলি আহমদের কন্যা) (গায়ক)
৮। পড্ডন খাঁ (মমতাজ আলী) (১৯৩১-)
৯। সব্বন খাঁ (১৯৩৩-)
৭। মহম্মদ খাঁ (?-১৯৩৪) (গায়ক)
বল্লু খাঁ (সারেঙ্গী)
১১। আলীবক্ক (ভেলী) (সারেঙ্গী)
মুবারকহোসেন (চেলো, সারেঙ্গী) (১৯১২-)
মুনসী খাঁ ১৯১৫-১৯৫৫
১০। আলীহোসেন (চেলো) (১৯১৯-)
মকবুলহোসেন (তবলা) (১৯২২-)
১২। গোলাম আহমদ (১৯১৪-১৯৭২) (তবলা)
ছজ্জু খাঁ (সারেঙ্গী)
১৩। মেহেদীহোসেন (তবলা) ১৯৩২-
সলামত
করামত
জিন্দাহোসেন (১৯৫০-) (তবলা)
বন্দেহোসেন (১৯৫২-)
গোলাম দস্তগীর (১৯৩৮-) (সেতার)
১৪। আহমদ রজা খাঁ (১৯১৩-) (বীণ, সারেঙ্গী)
গোলাম মুস্তাফা (১৯৩৯-) (বীণ)

১। গফুর খাঁ ও ২। কালে নজীর খাঁ মোরাদাবাদ নিবাসী, আগ্রার কল্লন খাঁর শিষ্য এবং অতিগুণী গায়ক শিল্পী, এঁরা রামপুর ষ্টেটে নিযুক্ত ছিলেন।

৩। ছজ্জু খাঁ ও নজীর খাঁ মোরাদাবাদ নিবাসী, সহসবানের ইনায়ত্ত হোসেনের শিষ্য এবং অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। ছজ্জু খাঁ তো সমগ্র ভারতজোড়া খ্যাতিবান ছিলেন। এঁর বহু শিষ্য ছিল যাঁদের মধ্যে কিরাণার সারেঙ্গী বাদক সহমীর খাঁ ও প্রসিদ্ধ মম্মন খাঁ (সমাপুর) উল্লেখযোগ্য।

৪। খাদিম হোসেন আগ্রার কল্লন খাঁ'র শিষ্য তথা উত্তম গায়ক শিল্পী ছিলেন।

৫। তোলাবাবা আগ্রার নথন খাঁর শিষ্য এবং উত্তম সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

৬। আমান আলী অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—শিবকুমার শুক্ল (বম্বে), রমেশ নটকর্নী (ইন্দোর)।

৭। মহম্মদ খাঁ বলিআহমদের (দাদু) কাছে তালিম পান। ইনি উত্তম গায়ক ছিলেন।

৮। লড্ডন খাঁ অতিগুণী সারেঙ্গী-বাদক এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

৯। সব্বন খাঁ উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ এবং দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

১০। আলীহোসেন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি দিল্লী বেতার কেন্দ্রে চেলো বাদক রূপে নিযুক্ত আছেন। ঘরাণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ইনি লেখককে সাহায্য করেছেন।

১১। আলীবক্স মোরাদাবাদের একজন সুপ্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক ছিলেন।

১২। গোলাম আহমদ উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং তবলা বাদকরূপে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন।

১৩। মেহদীহোসেন উত্তম তবলা বাদক এবং লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

১৪। আহমদ রজা খাঁ উত্তম বীণ ও সারেঙ্গী-বাদক এবং দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এই বংশের তথ্য সংগ্রহে লেখককে ইনি সাহায্য করেছেন।

২য় মোরাদাবাদের সংগীতজ্ঞ
মৌলাবক্‌স (মল্লুদ খাঁ)
(সারেঙ্গী)
কলন্দর খাঁ +
ফৈয়াজ খাঁ'র ভগ্নি
১। হাজি মহম্মদ খাঁ
(সারেঙ্গী)
কমাল খাঁ
অল্লন খাঁ
২। হোসেন বক্‌স
(সারেঙ্গী)
কন্যা + ৪। ছজ্জদ খাঁ
(১৯০২-১৯৬২)
রাজা হোসেন
(সারেঙ্গী)
ইয়ুসুফ খাঁ
৩। আহমদজান থিরকুয়া
(১৮৯১-১৯৭৬)
(তবলা)
মহম্মদজান
৫। সাবরি হোসেন
(১৯২৭-)
গোলাম সরবর
(১৯৪৯-)
৬। নবীজান
(১৯১৪-)
৭। মহমদ্দ জান
(১৯১৭-)
আলীজান
(১৯২০-)
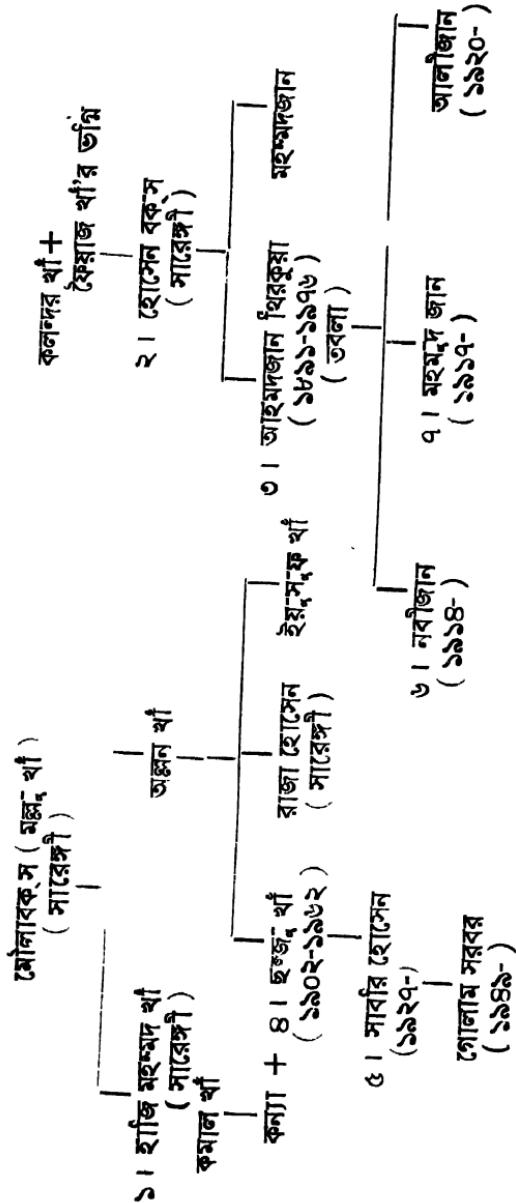
১। হাজি মহম্মদ অতিগুণী সারেঙ্গী-বাদক এবং নবীবক্সের শিষ্য ছিলেন।

২। হোসেন বক্স উত্তম সারেঙ্গী-বাদক এবং মোরাদাবাদ নিবাসী ছিলেন।

৩। বিশ্ববিখ্যাত আহমদজান থিরকুয়া অতিগুণী তবলীয়া এবং মুনির খাঁ'র (রায়গড়) (ফরাক্কাবাদ ঘরাণা) শিষ্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। এঁর শিষ্য—নিখিল ঘোষ, নারায়ণ গজানন যোশী (বম্বে), প্রেমবল্লভ (দিল্লী), রামকুমার শর্মা, লালজী গোখলে (বম্বে), সুধীর ভর্মা, সরদার খাঁ (দিল্লী)।

৪। ছজ্জু খাঁ অতিগুণী সারেঙ্গী-বাদক ছিলেন। ইনি বংশীয় গুরুজন ও ইনায়ত হোসেনের (সহসবান) কাছে তালিম পেয়েছেন।

৫। সাবরি হোসেন উত্তম সারেঙ্গী-বাদক এবং দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। য়ুরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ইতি প্রতিনিধিরূপে সংগীত সফর করেছেন। ঘরাণা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

৬। নবীজান উত্তম তবলা বাদকরূপে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। ইনিও গ্রন্থকারকে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

৭। মহমুদজান কবি ও সাহিত্যিক এবং সায়র রূপে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। ইনিও গ্রন্থকারকে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

খুর্জা ঘরাণা

১। নথে খাঁ'র পুত্র জোধে খাঁ গুণী সংগীতজ্ঞ এবং শিমরৌ নগরের রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর জন্ম দিল্লীর নিকটবর্তী সমসের নামক স্থানে হয়েছিল। শেষ জীবনে ইনি খুর্জাবাসী হন।

২। ইমাম খাঁ খুর্জার অধিবাসী ছিলেন। পিতা জোধে খাঁ এবং বংশীয় আর একজন গুণী সাহাব খাঁর কাছে ইনি সংগীত শিক্ষালাভ করেন। পরিণত বয়সে ইনি রামপুরের নবাব কলবে আলী খাঁ'র দরবারে নিযুক্ত হন।

৩। গোলাম হোসেন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং খুর্জার নবাব আজম আলী খাঁ'র দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

৪। জহুর খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ফরাসী, উর্দু, হিন্দী, ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা ও সংগীত রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। হিন্দী রচনায় এর ছদ্মনাম 'রামদাস' এবং ফরাসীতে 'মুসকিন' ছিল। বংশীয় গুরুজন এবং তানরস খাঁর কাছে ইনি সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন।

৫। আলতাফ হোসেন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ এবং নেপাল রাজ দরবারে নিযুক্ত

ছিলেন। বাংলা ও বিহারে এঁর বহু শিষ্য ছিল। পুত্রদ্বয়কেও ইনি উপযুক্ত তালিম দিয়েছেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গুরু ও শিষ্যবর্গ

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে 'চতুরপণ্ডিত', 'মঞ্জরীকার,' 'বিষ্ণুশর্মা' এবং প্রকৃত নামে অসংখ্য সংগীত তথা সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। সংগীত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এঁর অবদান সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

এঁর গুরুবর্গ :—তানসেন বংশীয় নিসারআলীর শিষ্য পরম্পরার গুণী শেঠ বল্লভদাস দমলজী, গোপাল জয়রাজগীর, জয়পুরের মহম্মদ আলী ও তাঁর দুই পুত্র আশীকআলী ও আহমদ আলী, আগ্রার মহম্মদ হোসেন ও বিলায়ত হোসেন এবং রাওজী বুয়া বেলবাঘকর।

এঁর শিষ্যবর্গ :—বাদীলাল শর্মা, ১। রবীন্দ্রলাল রায়, রাজা ভাইয়া পুঞ্ছওয়ালে, ২। শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, হেমেন্দ্রলাল রায়।

১। রবীন্দ্রলাল রায় উত্তম সংগীত বিজ্ঞান এবং লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের (বর্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ) প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইনি 'রাগ নির্ণয়' আদি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁর শিষ্য—মালবিকা (কন্যা), এ. কানন (জামাতা)।

২। শ্রীরতনজনকারের শিষ্য—কুমারেশ বসু, ক্ষিতিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, গোপাল বন্দোপাধ্যায়, চিদানন্দ নাগরকর, ৩। চিন্ময় লাহিড়ী, ৪। ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, সুনীল বসু, ৫। ডঃ সুমতী মুটাটকর।

৩। চিন্ময় লাহিড়ী অতিগুণী সংগীতজ্ঞ। এঁর শিষ্য—উমা মিত্র (দে), কালিপদ দাস, গৌরচন্দ্র বসাক, নীলরতন বন্দোপাধ্যায়, পরভীন সুলতানা, মীরা বন্দোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ননীগোপালের শিষ্য—ডঃ তৃপ্তা পুরোহিত।

৫। ডঃ সুমতী মুটাটকরের শিষ্য—অমল দাশগুপ্ত।

পণ্ডিত পলুষ্করের গুরু ও শিষ্যবর্গ

১। বিষ্ণু দিগম্বর পলুষ্কর
(১৮৭২-১৯৩১)
|
দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পলুষ্কর
(১৯২১-১৯৫৫)
|
বসন্তকুমার পলুষ্কর

১। বিষ্ণু দিগম্বরের গুরুবর্গ—রামকৃষ্ণ বারভে, বালকৃষ্ণ বুয়া।

১। এঁর শিষ্যবর্গ—২। অনন্ত মনোহর যোশী, এ. টি. হারলেকর, ৩। পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর, নারায়ণ রাও ব্যাস, বি. এন. ঠকার ৪। ডঃ বি. আর. দেবধর, ৫। বিনায়করাও পটবর্ধন, বামনরাও পাধ্যে বুয়া, গোখলে বুয়া, শংকররাও ব্যাস, মাষ্টার নৌরঙ্গ, ডি. ভি. পলুষ্কর (পুত্র), ভি. এ. কশালকর।

২। অনন্ত মনোহরের শিষ্য—৬। গজাননরাও যোশী (পুত্র), ৭। নন্দকিশোর

৩। ওঁকারনাথের শিষ্য—ডঃ প্রেমলতা শর্মা, পদ্মাকর নরহর বারভে, বলবন্তরাও।

৪। দেওধরের শিষ্য—কুমার গন্ধর্ব।

৫। বিনায়করাওয়ের শিষ্য—জে. বি. এস. রাও, সুনন্দা পট্টনায়ক, কে অবধানী (প্রফেসর, বেনারস), ভীমশংকর রাও।

৬। গজানন রাওয়ের শিষ্য—শ্রীপার্শেকর, ৮। ভি. জি. যোগ।

৭। নন্দকিশোরের শিষ্য—গোপাল কৃষ্ণ।

৮। ভি. জি. যোগের শিষ্য—শিশিরকণা ধর চৌধুরী।

শঙ্কর রাও পণ্ডিতের বংশ
বিষ্ণু পণ্ডিত
গোপাল পণ্ডিত
গণপতি পণ্ডিত
১। শংকর রাও পণ্ডিত (১৮৬৩-১৯১৭)
একনাথ পণ্ডিত
২। কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত (১৮৯৪-)
প্রঃ নারায়ণরাও পণ্ডিত
৩। প্রঃ লক্ষ্মণকৃষ্ণরাও পণ্ডিত
চন্দ্রকান্তরাও পণ্ডিত
সদাশিব পণ্ডিত

১। শংকর রাওয়ের গুরু—গোয়ালিয়রের নিসার হোসেন খাঁ।

২। এঁর শিষ্য—কাশীনাথ পন্থভুলে, গণপৎরাও গুপে, মহেশ্বর বুয়া, রাজাভাইয়া পুঞ্ছওয়ালে, রামকৃষ্ণ তৈলঙ্গ, ৪। রামকৃষ্ণ বুয়া বঝে।

২। কৃষ্ণ রাওয়ের গুরু পিতা

২। এঁর শিষ্য—পুত্রেরা এবং প্রঃ বিষ্ণুপন্থ চৌধুরী, রামচন্দ্র রাও সপ্তঋষি, পুরুষোত্তম রাও সপ্তঋষি, দত্তাত্রয় জোগলেকর, প্রঃ কেশবরাও সুরঙ্গে, একনাথ সারেলেকর, বিষ্ণু পুরুষোত্তম মানবলকর, সদাশিব রাও অমৃত ফলে, বিশ্বনাথ রিংগে, শ্রীমতী সুমন চৌধুরী, সীতারাম শরণ, বালকৃষ্ণ মস্থর কর, বলুয়া যোশী, শরৎচন্দ্র আরের কর।

৩। লক্ষণকৃষ্ণ ও চন্দ্রকান্ত ভ্রাতৃদ্বয় লেখককে ঘরাণা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। লক্ষণকৃষ্ণ সংগীত প্রডিউসর হিসাবে ১৯৬১ থেকে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে মীনাক্ষী নন্দা, রমা সোনী, ওমপ্রকাশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ইমদাদ খাঁ'র ঘরাণা
১। সুজান সিং
(গায়ক)
২। সাহেবদাদ খাঁ (হুন্দু সিং)
করিমদাদ খাঁ
৩। ইমদাদ খাঁ
(১৮৪৮-১৯২০)
বেগমবিবি
কন্যা
৪। ইনায়েত খাঁ +
(১৮৯৪-১৯৩৮)
৫। বসিরণ বিবি
বহিদ খাঁ
(১৮৯৬-১৯৩১)
কন্যা
কন্য +
মজিদ খাঁ
(বীণকার)
কন্যা +
লতিফ খাঁ
(বীণকার)
কন্যা
বব্বু খাঁ
গুল্লা খাঁ
নসীরণ বিবি +
মহম্মদ খাঁ
(বীণকার)
রইস খাঁ
(সেতার)
সরিফন বিবি +
আমীর খাঁ
(কিরাণা)
+ মহম্মদ সফি
৬। বিলায়েত খাঁ
(১৯২৮-)
সহজাদ খাঁ
রহীসন বিবি +
রাহী
ইমরত খাঁ
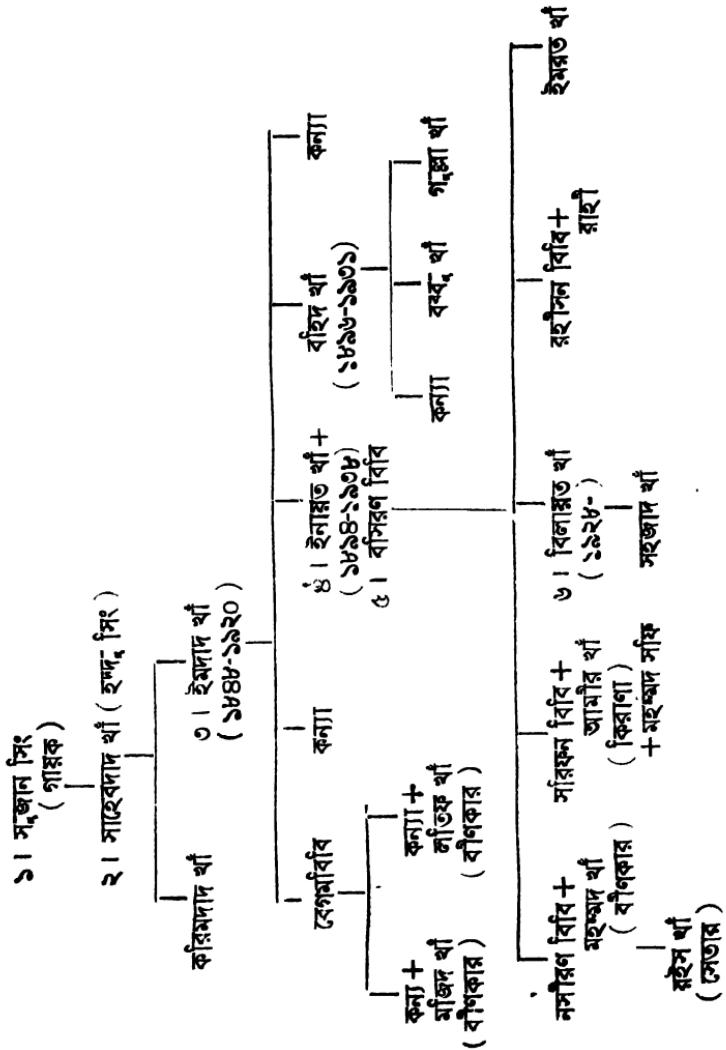
১। সুজান সিং বাদশাহ আকবরের দরবারে নিযুক্ত এবং অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন এইরূপ শোনা যায়।

২। সাহেবদাদ খাঁ অতিগুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ইনি ছিলেন উত্তম গায়ক শিল্পী তথা সারেঙ্গী ও জলতরঙ্গ বাদক। ইনি নথ্ খাঁ, নির্মল শাহ, হদ্দু খাঁ, হস্সু খা প্রমুখ অতিগুণী সংগীতজ্ঞের কাছে তালিম পান।

৩। ইমদাদ খাঁ নিজেই ঘরাণা সৃষ্টি করেছেন। ইনি পিতা এবং বন্দেআলী খাঁ, রজব আলী, সাজ্জাদ মহম্মদ প্রমুখের কাছে তালিম পেয়েছেন। বংশধরদের ছাড়াও ইনি ডঃ কল্যাণী মল্লিক, ডঃ প্রকাশ চন্দ্র সেন (এস্রাজ) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (এস্রাজ), মন্নন খাঁ (সারেঙ্গী) প্রমুখকে তালিম দিয়েছেন।

৪। ইনায়ত খাঁ পিতা এবং আল্লাদিয়া খাঁ, আল্লাবন্দে খাঁ, জাকিরুদ্দিন খাঁ, দৌলত খাঁ, সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ প্রমুখের কাছে তালিম পেয়েছেন।
এঁর শিষ্য—অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৮। জন গোমেশ, ৯। জিতেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ১০। জ্যোতিশচন্দ্র চৌধুরী (ভবানীপুর), জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী (কালিপুর), ১১। ধ্রুবতারা যোশী, ১২। বিপিনচন্দ্র দাস, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, বিরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর), বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর), বীরেন্দ্র মিশ্র, ব্রজেশ্বর নন্দী, ভোলানাথ মল্লিক, মনোজ মোহন রায়, ১৩। মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেণুকা সাহা, ১৪। শ্রীনিবাস নাগ, ১৫। শ্রীপতি দাস, হীরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত।

৫। বসিরণ বিবির পিতা বন্দেহোসেন খাঁ এবং ভ্রাতা জিন্দাহোসেন ছিলেন সাহারানপুরের খেয়ালিয়া বংশজাত।

৬। বিলায়ত খাঁ'র শিষ্য—অরবিন্দ পারেখ, ইমরত হোসেন খাঁ (ভ্রাতা), কল্যাণী রায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঞ্জামিন গোমেশ, অসমত আলী, ৭। রইসখা (ভাগ্নে)।

৮। জন গোমেশের শিষ্য—নিখিল বন্দোপাধ্যায়, বেঞ্জামিন গোমেশ (পুত্র), সুনীল মিত্র।

৯। জিতেন্দ্র মোহনের শিষ্য—১৫। অমৃতলাল ব্যানার্জী।

১০। জ্যোতিশচন্দ্র'র শিষ্য—মনোরঞ্জন লাহিড়ী, শ্যামবিনোদ ঘোষ।

১১। ধ্রুবতারা যোশীর শিষ্য—পুলিনবিহারী দেব বর্মন, বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

১২। বিপিন চন্দ্র দাসের শিষ্য—মতিলাল সরকার (ভাগ্নে), যামিনীকান্ত পাল।

১৩। মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য—চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (পুত্র), লক্ষ্মী চক্রবর্তী (ভাগ্নী)

১৪। শ্রীনিবাস নাগের শিষ্য—অনিল রায়চৌধুরী, কাশীনাথ ভট্টাচার্য।

১৫। শ্রীপতি দাসের শিষ্য—দিলীপ বসু।

১৬। অমৃতলাল ব্যানার্জীর শিষ্য—রজনীকান্ত চতুর্বেদী, কল্যাণী রায়, ডঃ তৃপ্তা পুরোহিত, ডঃ সতী ঘোষ, তুষার মুখার্জী, দীপ্তি চন্দ, ১৭। নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শংকর কুমার ঠাকুর, শক্তি ধারা চট্টোপাধ্যায়।

১৭। নৃপেন্দ্রনাথের শিষ্য—কল্যাণী রায়।

মেহদীহোসেনের বংশ
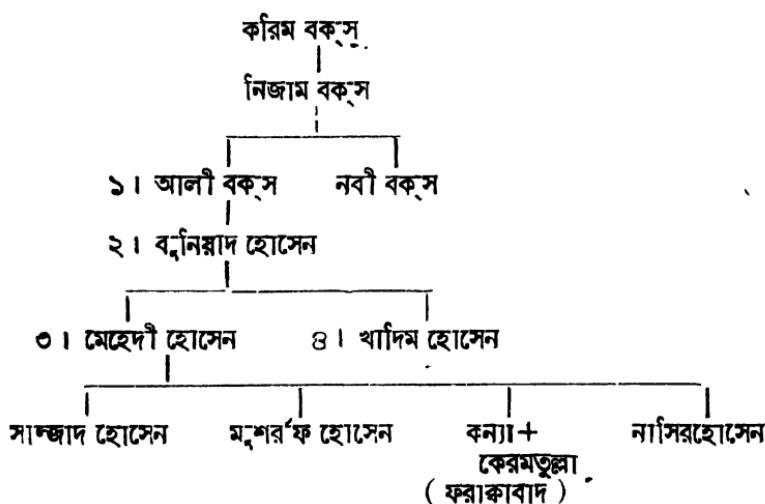
১। আলীবক্‌স অতিগুণী ধ্রুপদীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য ৫। অঘোর চন্দ্র চক্রবর্তী।

২। বুনিয়াদ হোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—খয়েরুদ্দীন খাঁ, নবাব হামেদ আলী (রামপুর), মহম্মদ্দীন খাঁ।

৩। মেহদী হোসেন অতিগুণী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এঁর শিষ্য—চন্দ্রনাথ বসু, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অমূল্যচরণ রায় চৌধুরী (ঢাকা), জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, ডাঃ বিমল রায়, ডলি দে, কালীদাস সান্ন্যাল, ব্যারিষ্টার জে. এন. সিনহা, যামিনী গাঙ্গুলী, শিবানী মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ হোসেন (খসরু), বিজন বসু, সুধীন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সুজনকুমার (লাহোর), সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী (ঢাকা), সুশীল বসু, নিদানবন্ধু বন্দোপাধ্যায়।

৪। খাদিম হোসেন ছিলেন ইনায়ত হোসেনের (সহসবান) শিষ্য এবং অতিগুণী সংগীতজ্ঞ। এঁর শিষ্য—বিনোদ কিশোর রায় চৌধুরী, বিমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিমল রায়, রাণী রায়।

৫। অঘোর চন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য—অমরনাথ ভট্টাচার্য (ধ্রুপদ), গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, নন্ত চক্রবর্তী, প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পান্নুবাবু), ৭। বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মিত্র।

৬। নিকুঞ্জবিহারীর শিষ্য—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

৭। বামাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের শিষ্য—দিলীপ কুমার রায়।

আলাউদ্দীন খাঁ'র গুরু ও শিষ্যবর্গ

১। আফতাবুদ্দীন অতিগুণী গায়ক শিল্পী তথা বংশী ও ন্যাসতরঙ্গ বাদক এবং পরম কালীভক্ত ছিলেন।

২। আলাউদ্দীন খাঁ বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এবং মাইহার ষ্টেটে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর গুরু—অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), আহমদ আলী, উজীর খাঁ, গোপাল চক্রবর্তী (নুলো গোপাল) এঁর শিষ্য—বংশধরেরা এবং অজয় সিংহরায়, ৫। আলী আহমদ খাঁ, ইন্দ্রনীল, ভট্টাচার্য, তিমির বরণ ভট্টাচার্য, দ্যুতিকিশোর আচার্য চৌধুরী, ৯। নিখিল বন্দোপাধ্যায়, ১০। পান্নালাল ঘোষ (বাঁশি), বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মাইহারের মহারাজা, যতীন ভট্টাচার্য, যামিনীকুমার চক্রবর্তী, রনেন দত্ত, রাজা রায়, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, শরন রাণী, শ্যামকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীপদ বন্দোপাধ্যায়, সন্তোষ পরামানিক।

৩। আয়েত আলী উত্তম সেতারী এবং সেতার আদি নানা যন্ত্র নির্মাণে দক্ষ এবং কিছুকাল শান্তিনিকেতনের সংগীত শিক্ষক ছিলেন।

৪। বাহাদুর খাঁ সরোদীয়া হিসাবে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিবান, স্বদেশ ও বিদেশে ইনি অনেককে সংঙ্গীত শিক্ষা দান করে চলেছেন। বহু ছায়াচিত্রে ইনি সুরারোপ করেছেন ও করছেন।

৫। আলীআহমদ ছিলেন অতি উত্তম সেতারী, আলাউদ্দীন সংগীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও শিশু প্রতিভা সম্মেলনের পথপ্রদর্শক। সেই অতিগুণী অথচ নিরংহকারী ওস্তাদের জন্ম হয় ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে। এঁর পিতা গুলমহম্মদ ছিলেন ফকীর প্রকৃতির এবং বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তথা কালীকীর্তনীয়া।

৬। আলীআকবর খাঁ বিশ্ববিখ্যাত সরোদীয়া। এঁর শিষ্য—বংশধর তথা দীলিপ বসু, নিখিল বন্দোপাধ্যায়, শরণ রাণী, শিশিরকণা ধর চৌধুরী, ডি. এল. কাবরা এবং অনেক বিদেশী।

৭। অন্নপূর্ণা অতিগুণী সুরবাহার বাদিকা। এঁর শিশু—শেখর হালদার, হরিপ্রসাদ চৌরাশীয়া।

৮। রবিশংকর বিশ্ববিখ্যাত সেতারী। এঁর শিষ্য—অজয় সিংহরায়, উমাশংকর, গোপাল কৃষ্ণ (বিচিত্র বীণা), জয়া বসু, সর্বজিৎ কাউর, দীপক চৌধুরী, শমীম আহমদ ও অনেক বিদেশী।

৯। নিখিল বন্দোপাধ্যায় বিশ্ববিখ্যাত সেতারী। এঁর শিষ্য—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ আড্ড।

১০। পান্নালাল ঘোষ বিশ্ববিখ্যাত বংশীবাদক এঁর শিষ্য—দেবেন্দ্র মুর্দেশ্বর, ১১। গৌর গোস্বামী

১১। গৌর গোস্বামীর শিষ্য—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
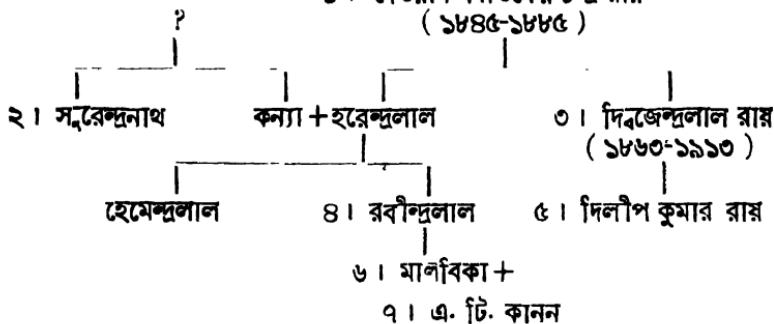
১। কার্তিকেয় চন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণনগর মহারাজার দেওয়ান এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক ও গায়ক শিল্পী। ইনি 'গীতমঞ্জরী', 'ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

২। রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অতি সৌখীন সুগায়ক। ইনি গুরুপ্রসাদ মিশ্র (প্যার খাঁ'র শিষ্য), তসদ্দুক হোসেন প্রমুখ অতিগুণী সংগীতজ্ঞদের কাছে তালিম পেয়েছেন।

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি উচ্চস্তরের নাট্যকার, হাসির কবিতা লেখক এবং সুগায়ক ছিলেন।

৪। রবীন্দ্রলাল অতিগুণী সংগীতজ্ঞ, শাস্ত্রকার এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডের শিষ্য তথা লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এঁর শিষ্য—এ. কানন (জামাতা), মালবিকা (কন্যা)।

৫। দিলীপ কুমার অতি প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক তথা পরম ভক্ত।

৬। মালবিকা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গায়িকা। বর্তমানে ইনি বহু ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দানে রত আছেন।

৭। এ. কানন অতিগুণী গায়ক শিল্পী। ইনি আমীর খাঁ (কিরাণা), গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে তালিম পেয়েছেন। এঁর শিষ্যা—গৌরী মুখোপাধ্যায়, শশীকলা মঙ্গেশকর।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের বংশ

(গৌরীপুরের রাজা, মৈমনসিংহ)

রাজা রাজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর
বিধবা রানী ঃ
|
১। ব্রজেন্দ্রকিশোর (দত্তক পুত্র)
(১৮৭৪-১৯৫৭)

২। হেমন্তবালা — ৩। বীরেন্দ্র কিশোর (১৯০৫-১৯৭৫)

হেমন্তবালা → ৪। বিমলাকান্ত (১৯০৯-), ৫। বাসন্তী বাগচী

বাসন্তী বাগচী → কিশোরকান্ত, জয়ন্তী সান্যাল

বীরেন্দ্র কিশোর → ৬। রানী রায়, ৭। বিনোদ কিশোর

রানী রায় → জয়শ্রী

১। ব্রজেন্দ্রকিশোরের গুরু—আব্দুল্লা খাঁ (গোয়ালিয়র সবোদ), আমীর খাঁ (ঐ), ইমদাদ খাঁ, দক্ষিণাচরণ সেন, মুরারী মোহন গুপ্ত, শ্রীরাম চক্রবর্তী, হনুমান দাস সিং।

এঁর শিষ্য—অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়, কৈলাস কুণ্ডু, গিরিজা কান্ত ভট্টাচার্য, চুনীলাল নন্দী, জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালিপুরের জমিদার), ডঃ প্রকাশচন্দ্র সেন, তারাদাস ঘোষাল, দীনেশচন্দ্র দে, প্রতাপ সরকার, বিপিনচন্দ্র দাস, বিমলাকান্ত (নাতি), বিশ্বনাথ দাস, ভোলানাথ বাগচী, মনোরঞ্জন লাহিড়ী, মন্মথনাথ হালদার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, যতীন্দ্র কুমার ভৌমিক, যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শুকদেব সাহা, সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল ভট্টাচার্য, সুরনাথ মজুমদার, ৮। ডঃ সুরেশ চক্রবর্তী, হরিহর রায়, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

২। হেমন্তবালার গুরু—আলাউদ্দীন খঁা, ইনায়ত খঁা।

৩। বীরেন্দ্রকিশোরের গুরু—আবদুল্লা ও আমীর খঁা (গোয়ালিয়র, সরোদ), আলাউদ্দীন খঁা, ইনায়ত খঁা, এস. চৌধুরী, কেরামতুল্লা খঁা, (সরোদ), খয়েরুদ্দীন খঁা, দবীর খঁা, মহম্মহ আলী (সেনী), মহম্মদীন খঁা (সরোদ), মামুদ খঁা, মেহদীহোসেন খঁা, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সগীর খঁা (সেনী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হাফিজআলী খঁা (সরোদ)।

৪। বিমলাকান্তের গুরু—আমীর খঁা (গোয়ালিয়র সরোদ), ইনায়ত খঁা, জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, বীরেন্দ্র কিশোর, ব্রজেন্দ্র কিশোর, শীতলকৃষ্ণ ঘোষ, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

৪। বিমলাকান্ত'র শিষ্য—অনিলকুমার বৈরাগী, এস. এন্. গোর, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিশোরকান্ত বাগচী, জি. জ্যাক সেস্থন, ডঃ তৃপ্না পুরোহিত, নিখিলেশ ভবানী, ক্লোরেন্স ককরেন, মতিলাল সরকার, মীরা দে, রঞ্জনা রায়, ৯। সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ, হীরেন্দ্র রায়।

৫। বাসন্তী বাগচী রবীন্দ্র সংগীত ও 'সংগীত বিশারদ' পাশ করেছেন।

৬। রাণী রায়ের গুরু—খাদিম হোসেন খঁা, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, যামিনী গাঙ্গুলী, শচীন্দ্রনাথ দাস (মতিলাল), ৮। ডঃ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী।

৭। বিনোদ কিশোরের গুরু—খাদিম হোসন খঁা,, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, গোকুলচন্দ্র নাগ, জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডঃ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী।

৮। ডঃ সুরেশ চক্রবর্তীর শিষ্য—অমল দাশগুপ্ত, গৌর গোস্বামী, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, নির্মল কুমার চক্রবর্তী (পুত্র), বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিনোদ কিশোর, রানী রায়, শোভা ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পুত্র), সিদ্ধার্থ রায়।

৯। সন্তোষ কুমারের শিষ্য—অরুণকুমার বসু মল্লিক।

গোপাল চক্রবর্তীর শিষ্যবর্গ (নুলো গোপাল)

গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী অতিগুণী তথা মধুকণ্ঠী গায়ক শিল্পী ছিলেন। এর গুরুবর্গের মধ্যে গোপাল প্রসাদ মিশ্র, হদ্দ খঁা, হস্সু খঁা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গোপাল চন্দ্রের শিষ্য—আলাউদ্দীন খাঁ, ১। সাতকড়ি মালাকার (অন্ধ গায়ক), রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), রামরতন সান্ন্যাল, লালচাঁদ বড়াল, শশীকর্মকার (কৃষ্ণনগর), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব (এণ্টালি), বিনোদ কৃষ্ণ মিত্র (শোভাবাজার), বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজমোহন বন্দোপাধ্যায় (লক্ষীকান্তপুর)।

সাতকড়ি মালাকারের শিষ্য—২। তারাপদ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্র ঘোষাল।

তারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্য—উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ নিহারকণা মুখোপাধ্যায়, বাবলু ঘটক, মানস চক্রবর্তী (পুত্র), শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শেফালী চক্রবর্তী।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর শিষ্যবর্গ

গিরিজাশংকর ছিলেন একজন অতিগুণী গায়ক শিল্পী। এঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি জানা যায় না। তবে এঁর গুরু-শিষ্য পরম্পরা থেকে এঁর মোটামুটি সময়কাল অনুমান করা যায় মাত্র।

এঁর গুরু—বাদল খাঁ (আগ্রা), গণপৎ রাও (কিরানা), মহম্মদ আলী (সেনী বংশ), মুজফ্ফর খাঁ (দিল্লী), রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (বিষ্ণুপুর)।

এঁর শিষ্য—অনিল হোম, গীতশ্রী আরতী দাস, ইভা গুহ (দত্ত), ইলা মিত্র (দে), গীতা দাস, এ. কানন, জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তারাপদ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বিনোদ কিশোর রায় চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচায, ১। যামিনী গাঙ্গুলী, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাণী রায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র অর্ণব, ২। সুখেন্দু গোস্বামী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুনীল কুমার বসু।

১। যামিনী গাঙ্গুলীর শিষ্য—প্রসুন বন্দোপাধ্যায়, বিনোদকিশোর রায়-চৌধুরী, রাণী রায়, সন্ধ্যা মুখার্জী।

২। সুখেন্দু গোস্বামীর শিষ্য—অনুপ ঘোষাল, ছবি বন্দোপাধ্যায়, তন্দ্রা মৈত্র, মলয় মুখার্জী, স্নিগ্ধা সেন, হিরন্ময় সরকার, হেনা বন্দোপাধ্যায়, দীনা ঘটক, গীতা বিশ্বাস।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

দিল্লীর বাদশাহী শেষ হয়ে আসার পরে, দরবারী গুণী সংগীতজ্ঞেরা ক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং সেই সকল স্থানের অধিবাসী বলে পরিচিত হতে থাকেন। তাঁদের বংশ ও শিষ্য পরম্পরা থেকে পরবর্তীকালে সেই সকল স্থানের নামে নানা ঘরাণার সৃষ্টি হয়। তানসেন বংশীয় জীবন খাঁর তৃতীয় পুত্র বাহাদুর খাঁ সেই দিনে বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তিনিই বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি সংগীতজ্ঞ। তাঁর শিষ্য ছিলেন বিষ্ণুপুরের অতিগুণী সংগীতাচার্য গদাধর চক্রবর্তী।

গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্য—রামশংকর ভট্টাচার্য, শিষ্য—১। অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়। ২। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। ৩। যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট)।
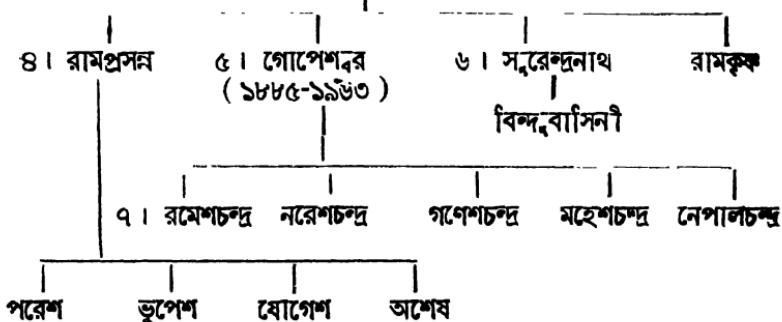
১। অনন্তলালের শিষ্য—বংশধরেরা এবং ৮। বোধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

২। ক্ষেত্র মোহনের শিষ্য—কালীপ্রসন্ন ও তৎপুত্র হরিপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৩। যদু ভট্টের শিষ্য—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিচরণ কর্মকার।

৪। রামপ্রসন্ন অতিগুণী সংগীতাচার্য ছিলেন। এঁর রচিত 'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থে দণ্ডমাত্রিক সংগীতলিপি সহ বহু প্রাচীন ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে। এঁর শিষ্য—অতুলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, ৯। গোকুল চন্দ্র নাগ (সেতার)।

৫। সংগীত নায়ক গোপেশ্বর অতিগুণী সংগীতাচার্য এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে পুত্র রমেশচন্দ্র এবং শিষ্য সত্যকিংকর বন্দোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

৬। সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য—নিত্যানন্দ অধিকারী।

৭। সংগীতরত্ন রমেশচন্দ্র গীতবিতানের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Dean) ছিলেন। এঁর অজস্র শিষ্যের মধ্যে গ্রন্থকারও একজন এবং বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন।

৮। রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য—কাদের বক্স (মুর্শিদাবাদ), গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রসাদ গোস্বামী (ভ্রাতুষ্পুত্র), মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), ১০। মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৯। গোকুলচন্দ্রের শিষ্য—বিনোদকিশোর রায় চৌধুরী, মণিলাল নাগ (পুত্র), পণ্ডিত রবিশংকর।

১০। মহিমচন্দ্রের শিষ্য--ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১১। যোগীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ললিতমোহন (পুত্র)।

১১। যোগীন্দ্রনাথের শিষ্য—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবদাস মুখোপাধ্যায়।

দ্বারিকানাথ ঘোষ বংশ

১। দ্বারিকানাথ ঘোষ
- কিরণচন্দ্র ঘোষ
  - জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ
- শরৎচন্দ্র ঘোষ

১। দ্বারিকানাথ ঘোষ অত্যন্ত সংগীত প্রেমী এবং বিখ্যাত ডোয়াকিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি হারমনিয়ম যন্ত্রের নানা উন্নতি বিধান করেছেন।

২। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গুরু আজিম খাঁ (ফরাক্কাবাদ), গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, ফিরোজ খাঁ (পাঞ্জাব), মসীতুল্লা খাঁ (ফরাক্কাবাদ), সগীর খাঁ (সেনী)।

২। এঁর শিষ্য—কপিলদেব চতুর্বেদী, ৩। কানাইলাল দত্ত, চুনীলাল গাঙ্গুলী, দীলিপ দাস, নিমাই ভট্টাচার্য, নিখিল ঘোষ, গোবিন্দ বসু, প্রবোধ

ভট্টাচার্য, প্রসুন কুমার বন্দোপাধ্যায়, মানিকলাল, শংকর ঘোষ, শ্যামল বসু।

৩। কানাই দত্ত'র শিষ্য—জহর ভট্টাচার্য।

লক্ষ্ণৌ নৃত্য ঘরাণা

১। প্রকাশজী ছিলেন এলাহাবাদের অধিবাসী। ইনি নবাব আসফদ্দৌলার রাজত্বকালে লক্ষ্ণৌর রাজদরবারে আশ্রয়লাভ করেন। ইনি অতিগুণী নর্তক ছিলেন।

২। ঠাকুরপ্রসাদ অতিগুণী নর্তক এবং নবাব বজিদ আলীর শা'র দরবারে নিযুক্ত তথা রাজগুরু ছিলেন।

৩। কালিকাপ্রসাদ ও ৪। বিন্দাদীন মহারাজ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নর্তক এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের শিষ্যদের মধ্যে বংশধরেরা ও বণ্ডে খাঁ উল্লেখযোগ্য।

৫। অচ্ছন মহারাজ অতিগুণী নর্তক এবং সংগীত জ্ঞানী ছিলেন। এঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ভ্রাতা, পুত্র ও নলিন গাঙ্গুলী উল্লেখযোগ্য।

৬। লচ্ছু মহারাজ অতিগুণী নর্তক এবং রামপুর, হৈদ্রাবাদ, বিকানীর প্রভৃতি

রাজাশ্রয়ে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ইনি বম্বের ছায়াচিত্রে নির্দেশনার কার্য করেন। এঁর শিষ্য—বিরজু মহারাজ (ভ্রাতুষ্পুত্র), দময়ন্তী যোশী।

৭। শম্ভু মহারাজ অতিগুণী নর্তক ও পদ্মশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত। এঁর বহু শিষ্যের মধ্যে পুত্রেরা, ৯। গোপীকৃষ্ণ, অনুরাধা গুহ, উমা, শর্মা নলিন গাঙ্গুলী, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৮। বিরজু মহারাজ অতিগুণী নর্তক ও সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিপ্রাপ্ত। এঁর শিষ্য—প্রতাপ পাওয়ার, প্রদীপ শংকর, তীরথ রাম।

৯। গোপীকৃষ্ণ'র গুরু—সুখদেব মহারাজ (মাতামহ), শম্ভু মহারাজ, গোবিন্দরাজ পিল্লাই।

প্রসিদ্ধ নর্তক

১। উদয়শংকর অতিগুণী তথা বিশ্ববিখ্যাত নর্তক ও স্রষ্টা সংগীতজ্ঞ। ইনি সমগ্র বিশ্বে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে অনন্যসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছেন। কল্পনা নামক ছায়াচিত্র ও শংকরস্কোপ এঁর অনবদ্য সৃষ্টি। এঁর দলে ভারতবর্ষের বহু অতিগুণী সংগীতজ্ঞেরা ছিলেন।

২। শংকর নাম্বুদ্রীপাদ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলের এক রুঢ়িবাদী জমিদারবংশীয় অতিগুণী নর্তক এবং বিশ্ববিখ্যাত উদয়শংকরের গুরু। ৬৩ বৎসর বয়সে, নৃত্যকলা প্রদর্শনান্তে ইনি শিল্পোচিত মৃত্যুবরণ করেন।

৩। গোপীনাথ ছিলেন ত্রিবাংকুরের কথাকলি নৃত্য ঘরাণার অতিগুণী নর্তক। ইনি উদয়শংকরের সঙ্গে বিদেশভ্রমণ করেন শিল্পী ও কথাকলি নৃত্য-শিক্ষকরূপে।

৪। শান্তি বর্ধন অতিগুণী নর্তক এবং উদয়শংকরের সঙ্গে শিল্পী ও মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষক হিসাবে বিদেশভ্রমণ করেন।

৫। রামগোপাল ছিলেন বাংলাদেশের এক অতিগুণী নর্তক ও উদয়শংকরের শিষ্য। ইনিও উদয়শংকরের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করেন। পরবর্তীকালে ইনি মৃণালিনী, শেবন্তীপ্রমুখ অতিগুণী নর্তকীদের নিয়ে দল গঠন করে স্বদেশ ও বিদেশের বহুস্থানে সংগীতসফর করেছেন।

পাখোয়াজ ঘরানা (প্রথম)
গম্পে (গন্ধে) সিং
১। কুন্দু সিং
(১৮১৫-১৮৮০)
নৈনসুখ তেওয়ারী
গয়া প্রসাদ
৫। অযোধ্যাপ্রসাদ
(১৮৮৪-)
শীতল
নারায়ণ
কুন্দন
রামজী
২। জোধ সিং
বহু শিষ্য
৩। নানা পানসে
৪। বলবন্ত রাও
কন্যা
৬। শংকর ভইয়া
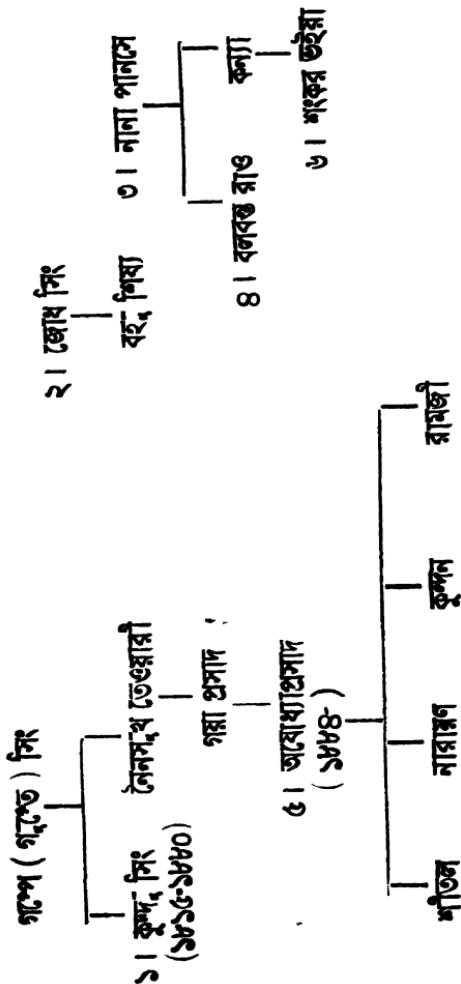
১। কুন্দ্ন্ সিং অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য ও বিভিন্ন রাজাশ্রয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ভগবান সিংয়ের শিষ্য ছিলেন। এঁর শিষ্য—মদনমোহন (সিতারে হিন্দ), হরিচরণলাল ভল্লি (টিকমগড়)।

২। জোধ সিং ছিলেন ১৯শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাচার্যদের অন্যতম। ইনি কাশীর বীণাপাণি মন্দিরের সাধক ছিলেন। রামায়ণপাঠ, ভজন-কীর্তন এবং অবশেষে পাখোয়াজবাদন ছিল এঁর নিত্যকর্ম। তাই আর কোথাও যেতেন না। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে শোনার ও শেখার জন্য এঁর কাছে বহু জনসমাগম হোত। এঁর বহু শিষ্য ছিল যার মধ্যে গোবিন্দরাও দেবরাও গুরুজী, ৩। নানা পানসে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৩। নানা পানসে ছিলেন ইন্দোরনিবাসী এবং অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য, তবলীয়া, নর্তক ও গায়ক এবং ইন্দোরের মহারাজা তুকাজীরাও হোলকরের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁর নাকি পাঁচশত শিষ্য ছিল, তাই পানসে শব্দটি এঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। নিজাম সরকারের ইচ্ছানুসারে ইনি বামনরাও চাঁদবড়করকে উত্তম তবলাবাদন শিক্ষা দিয়েছেন। ইনি অনেককে নৃত্যকলাও শিক্ষা দিয়েছেন। ইনি পুত্র ও নাতিকে উত্তম পাখোয়াজ-বাদন শিক্ষা দিয়েছেন। এঁর শিষ্যপরম্পরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুদূর বিস্তৃত।

৪। বলবন্ত রাও অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য ও তবলীয়া ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যুবাবস্থায়ই এঁর মৃত্যু হয়।

৫। অযোধ্যাপ্রসাদ অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য এবং রামপুর ষ্টেটে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর দুই পুত্র (নারায়ণ ও কুন্দন) পাখোয়াজ শিক্ষারম্ভ করেছিলেন কিন্তু অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। এঁর শিষ্যদের মধ্যে ডঃ কৈলাসচন্দ্র দেব বৃহস্পতি, গোপালদাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৬। শংকর ভইয়া পানসে অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য এবং অনেককে শিক্ষাদান করেছেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে সখারাম মৃদঙ্গাচার্য উল্লেখযোগ্য।
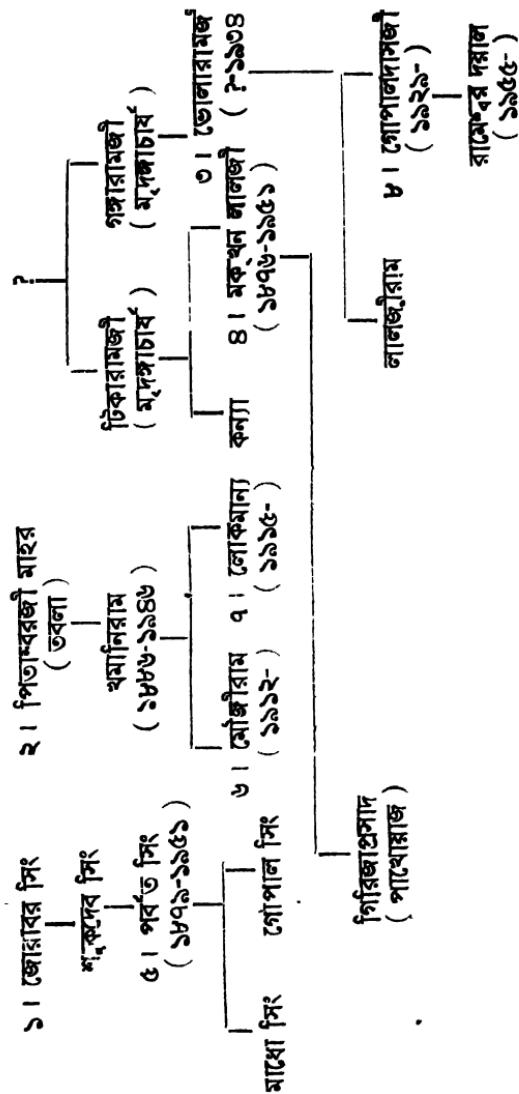
১। জোরাবর সিং অতিগুণী তবলীয়া এবং কুন্দু সিংয়ের সময়ে বর্তমান ছিলেন। ইনি গোয়ালিয়রের রাজ দরবারে নিযুক্ত ছিলেন।

২। পিতাম্বরজী হাথরসের অধিবাসী এবং গুণী তবলীয়া ছিলেন।

৩। ভোলারামজী উত্তম মৃদঙ্গাচার্য এবং মথুরার অধিবাসী ছিলেন। এঁদের বংশে বহুকাল থেকে মৃদঙ্গ-চর্চা প্রচলিত।

৪। মকৃখনলালজী অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য এবং নানা পানসে ও তৎশিষ্য মদন-মোহনের শিষ্য এবং মথুরানিবাসী ছিলেন।

৫। পর্বত সিং অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য এবং গোয়ালিয়রের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর পুত্রদ্বয় বর্তমানে (মাধোসিং পাখোয়াজ ও গোপাল সিং গীটারবাদকরূপে) গোয়ালিয়রের রাজদরবারে নিযুক্ত আছেন।

৬। মৌজীরাম অতিগুণী তবলীয়া এবং বর্তমানে দিল্লী, ভারতীয় কলাকেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

৭। লোকমান্য মাহোর অতিগুণী তবলীয়া এবং দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী। এঁরা হাথরসের অধিবাসী এবং তবলাবাদন এঁদের বংশে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এঁর শিষ্য—ধনেশচন্দ্র সুমন, ফকীরচন্দ। লেখককে ইনি স্বয়ং এঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন।

৮। গোপালদাসজী মথুরার অধিবাসী। পিতা মকৃখনলালজীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পান। পরে ইনি অযোধ্যাপ্রসাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি অতিগুণী পাখোয়াজী এবং দিল্লী বেতারকেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এঁর শিষ্য—মোহন সিং (জলন্ধর), শক্তিভান শর্মা (আগ্রা)। লেখক এঁর বিশেষ স্নেহধন্য এবং নানাভাবে এঁর কাছে উপকৃত।

পাখোয়াজ ঘরাণা (তৃতীয়)

রামচন্দ্র চক্রবর্তী

রামচন্দ্র চক্রবর্তী অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য ও কলকাতানিবাসী ছিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌনিবাসী লালা কেবলকিষণ এবং লালা হারকিষণের শিষ্য ছিলেন।

এঁর শিষ্য—কেশবচন্দ্র মিত্র, ১। দুর্লভ ভট্টাচার্য, নিতাই চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী, ২। মুরারিমোহন গুপ্ত, সত্যচরণ গুপ্ত।

১। দুর্লভ ভট্টাচার্যের শিষ্য—প্রতাপনারায়ণ মিত্র।

২। মুরারি গুপ্ত'র শিষ্য—আনন্দনারায়ণ মিত্র, গোপালচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দে, নিতাই চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সত্যচরণ গুপ্ত।

দীননাথ হাজরা (চতুর্থ)

দীনু হাজরা অতিগুণী মৃদঙ্গাচার্য এবং কলিকাতানিবাসী ছিলেন। এঁর শিষ্য—

১। অরুণপ্রকাশ অধিকারী (কেবলবাবু), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১। অরুণপ্রকাশের শিষ্য—ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ দে, রতনলাল ভড়, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ অধিকারী।

মিনহাউদ্দীন
(মসীত খাঁ)
তনবীরুদ্দীন
(তাতর খাঁ)
সহজাদ খাঁ
(সেতারী)
বহজাদ খাঁ
(সেতারী)
৬। নিগার খাঁ
(কবি, গায়ক)
সালার খাঁ
(গায়ক, সেতারী)
সরফরাজ খাঁ
৭। মিঞা কৌল খাঁ
লোদী রাজত্বকাল (১৪৫১-১৫২৬)
৮। বড়ে আমান আলী
(তবলা নওয়াজ)
রহমান আলী
৯। সুজান আলী
বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৭-১৬০৫)
১০। বুগরা খাঁ
(তবলা)
সজ্জাদ খাঁ
(তবলা)
বহজাদ খাঁ
(তবলা)
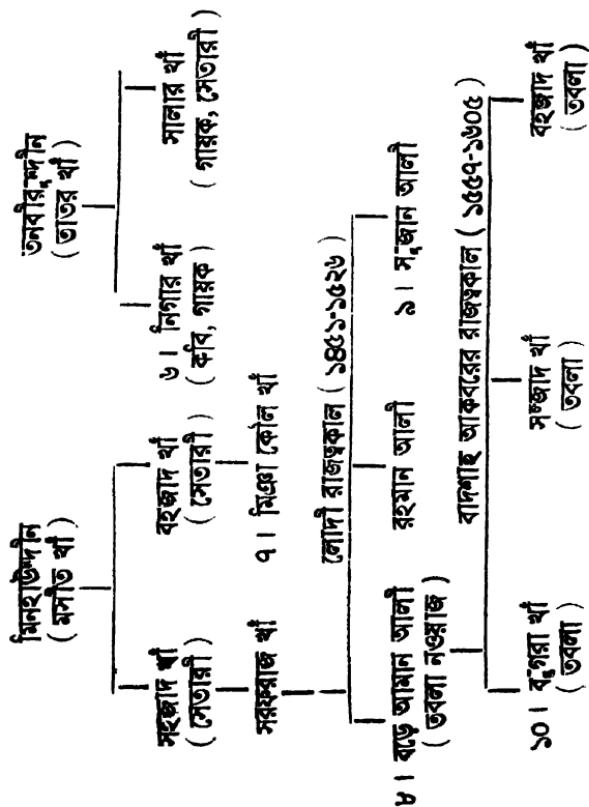
১। আমীর মহম্মদ সহফুদ্দীন পিতার সঙ্গে কুতুবুদ্দীন আইবকের রাজত্বকালে (১২০৬-১২১০) ভারতবর্ষে আসেন। ইনি নিজগুণে অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

২। আবুল মোহসীন উত্তম সাহিত্যিক ছিলেন। ফারসী ভাষায় ইনি "কাবিলায়ে লাচিনি হাজারী" নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন।

৩। আমীর খসরু অসাধারণ প্রতিভাবান এবং নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। ইনি স্রষ্টা সংগীতশিল্পী তথা অতি উচ্চস্তরের সাহিত্যিক ছিলেন। ইনি বহুবিচিত্র সংগীতকলা তথা সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। (জীবনকথা দ্রষ্টব্য)

৪। ফিরোজ বক্ত খাঁ উত্তম সাহিত্যিক ও সেতারী ছিলেন। ফারসী ভাষায় "রিসালা সিতার নওয়াজি" নামক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। এঁর পুত্রেরা নাকি যথাক্রমে মসীদখানি, রেজাখানি ও তাতারখানি বাজ সৃষ্টি করেছেন। তবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ উক্ত অভিমত অভ্রান্ত হলে পরবর্তী বাদশাহ আকবরের দরবারে অবশ্যই কোন সেতারীর সন্ধান পাওয়া যেত।

৫। মালেক আহমদ ফারসী ভাষায় "অসারে খিসরবি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

৬। নিগার খাঁ উত্তম কবি ও গায়ক ছিলেন। ফারসী ভাষায় ইনি "মলফুজাতে খিসরবি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

৭। মিঞা কৌল খাঁ উর্দু ভাষাতে "কব্বলে বচ্চে কি দিল্লী ঘরাণা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর বংশধরদেরই নাকি কব্বলে বচ্চে বলা হোত।

৮। বড়ে আমান আলী উত্তম তবলাবাদক ছিলেন। ফারসী ভাষায় "হঙ্গামে তবলা নওয়াজি" নামক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

৯। সুজান আলী উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং আগ্রানিবাসী ছিলেন।

১০। বুগরা খাঁ উত্তম তবলাবাদক এবং দিল্লী তবলা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এঁরা তিন ভাই তবলা-জগতে স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১ম দিল্লী ঘরাণা (তবলা)
বুগরা খাঁ (বাদশাহ আকবর ১৫৫৭-১৬০৫)
(দিল্লী তবলা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা)
হিঙ্গা খাঁ
১। জানেসর খাঁ (সুধার খাঁ)
তুরাব খাঁ
সবদর বক্স
কন্যা + জুগনু খাঁ
২। সিতাব খাঁ
(বাহাদুর শাহ . ১৭০৮-১৭১২)
গুলাব খাঁ
নজরালি খাঁ
বিসমিল্লা খাঁ
৪। ছোটে কালে খাঁ
ওমরাও বেগম + কল্লু খাঁ
৫। গামী খাঁ
মহম্মদ আলী
(পাক)
শৌকত আলী
(পাক)
৬। ইনাম খাঁ +
রিজিয়া
পঞ্জু খাঁ
(পাক)
মুক্তার খাঁ
(পাক)

ওমরাও বেগম + কল্লু খাঁ
বুলাকি খাঁ
আল্লাদিয়া খাঁ
৭। বুন্দু খাঁ + ফজলে খাঁ'র কন্যা
কালো বেগম + আকবর খাঁ
৮। বশীর হোসেন (?-১৯৫৪)
রিজিয়া + ৬। ইনাম খাঁ
মহম্মদ আহমদ
গোলাম হৈদর (বম্বে)
অখতার বেগম
মস্তার বেগম
৯। মকবুল হোসেন কুরেশী
মেহদী হোসেন

১। জানেসর খাঁ উত্তম তবলীয়া এবং সুধীর খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন।

২। সিতাব খাঁ ও ৩। গুলাব খাঁ, অতিগুণী তবলীয়া এবং বাহাদুর শাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের বহু শিষ্যের মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁ (পাখোয়াজী), কল্লু খাঁ, ছোটে কালে খাঁ, নজরালি খাঁ, ফকীর বক্স (পাঞ্জাব), প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৪। ছোটে কালে খাঁ, অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—গাম্মী খাঁ, বুন্দু খাঁ, মুন্নু খাঁ।

৫। গাম্মী খাঁ অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। বংশধরদের ছাড়াও অনেককে ইনি তালিম দিয়েছেন। এঁর শিষ্য—পীরু (নৃত্যপটিয়সী রোসনারা বেগমের পিতা), মারুতী (বম্বে), রিজিরাম (বম্বে), রিয়াসত বেনারসী, লতিফ খাঁ, হীরালাল।

৬। ইনাম খাঁ গুণী তবলীয়া হিসাবে আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন, এঁর অন্যান্য ভ্রাতারা পাকিস্থানে আছেন।

৭। বুন্ধু খাঁ, গুণী তবলীয়া এবং বংশধরদের ছাড়াও অনেককে তালিম দিয়েছেন।

৮। বশীর হোসেন গুণী তবলীয়া এবং সংগীতনির্দেশকরূপে ছায়াচিত্রে কাজ করতেন। এঁর অনেক রেকর্ড আছে।

৯। মকবুল হোসেন গুণী তবলীয়া হিসাবে আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন। এঁদের বংশের যাবতীয় তথ্য এঁর সৌজন্যেই সংগৃহীত হয়েছে।

২য় দিল্লা ঘরাণা (তবলা)

- বহজাদ খাঁ (বাদশাহ আকবর : ১৫৫৭-১৬০৫)
  - ফকীরবক্‌স
    - কাদেব বক্‌স
      - করীম বক্‌স
        - ফকীর বক্‌স
          - ৪। আল্লাদিয়ে খাঁ
            - মম্মদু খাঁ + নন্নো
              - গালাম হোসেন
              - দাদো
              - জব্বো খাঁ
            - আশীষ খাঁ
      - গোলাম হৈদর
        - লিলি মসীত খাঁ (ভন্দু)
          - লংড়ে হোসেন বক্‌স
            - ৬। নন্নে খাঁ (১৮৭২-১৯৪০)
              - অহজাদ হোসেন
        - ৩। বড়ে কালে খাঁ
          - ৫। ভোলি বক্‌স
            - নন্নো + মম্মদু খাঁ
            - ৭। নথ্থু খাঁ (১৮৭৫-১৯৪০)
          - জাফর খাঁ + আবাদী বেগম
  - ১। লতিফ খাঁ
    - ২। মহদ্দু খাঁ (লক্ষ্মৌ)
  - সরীফ খাঁ
    - হাফীজ খাঁ
      - জগ্গন্নু খাঁ
        - চাঁদ খাঁ
          - কালেকন্দ খাঁ

১। লতিফ খাঁ ভ্রাতৃত্রয় প্রসিদ্ধ তবলীয়া এবং বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-১৬৫৮) বর্তমান ছিলেন।

২। মহতু খাঁ অতিগুণী তবলীয়া এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৭-১৭০৭) বর্তমান ছিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌবাসী হন এবং লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ শোনা যায়।

৩। বড়ে কালে খাঁ অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্যেরা পাঞ্জাব, দাতিয়া, পূর্ণিয়া, চম্পারণ প্রভৃতি স্থানে তবলা প্রচার করেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ খলিফা চৌধুরী নত্থন সিং এঁরই শিষ্য ছিলেন।

৪। আল্লাদিয়ে খাঁ অতিগুণী পাখোয়াজী ও তবলীয়া ছিলেন।

৫। ভোলিবক্‌স অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য মম্মু খাঁ, নত্থু খাঁ, মুনির খাঁ।

৬। নন্নে খাঁ অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য পদ্মশ্রী জাহাঙ্গীর খাঁ (ইন্দোর), পদ্মশ্রী মহবুব খাঁ, মহম্মদ আহমদ (বম্বে)।

৭। নত্থু খাঁ, অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—আলীকদর, কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী (রায় বাহাদুর), ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হাবীবুদ্দীন খাঁ (অজরাড়া)।

৩য় দিল্লী ঘরাণা (তবলা)

১। চৌধুরী নত্থন সিং
|
২। খলিফা জুম্মা চৌধুরী
|
কন্যা

৩। পূরন মহারাজ (সাধজী মহারাজ)

১। চৌধুরী নত্থন সিং অতিগুণী পাখোয়াজী ও তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে পুত্র খলিফা(জুম্মা চৌধুরী, ৪। জ্যোতিপ্রসাদ, ৫। দেবীপ্রসাদ, চৌধুরী মাসন, ডালুরাম, মোহর সিং (কালিদাস) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

২। খলিফা জুম্মা চৌধুরী অতিগুণী পাখোয়াজী ও তবলীয়া এবং পরম ভক্ত-প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

৩। পুরন মহারাজ অতিগুণী পাখোয়াজী ও তবলীয়া এবং পরম ভক্তপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এঁর শিষ্য মিট্‌ঠনলাল।

৪। জ্যোতিপ্রসাদ অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—গণেশীরাম, পণ্ডিত বেনারসী মহারাজ, পণ্ডিত ভগবানদাস (ঘমড়া), কুন্দনরাম, ভানা, কল্লাবাচ্চা, খৈরাতিরাম, পণ্ডিত হীরালাল, পণ্ডিত সন্তরাম।

৫। দেবীদাসের শিষ্য— ৬। পণ্ডিত ভানমল, কুন্দনরাম।

৬। ভানমলের শিষ্য—পুত্র, পৌত্রাদি, বিনোদকুমার, মণিরাম, ৭। হুকুমচন্দ হরিপ্রসাদ।

৭। হুকুমচন্দ গুণী তবলীয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ দিল্লী বেতারকেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এঁর পিতা রামদিয়াজী'ও গুণী তবলা ও নক্কারাবাদক এবং দিল্লী বেতারকেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন।

চৌধুরী নথন সিং ও পণ্ডিত বালুরাম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি এই ঘরাণার পণ্ডিত হীরালাল, পণ্ডিত মিট্‌ঠনলাল ও পণ্ডিত সন্তরামের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এঁরা সকলেই দিল্লী বেতারকেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন।

৪র্থ দিল্লী ঘরানা (তবলা)
?
১। পণ্ডিত বালুরাম
(পাখোয়াজ, তবলা)
ভ্রাতা
২। পণ্ডিত বুদ্ধুরাম
(পাখোয়াজ, তবলা)
হীরালাল
(?-১৯৪৫)
৬। পণ্ডিত সন্তরাম
(১৯২৮-)
(তবলা)
৩। গোপীনাথ
(তবলা)
কন্যা + রামধন
(১৮৭০-১৯১৬)
প্রতাপ সিং
৪। মিঠনলাল
(১৯১৩-)
(তবলা)
কন্যা + মোহর সিং
(কালিদাস)
৫। পণ্ডিত হীরালাল
(তবলা)
(১৯১৪-)
৭। রাজরানী (ভাগ্নী)
(দত্তক কন্যা)
(তবলা)
(১৯৫০-)

১। পণ্ডিত বালুরাম অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলাবাদক এবং দিল্লী অধিবাসী ছিলেন। এঁর শিষ্য—পণ্ডিত বুদ্ধুরাম (ভ্রাতুষ্পুত্র)।

২। পণ্ডিত বুদ্ধুরামের শিষ্য—গোপীরাম (ভ্রাতা), মিঠনলাল (ভাগ্নে) ৮। প্রসাদীরাম, ওস্তাদ রূপরাম (ন্যাটা)।

৩। গোপীরাম ভাগ্নে মিঠনলালকে শিক্ষাদান করেছেন।

৪। মিঠনলাল আকাশবাণীতে নিযুক্ত ছিলেন। বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনি পুরণ মহারাজ ও হাবিবুদ্দীন খাঁ'র (অজড়ারা) কাছেও তালিম পেয়েছেন। ঘরাণার তথ্যসংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

৫। হীরালাল আকাশবাণীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিদেশে সংগীতসফর করেছেন। গ্রন্থকারকে ইনি ঘরাণা সম্পর্কিত নানা তথ্য সরবরাহ করেছেন। এঁর শিষ্য—অমর সিং, কৃষ্ণকুমার, চন্দ্রমোহন, চরণলাল (প্রখ্যাত তবলীয়া পণ্ডিত চতুরলালজীর পুত্র), চুণীলাল, নানকচন্দ, ফকীরচন্দ, বাবুলাল (নাল), বাবুলাল (তবলা), ভূপেন্দ্র শর্মা, মুরলীধর, রাজরাণী (ভাগ্নী, দত্তক কন্যা), রামু, লবকুমার, লালচন্দ, সলেখচন্দ, মহম্মদ কাশিম (আফগানিস্থান), সৌকত আলী (পাকিস্থান),

৬। পণ্ডিত সন্তরাম আকাশবাণীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং কয়েকবার বিদেশে সংগীতসফর করেছেন। ঘরাণা-তথ্য-সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

৭। রাজরাণী আকাশবাণীর শিল্পী এবং উদীয়মান তবলীয়া।

৮। প্রসাদীরামের শিষ্য—৯। গোপালরাম, হীরা।

৯। গোপালরামের শিষ্য—চন্দ্রলাল (পুত্র), চমনলাল, মোতিরাম, সুভাষ কুমার।

লক্ষ্ণৌ ঘরাণা (তবলা)
মহদ্দু খাঁ (দিল্লী ঘরাণা)
মিঞা বক্সু
১। মিঞা মখ্সু (মৌজু)
গোলাম হোসেন
২। মম্মু খাঁ (মম্মন)
কন্যা +
৩। হাজি বিলায়ত আলী
(ফরাক্কাবাদ)
মহম্মদ খাঁ
নন্‌জু খাঁ
জাকির হোসেন
লাডলে খাঁ
৬। ছোট্টন খাঁ
কল্লু খাঁ (পোষ্যপুত্র)
মুন্নে খাঁ
৪। আবিদ হোসেন
(১৮৬৭-১৯৩৬)
নাদির হোসেন
কন্যা + ৫। বাজিদ হোসেন
(১৯০৬-)
সাজ্জাদ হোসেন
আফাক হোসেন
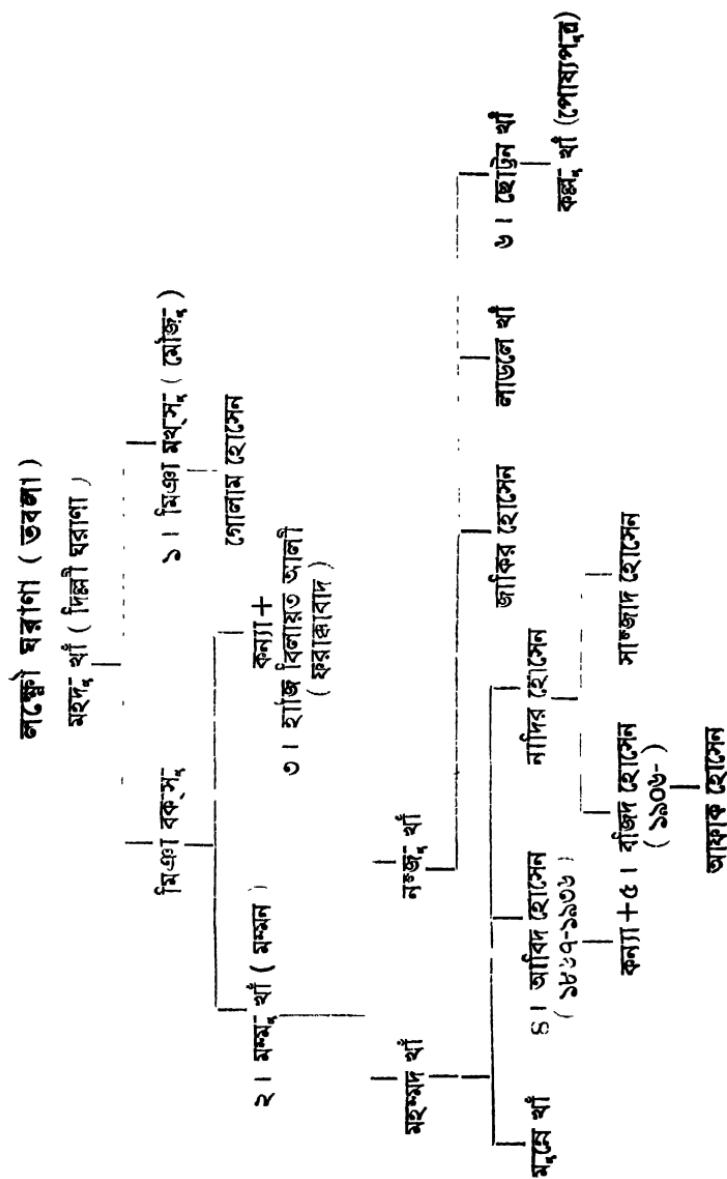
১। মিঞা মখ্সু অতিগুণী তবলীয়া এবং বাহাদুর শাহ জফরের (১৭০৭-১৭১২) দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য—ফরাক্কা ঘরাণার প্রবর্তক হাজি বিলায়ত আলী, বেনারস ঘরাণার প্রবর্তক পণ্ডিত রামদাস সহায় ; রাজস্থানে তবলার প্রচলনও এঁর বংশধর এবং শিষ্যেরা করেন এইরূপ শোনা যায়।

২। মম্মু খাঁ অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—ভৈরব সহায় (বেনারস)।

৩। হাজি বিলায়ত আলী অতিগুণী তবলা ও পাখোয়াজবাদক ছিলেন। (ফরাক্কাবাদ ঘরাণা দ্রষ্টব্য)।

৪। আবিদ হোসেন অতিগুণী তবলীয়া এবং লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রতিনিধিবাদক হিসাবে স্বীকৃত তথা লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের (ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ) অধ্যাপক ছিলেন। পিতা এবং মুন্নে খাঁর কাছে তালিম পান। এঁর শিষ্য—বজিদ হোসেন (জামাতা), কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী (রায় বাহাদুর), ক্ষিতিশচন্দ্র লাহিড়ী, চুনীলাল গাঙ্গুলী, পদ্মশ্রী জাহাঙ্গীর খাঁ (ইন্দোর), দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, বীরু মিশ্র (বেনারস), মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী (মণ্টুবাবু), শিশিরশোভন ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (হীরুবাবু)।

৫। বজিদ হোসেনের শিষ্য—অনিল ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, সুদর্শন অধিকারী।

৬। ছুট্টন খাঁ অতিগুণী তবলীয়া, অকৃতদার তথা সুফী-প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এঁর শিষ্য—কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী, ভ্রাতা আবিদ হোসেন, ভ্রাতুষ্পুত্র বজিদ হোসেন, পোষ্যপুত্র বল্লু খাঁ।

ফরাক্কাবাদ (তবলা) ঘরাণা

১। হাজি বিলায়ত আলী অতিগুণী তবলা ও পাখোয়াজবাদক ছিলেন। ইনিই ফরাক্কাবাদ ঘরাণার প্রবর্তন করেন। এঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ইমামবক্‌স চুড়িয়া (ভটোলে ঘরাণা), মুবারক আলী ও সালারী মিঞা উল্লেখযোগ্য।

২। হোসেন আলীর শিষ্য—৫। মুনির খাঁ।

৩। মসীদুল্লা খাঁ'র শিষ্য—আজীম খাঁ, কেদারনাথ হালদার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মনীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী (মণ্টুবাবু), রাইচাঁদ বড়াল, হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, হেমেন্দ্রনাথ সরকার।

৪। কেরামতুল্লা খাঁ'র শিষ্য—অনিল রায়চৌধুরী, অনিলকুমার সাহা, উমা দে, বিমল চট্টোপাধ্যায়, অমর দে, প্রবীর ভট্টাচার্য, শংখ চ্যাটার্জী।

৫। মুনির খাঁ অতিগুণী তবলাবাদক এবং রায়গড় রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর গুরু—হোসেন খাঁ ও ভোলিবক্‌স। এঁর শিষ্য—আমীর হোসেন খাঁ, আল্লা মেহের, আহ্‌মদজান থিরকুয়া, গোলাম হোসেন, নজীর খাঁ, নিসার খাঁ, বশীর খাঁ, বাবালাল, নিখিল ঘোষ, সমশুদ্দীন, সাদিক হোসেন, সুব্বারাও, হাবীবুদ্দীন, হাসন খাঁ।

৬। আহ্‌মদবক্‌স উত্তম সারেঙ্গী ও তবলাবাদক ছিলেন।

৭। আমীর হোসেন অতিগুণী তবলীয়া এবং বম্বে আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন। ইনি পিতা ও মামার কাছে তালিম পেয়েছেন।

পাঞ্জাব (তবলা) ঘরাণা
(ডুক্করবাজ)

সন্দ্ হোসেন বক্‌স
|
১। ফকীর বক্‌স
|
২। কাদের বক্‌স
(১৯০২-)

১। ফকীর বক্‌স লাহোর অধিবাসী এবং অতি উত্তম পাখোয়াজ ও তবলা-বাদক ছিলেন। এঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল তবে তাদের সঠিক তথ্যাদি প্রাপ্ত হয় না। পুত্র ছাড়া এঁর শিষ্যদের মধ্যে ৩। ফিরোজ খাঁ উল্লেখযোগ্য।

২। কাদের বক্‌স লাহোর অধিবাসী এবং অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলা বাদক। এঁর শিষ্য—অল্লরাখাঁ, লাল মহম্মদ, মহারাজা টিকমগড়, মহারাজা রাজগড়। বর্তমানে নিঃসন্তান কাদের বক্‌স পাকিস্থানের অধিবাসী।

৩। ফিরোজ খাঁ অতি উত্তম তবলীয়া এবং বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার তবলাবাদক

হোসেন বক্‌স
|
১। আতাহোসেন

২। গৌরমোহন বসাক
|
৩। আনন্দমোহন বসাক

১। আতাহোসেন অতিগুণী তবলীয়া এবং মুর্শিদাবাদ-নবাব-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর শিষ্য কাদের বক্‌স (মুর্শিদাবাদ), ৪। প্রসন্নকুমার বাণিক্য।

২। গৌরমোহন বসাক অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলাবাদক ছিলেন। এঁর গুরু ছিলেন খয়রাতি জমিদার। এঁর শিষ্য—আনন্দমোহন (পুত্র), প্রসন্নকুমার বাণিক্য।

৩। আনন্দমোহন গুণী পাখোয়াজ ও তবলাবাদক ছিলেন। পিতা ছাড়া ইনি পাঁচু মিত্র (কলকাতা) ও রামকুমার বসাকের কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

৪। প্রসন্নকুমার বাণিক্য অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন। এঁর শিষ্য—অক্ষয়কুমার কর্মকার, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর, আসাম),

রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী, প্রাণবল্লভ গোস্বামী, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর), হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়।
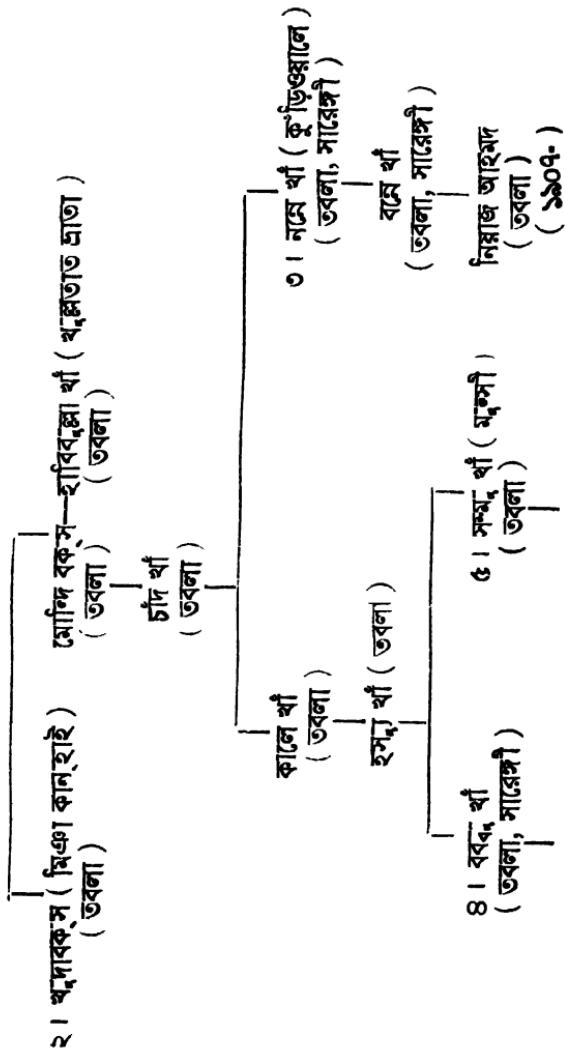
৪। বব্বু খাঁ
তবলা (সারেঙ্গী)
আজিজুদ্দীন খাঁ
(তবলা)
(১৯১০-)
৫। সম্মু খাঁ
(মৃদঙ্গী) (তবলা)
হাবিবুদ্দীন খাঁ
(তবলা)
(১৮৯৯-১৯৭৫)
মঞ্জু খাঁ
(১৯৫৮-)
সন্দু খাঁ
(১৯৬০-)
আমীর হোসেন
(১৯৬৩-)
আশিক খাঁ
(তবলা, জয়পুর)
সমসাদ খাঁ
(তবলা)
(১৯৩৬-)
৭। রমজান খাঁ
(তবলা, দিল্লী)
(১৯৪০-)
অখতর খাঁ
(১৯৬০-)

১। শোনা যায় এক দরবেশ যিনি অজড়ারা'র (দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাট জেলার একটি গ্রাম) এক দরগাতে সেবায়েত ছিলেন। তিনি পাথরের উপরে তবলা বাজাতেন। একদিন আকাশবাণী প্রাপ্ত হয়ে তবলীয়ারূপে প্রসিদ্ধ হন এবং অজড়ারা ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন।

২। খুদাবক্‌স, মোন্দিবক্‌স ও হাবিবুল্লা ভ্রাতৃত্রয় অতিগুণী তবলীয়া ছিলেন এবং দিল্লীর বাদশাহের দরবারে গুণপনা প্রদর্শন করে অজড়ারা ঘরাণার স্বীকৃতিলাভ করেন।

৩। নন্নে খাঁ ছিলেন নিকটবর্তী কুড়িগ্রামনিবাসী এবং উত্তম তবলা ও সারেঙ্গী-বাদক।

৪। বব্বু খাঁ ও ৫। সম্মু খাঁ উত্তম তবলীয়া ছিলেন। পরিণত বয়সে সহোদরের কল্যাণে তবলাবাদন ছেড়ে দেন এবং সারেঙ্গীবাদকরূপে প্রসিদ্ধ হন।

৫। সম্মু খাঁ ও দিল্লীর নত্থু খাঁ অতিগুণী তবলীয়া এবং পরম মিত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে সম্মু খাঁ তাঁর পুত্রের শিক্ষাভার নত্থু খাঁ'কে অর্পণ করে যান।

৬। হাবীবুদ্দীন খাঁ অতিগুণী তবলীয়া এবং সকল ঘরাণার বাদন কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানী ছিলেন। বংশীয় গুরুজন ছাড়া ইনি পিতৃবন্ধু নত্থু খাঁ'র কাছেও তালিম পান। এঁর শিষ্য ৮। মনোমোহন সিং, মিঠনলাল, ৭। রমজান খাঁ, সুধীর সকসেনা (বড়োদা) তথা বংশধরেরা।

৭। রমজান খাঁ গুণী তবলীয়া এবং আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন। এই ঘরাণার তথ্যাদি এঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৮। মনোমোহন সিং গুণী তবলীয়া এবং আকাশবাণীতে নিযুক্ত আছেন। ঘরাণাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ইনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন।

ঠাকুর পরিবার (প্রথম)
জগন্নাথ কুশারি (ঠাকুর)
পঞ্চানন ঠাকুর
জয়রাম ঠাকুর
নীলমণি
(?-১৭৯১)
১। দর্পনারায়ণ
রামলোচন
(১৭৫৪-১৮০৭)
রামমণি
(১৭৫৯-১৮৩৩)
রামবল্লভ
(১৭৬৭-১৮২৪)
রাধানাথ
(১৭৯০-১৮৩০)
দ্বারকানাথ
(১৭৯৪-১৮৪৬)
রামনাথ
(১৮০০-১৮৮১)

দ্বারকানাথ
কন্যা (অল্পায়ু)
দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) সারদাদেবী
নরেন্দ্রনাথ (অল্পায়ু)
২। গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-১৮৫৪) যোগমায়া দেবী
ভূপেন্দ্রনাথ (১৮২৬-১৮৩৯)
নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-১৮৩৯) ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী
কন্যা (অল্পায়ু)
দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) সর্বসুন্দরী দেবী
সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) জ্ঞানদানন্দিনী
৩। হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) নীপময়ী দেবী
বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) প্রফুল্লময়ী দেবী
দ্বিপেন্দ্রনাথ (১৮৬২-১৯২২) সুশীলা দেবী হেমলতা দেবী
দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫)
সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) চারুবালা দেবী
সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০) সংজ্ঞা দেবী
ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) প্রমথ চৌধুরী
কবীন্দ্রনাথ (১৮৭৫-১৮৭৯)
বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) সাহানা দেবী

দেবেন্দ্রনাথ
সৌদামিনী
(১৮৪৭-১৯২০)
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোঃ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
(১৮৪৯-১৯২৫)
কাদম্বরী দেবী
সুকুমারী দেবী
(১৮৫৪-১৮৬৪)
হেমেন্দ্রনাথ মুখোঃ
পুণ্যেন্দ্রনাথ
(১৮৫০-১৮৫৭)
শরৎকুমারী
(১৮৫৪-১৯২০
যদুনাথ মুখোঃ
সুশীলা দেবী
শীতলাকান্ত চট্টোঃ
সত্যপ্রসাদ
(১৮৫৯-১৯৩৩)
ইরাবতী দেবী
(১৮৬১-১৯১৮)
নিত্যরঞ্জন মুখোঃ
স্বর্ণকুমারী
(১৮৫৬-১৯৩২)
জানকীনাথ ঘোষাল
বর্ণকুমারী
(১৮৫৮-১৯৪৮)
সতীশচন্দ্র মুখোঃ
সোমেন্দ্রনাথ
(১৮৫৯-১৯২২)
রবীন্দ্রনাথ । ৪
(১৮৬১-১৯৪১)
মৃণালিনী দেবী
বুধেন্দ্রনাথ
স্বল্পায়ু
হিরণ্ময়ী দেবী
(১৮৬৮-১৯২৫)
জ্যোৎস্নানাথ
(১৮৭১-)
সরলা দেবী
(১৮৭২-১৯৪৫)
উর্মিলা দেবী
(১৮৭৩-)
ডঃ কল্যাণী মল্লিক

ঠাকুর পরিবার (দ্বিতীয়)

২। গিরীন্দ্রনাথ
গণেন্দ্রনাথ
(১৮৪১-১৮৬৯)
কাদম্বিনী
যজ্ঞেশপ্রকাশ
জ্যোতিপ্রকাশ
(১৮৫৫-১৯১৯)
যামিনীপ্রকাশ
কুমুদিনী
নীলকমল
গুণেন্দ্রনাথ
(১৮৪৭-১৮৮১)
সৌদামিনী দেবী
গগনেন্দ্রনাথ
(১৮৬৭-১৯৩৮)
সমরেন্দ্রনাথ
(১৮৭০-১৯৫১)
অবনীন্দ্রনাথ
(১৮৭১-১৯৫১)
বিনয়িনী দেবী
শেষেন্দ্রভূষণ
প্রতিমা দেবী
(১৮৯৩-)
সুনয়নী দেবী
রজনীমোহন

ঠাকুর পরিবার

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন অতি পণ্ডিত ও স্রষ্টা ব্যক্তি। বাংলা ভাষায় রেখাক্ষর বর্ণমালা (short hand) ও সংগীতলিপির ইনিই প্রথম প্রবর্তক।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বপ্রথম আই. সি. এস.। স্ত্রী-স্বাধীনতা তথা অন্যান্য প্রগতিমূলক কতগুলি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অজস্র গুণের অধিকারী। বিশেষ করে শিল্পী, সংগীত-স্রষ্টা, সংগীতশাস্ত্রবিদ্, পিয়ানোবাদক তথা সেতারবাদক। বড়দাদা কৃত সংগীতলিপির সংস্কারসাধন করে ইনি আকারমাত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাসরচয়িতা। ইনি বহু কাহিনী ও নাটক রচনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী' পদক প্রাপ্ত হন।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অতিগুণী চিত্রশিল্পী তথা সংস্কৃত ও বাংলাসাহিত্যের পণ্ডিত। নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ অতিগুণী চিত্রশিল্পীরা এঁরই শিষ্য।

সরলা দেবী ছিলেন হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য সংগীতে পারদর্শিনী এবং উত্তম সংগীত-রচয়িতা।

ডঃ বাণী চ্যাটার্জী পাশ্চাত্য সংগীতে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধিলাভ করেন।

ডঃ কল্যাণী মল্লিক উত্তম সেতারী এবং ওস্তাদ ইমদাদ খাঁ ও তৎপুত্র ইনায়ত খাঁর শিষ্যা ছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন উত্তম এস্রাজবাদক এবং সঙ্গীতলিপিকার।

রাজা হরকুমার ঠাকুর উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং বাসৎ খাঁ (সেনী) ও হস্‌সু খাঁর শিষ্য ছিলেন।

দক্ষিণামোহন ঠাকুর ছিলেন উত্তম তড়িৎবীণা ও দিলরুবাবাদক এবং গিরিজা-শংকর চক্রবর্তী, ছোটে খাঁ ও ডঃ সুরেশ চক্রবর্তীর শিষ্য।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন অতিগুণী সংগীতজ্ঞ তথা সেতারী এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, আলী আহমদ, সজ্জাদ মহম্মদ, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র প্রমুখের শিষ্য।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর ছিলেন উত্তম সংগীতজ্ঞ এবং ইনায়ত খাঁ ও দবীর খাঁর শিষ্য।

শ্যামকুমার ঠাকুর উত্তম সংগীতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত'র শিষ্য ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Advance History of India. 1st Edn. 1970 Calcutta,
K. A, Nilkanta Sastri, G. Srinivasachari.

Dictionary of South Indian Music & Musician (Vol. II) 1952, 1959 P. Sambomoorthy.

Encyclopaedia Britanica (Vol. XXIV) 1971, London.

Gifford Lectures 1889, Prof. Max Muller.

Great Composers (Vol. II) 1962, 1970. P. Sambomoorthy.

Great Musicians 1959, P. Sambomoorthy.

History of Indian Music 1960 P. Sambomoorthy.

India And Her People (1905-1906) Swami Abhedananda.

Indian Philosophy 1912 Prof. Max Muller.

India Through Ages 1951 Sir Jadunath Sarkar.

Landmarks of the World's Art (Vol. X) 1967 London.

North Indian Music 1949 Allan Danielon.

Prehistoric and Primitive Man. Dr. Andreas Lommel.

South Indian Music (Vol. V) 1960 P. Sambomoorthy.

Sources of Indian Tradition, Columbia University Press. 1960. New York, U. S. A.

Some Names in Early Sangita Literature (Journal of the Music Academy Madras. (Vol. III) 1932. Dr. V. Raghavan.

The Art of Indian Asia (Vol. II) 1968, New York, U. S. A.

The Indian Music of The Vedic and the Classical Period, 1912. Dr. Erwin Felber.

The Ideals of Indian Art. 1920, E. B. Havell.

The Wonder That was India. 1956, London. A. L. Bashin.

The World of Music (Vol. II) 1957, London. K. B. Sandved.

ক্রমিক পুস্তক মালিকা (৬ খণ্ড) ১৯৫৭। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।

জীবনী অভিধান। ১৩৭৩। সুধীরচন্দ্র সরকার।

জীবনস্মৃতি। ১৩৬৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দত্তিলম। কে সাম্ব শিবস্বামী শাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিবান্দ্রম। ১৯৩০।

নাট্যশাস্ত্র। ভরত। (১ম-২য় ভাগ) চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ। কাশী।

নারদীশিক্ষা। ভট্ট শোভাকর-কৃত টীকা সম্বলিত, কাশী সংস্করণ। ১৮৯৩।

প্রসাদ পত্রিকা। (সংগীত সংখ্যা) আষাঢ় ১৩৭৭, শ্রাবণ ১৩৭৯। কলিকাতা।

বৃহৎবঙ্গ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

বৃহত্তর ভারত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। (১ম সংখ্যা, ১৩৩২, প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

বৃহদ্দেশী। মতঙ্গ। (কে সাম্ব শিবশাস্ত্রী সম্পাদিত। ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ ; ১৯২৮)।
ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র (৪ খণ্ড) ১৯৬৮-১৯৬৯। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।
ভারতের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ। ডক্টর অতুলচন্দ্র রায় M.A., Ph.D. (London)
ঐ : মধ্যযুগ। ১৯৬৪। কলিকাতা।
ভারতীয় সঙ্গীত কোষ। বৈশাখ ১৩৭২। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।
ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ। ডক্টর বিমল রায়।
মেঘদূত। মহাকবি কালিদাস। অধ্যাপক কাশীনাথ বাপু পাঠক সম্পাদিত। পুণা।
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ (২ খণ্ড) ১৩৬৭, ১৩৬৯। প্রফুল্লকুমার দাস।
রবীন্দ্রসঙ্গীত। ১৩৫৬। শান্তিদেব ঘোষ।
রাগ ও রূপ। (২ খণ্ড) ১৯৬১, ১৯৬৫। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
লিপিচিত্রে সঙ্গীত সাধক। ১৩৭৩। অমরেন্দ্রকুমার দত্ত।
সংগীত ও সংস্কৃতি (২ খণ্ড) ১৯৬১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
সঙ্গীতচিন্তা। ১৩৭৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সঙ্গীত চন্দ্রিকা ১৩৭৪। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়।
সঙ্গীতদর্পণ। পণ্ডিত দামোদর মিশ্র। কলিকাতা।
সঙ্গীতদর্শিকা (২ খণ্ড) ১৩৬৫, ১৩৬৮। ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়।
সঙ্গীত বিশারদ। ১৯৬১। বসন্ত। হাথরস।
সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৬। আর. সি. দাস এণ্ড সন্স। ৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা।
সঙ্গীতজ্ঞাকে সম্মরণ। ১৯৫৯। বিলায়ত হোসেন খাঁ।
সঙ্গীতসার। ১২৮৬। কলিকাতা। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।
সঙ্গীতসুধা। ১৯৪০। রাজা রঘুনাথ। মিউজিক একাডেমী, মাদ্রাজ।
সঙ্গীতসময়সার। পার্শ্বদেব। ১৯২৫। ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ।
সঙ্গীত পারিজাত। পণ্ডিত অহোবল। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। ১৯৩৬। কলিকাতা।
সঙ্গীতাঞ্জলি (৬ খণ্ড) ১৯৫৬-১৯৬২। ওঁকারনাথ ঠাকুর।
সঙ্গীতের আসর। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীতরত্নাকর। আডেয়ার সংখ্যা, মাদ্রাজ।
হমারে প্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ। ১৯৬৮। প্রঃ হরিশ্চন্দ্র শ্রীবাস্তব। এলাহাবাদ।
হমারে সঙ্গীত রত্ন। ১৯৬৯। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ। হাথরস।
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান। ১৩৪৬। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

নির্দেশিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২৫	নম্বানাকে	লম্বানাকে
৬	৭	সঙ্গ	অঙ্গ
৬	২৮	আভাস	আভাস
৭	৩	দায়	দায়ে
৮	৮	সমকাল	সময়কাল
১২	২৩	অমীমাংশিত	অমীমাংসিত
১২	২৮	Gifiord	Gifford
১৬	৫	মন্ত্র	মন্দ্র
২৬	২৪	উল্লিখিত	উল্লিখিত
২৭	২	সংগীত-প্রশস্তি	সংগীত-প্রশস্তি
২৭	৯	শ্লোকটি	শ্লোকটি
২৮	৮	ষড়্জ (২)	ষড়্জ (১)
২৪	১০	পঞ্চম (১)	পঞ্চম (৫)
২৯	১৬	নিষাদবনে	নিষাদবান
৪৯	২	ধ্বনিকক্ষ	ধ্বনিরুক্ষ্মো
৪৯	৫	এয়ানাং	ত্রয়ানাং
৫০	৬	ককডরাগের	কুকুভরাগের
৫৪	৫	সংগীত এ বাদ্য	সংগীত ও বাদ্য
৬৩	১৫	পাস্তা	পস্তো
৬৬	১০	'পরাশর' 'মাধব নামে'	'পরাশর মাধব' নামে
৬৭	৬	জন	জন্য
৬৮	২৩	কাছে আল্লা	কাছে ঈশ্বর ও আল্লা
৭১	২৫	নাটসাদি	নাটকাদি
৭৩	১৯	তালমণ্ডী	তালবণ্ডী
৭৩	২৪	চৌনী	চৈনী
৭৪	১৯	আই	যাই

৭৪	২৭	পরাসীলী	পরসৌলী
•৬	৬	বেজুবারর	বৈজুবাবর
৭৯	১৯	পস্ত্রহসৌ	পন্দ্রহসৌ
৮২	১৯	যাবতীর	যাবতীয়
৮৩	১৩	মান	স্থান
৮৪	৬	সামস্ত	সামন্ত
৯০	১১	সাগরী	গাগরী
৯৩	২০	(১৬৫৫-২৭)	(১৬০৫-২৭)
৯৬	২২	নিরে	নিয়ে
৯৬	শেষ লাইন	স্বওড্ডাদিত	স্বউদ্ভাবিত
৯৯	২১	পাঞ্জাবের	তাঞ্জোরের
১৪৪	২৬	নিজে	(শব্দটি বাদ যাবে)
১৫২	৮	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠ
১৭৬	১২	আকাস	আব্বাস
১৯২	২৫	সম্মানীত	সম্মানিত
১৯৬	১২	সিখমনি	সিখমণি
১৯৬	১৩	দেশবিদেশ্বের	দেশেবিদেশের
২১০	১৯	রোদেনষ্টাইনের	রোথেনষ্টোনের
২২০	১২	মথেষ্ট	যথেষ্ট
২২২	৮	কুণ্ডগোলকরের	কণ্ডগোলকরের
২২৫	৭/১০	মুট্রকর/মুট্রকরের	মুটাটকর/মুটাটকরের
২৩২	২৭	জীষণ	ভীষণ
২৪০	২৪	মোস্তাক	মুস্তাক
২৪৬	২৩	লগনগান্ধায়	লগনগান্ধার
২৪৭	৭	সংপ্রেমী	সংগীতপ্রেমী
২৫০	১৪	হইমরতের	ইমরতের
২৫৫	১২	নওজাকত আলী	নজকত আলী